KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 45/1 45/2 45/3 45/5	Year of Publication May 1984 Jun 1984 July 1984 Sep 1984
	Condition : Brittle ✓ Good ✓
Editor রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৫ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
জুন ১৯৮৪

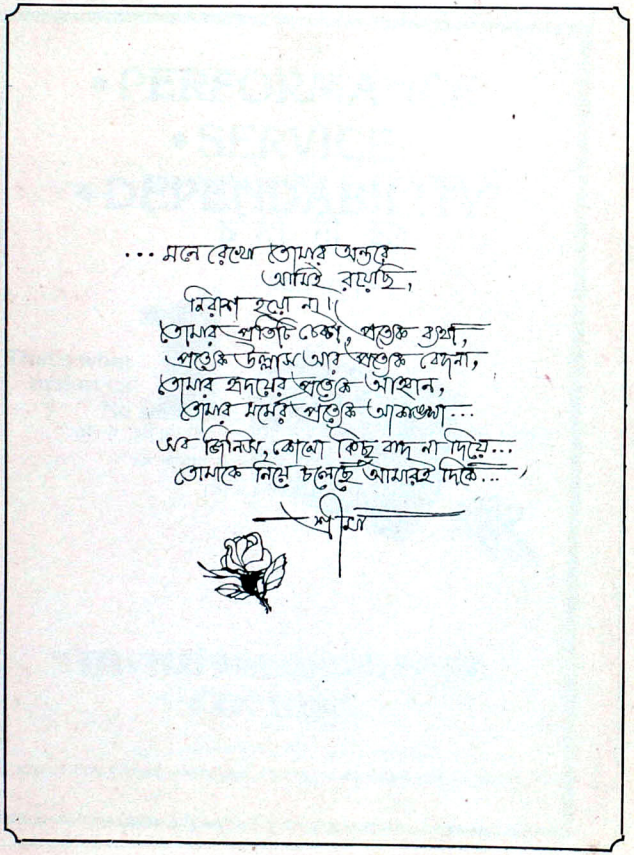

বর্ষ ৪৫। সংখ্যা ২
জুন ১৯৮৪
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৯১

মহাভারতে কূটনীতি রাজ্যেশ্বর মিত্র ১১২
রবীন্দ্রনাট্য : গান দিয়ে দ্বার খোলানো সন্তোষকুমার ঘোষ ১৩৩

বাতাসের ঋতু আল মাহমুদ ১১১
আমিও জেগেছি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৪১
আমি দীর্ঘ সাঁতার জানি রফিক আজাদ ১৪২
সঞ্চয় রত্নাংশু বর্গী ১৪৩
দু-হাত-বাড়ানো ফুলপাতা ওমর আলী ১৪৪

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ১২০
শহর সংস্করণ শংকর বসু ১৪৫
তিহারলালের ঘর-গৃহস্থি কানাই কুণ্ডু ১৬২
জাহাজী গল্প অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ১৫৫
গরুজীর সঙ্গে চীনে শ্যামাদাস চক্রবর্তী ১৬৮

আলোচনা ১৭৬
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন বিশ্বাস, দিবেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন ঘোষ, উপাসক কর্মকার, অসীম রায়, হোসেনুর রহমান, আবদুর রউফ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদচিত্র। নন্দলাল বসু : পাইনবন
(ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে)
শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

R. P. BAROOAH TEA & ENTERPRISES (P) LTD.

108, New Park Street
Calcutta-700 017

Agents for :

HAROOCHARAI TEA ESTATE
KAMARBUND TEA ESTATE

বাতাসের ঋতু

আল মাহমুদ

এসেছে ঝড়ের মাস। নড়বড়ে খুঁটি ধরে
কী করে যে হাস? বিগত শীতের লতা
টিনের চালায় তোলে শব্দের নূপুর।
গুনার বাঁধন ছিঁড়ে দরমার বেয়াদপ ফালি
লাফিয়ে পড়তে চায় আমাদেরই জোড়াতালি
প্রেমের ওপর।

অথচ তোমার চুল
সাপের জিহ্বার মতো লাফাতে লাফাতে
কী করে যে হয়ে গেল বোশেখের অবিশ্বাসী ঝড়। আর
হাসির ছটাও গিয়ে মিশে যায়
ঈশানের এলোমেলো বিজুলিলতায়।

সবি তবে উড়ে যাবে? খড়-বিচালির সাথে
অতীতের সব বিনিময়?
উড়ে যাবে কালো এক কিশোরীর প্রথম ব্যথার সেই
জলভরা সুখ?
উঁহু উঁহু শাঁখকার? বুঝি সভাতাকে শুষে নেয়
মেঘনাপারের কোনো গ্রাম। যেন বা চরের মাটি
অকস্মাৎ গলে যায় মানুষের ঘর্মাক্ত বপনে।
হৃদয়ের গভীর গোপনে কেউ বুঝি
বাজায় হলুদ লাউ। শুধু তার আঙুলের টানে
গুমরে গুমরে ফেটে যায় বোশেখের ঘূর্ণিতোলা বেগ।

কী করে যে হাস?
তোমার হাসির ছটা মিশে যায়
ঈশানের বিজুলিলতায়।

মহাভারতে কূটনীতি

রাজ্যেশ্বর মিত্র

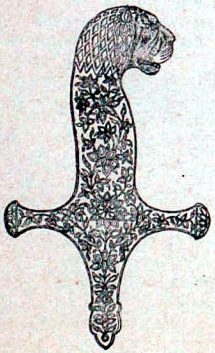

মহাভারতে রাজনীতির চর্চা করেছেন তিনজন—বিদুর, শকুনি এবং সঞ্জয়। এঁদের মধ্যে বিদগ্ধজন ছিলেন নিঃসংশয়েই বিদুর, কারণ তাঁর অধ্যবসায় ছিল ব্যাপক। সমগ্র কৌরবগোষ্ঠীর মধ্যে ভেদসৃষ্টি করবার জন্য কোনো কর্মধারাই তাঁর কাছে অসমীচীন ছিল না, এবং কৌশলগুলি গড়ে হলেও তাঁর উদ্দেশ্য অনেক সময় স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। তাঁকে সবচেয়ে ভালো করে চিনেছিলেন দুর্যোধন, কিন্তু তিনি সব জেনেশুনেও বরাবরই তাঁকে উপেক্ষা করে গেছেন, কেননা তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্রের বিদুরের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল এবং বিদুরের কোনো ক্ষতিসাধন করলে সেটা একটা প্রাসাদের ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করতে পারত। তথাপি, দুর্যোধন ভিন্ন অন্য কেউ হলে বিদুরকে কড়া শাসনে রাখতেন, কিন্তু দুর্যোধন তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি, কেবল নিজেকে সচেতন করে রেখেছিলেন। বিদুরের এই মনোভাবের হেতু কী সেটা আমাদের মনে প্রশ্নের সৃষ্টি করে। তার সদুত্তরও আছে। বিদুর দাসীপুত্র, কিন্তু ব্যাসদেবের ঔরসজাত সন্তান। সেদিক থেকে তিনি স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের এবং পাণ্ডুর সাক্ষাৎ ভ্রাতা। কেবলমাত্র দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করলে হস্তিনার সিংহাসন তাঁরই অধিকারে আসত। ভাগ্যের এই বঞ্চনা তাঁর মনের গভীরে স্বভাবতই একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হলেও তিনি রাজার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, এবং দুর্যোধন রাজ্যশাসন করলেও মহারাজের আসনটা ছিল তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্রের। অতএব অন্ধরাজের চিত্ত ততটা ক্ষুব্ধ ছিল না। কিন্তু বিদুর একমাত্র রাজভ্রাতার স্বীকৃতি ছাড়া আর কোনো স্বীকৃতিই পান নি। এই দুর্ভাগ্যকে একটা অন্য খাতে প্রবাহিত না করলে তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না এবং সেটা তিনি করেছিলেন একটা তথাকথিত অধ্যাত্মজীবন বেছে নিয়ে। কিন্তু, কোনোদিনই তিনি প্রকৃত সন্ধর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে অধ্যাত্মগৌরব অর্জন করতে পারেন নি। বহু সদুপদেশ এবং আখ্যায়িকার জাল বিস্তার করে তিনি কুরু এবং পাণ্ডব—এই দুই পক্ষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিরন্তর উত্তেজিত করেছিলেন এবং নিজে আজীবন এক ধরনের কূটনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেছিলেন। মহাভারতের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বাসুদেব কৃষ্ণের মতো তিনিও তাঁর

নিজস্ব জটিল পদ্ধতিতে একটি সর্বাত্মক ধ্বংসের পরিস্থিতি উদ্ভব করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শকুনির কূটনীতি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বহুলে পরিমাণে সংকীর্ণ। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুর্যোধনকে কুরুসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা। তিনি সেটি নিষ্ঠাভরে পালন করেছিলেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যন্ত। তারও একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল ভীষ্মপ্রবর্তিত কৌরবশাসনের বিরুদ্ধে। যেদিন তাঁর ভগিনী গান্ধারীকে সম্পূর্ণ বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে অন্ধরাজপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে কুরুগৃহে বিবাহপ্রদান করা হল, সেদিন থেকেই ঘৃণা এবং প্রতিশোধের তাঁর দাহ তাঁর চিত্তে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি বিবেচক ব্যক্তি ছিলেন ; সর্বাত্মক ধ্বংস তাঁর কাম্য ছিল না। তিনি চিন্তা করে দেখেছিলেন তাঁর ভগিনীর একমাত্র সান্ত্বনা হতে পারত দুর্যোধনকে কুরুসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তার পরবর্তী কালে ধৃতরাষ্ট্রের ধারাকে কৌরবশাসনে অক্ষুণ্ণ রাখা। তাঁর বোধ করি অনুমান ছিল, সুদীর্ঘ বনবাসের পর পাণ্ডবদের ক্ষমতা, প্রভাব, প্রতিপত্তি বহুলে পরিমাণে হ্রাস পাবে এবং দুর্যোধনের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হয়ে দেখা দেবে ; কিন্তু সেখানে বাসুদেব কৃষ্ণের ভয়ংকর আবির্ভাবের কথা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। কোথা থেকে কী হয়ে গেল। প্রচণ্ড বিত্ত এবং ক্ষমতা-সম্পন্ন যাদবগোষ্ঠীর তৎপরতায় পাণ্ডবেরা শকুনির সমস্ত পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ অসার্থক করে দিলেন। মন্দভাগ্য শকুনি যে কূটনীতির উদ্ভাবন করেছিলেন তার প্রতিকূলতায় দৈব-সহায়তা না পাওয়া গেলে সমস্ত পটভূমিরই রূপান্তর ঘটত অনিবার্যভাবে।

রাজনীতিতে সঞ্জয়ের ভূমিকা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তাঁর কোনো গোপন বা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না। কৌরব বা পাণ্ডব—কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গেই তাঁর বিরোধ ছিল না—তিনি কেবলমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমেই দূতের কার্য নির্বাহ করেছিলেন ; এবং ক্রমে তাঁকে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় তাকে 'ডিপলোম্যাট'-এর ভূমিকাই বলা চলে। সঞ্জয় জাতিতে সূত (সারথ্যব্যবসায়ী) ছিলেন। সেকালে সূতজাতীয় ব্যক্তিরা হেয় বলেই গণ্য হতেন, কোনো উচ্চকার্যে তাঁদের নিয়োগ করা হত না। কিন্তু, সঞ্জয় এর একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। তিনি মাননীয় সভাসদ ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ধৃতরাষ্ট্রের আশ্বাভাজন এই ব্যক্তিটি নানান গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত হয়েছেন—সূতজাতীয় বলে কর্ণের মতো তাঁকে পদে পদে অবজ্ঞা, অপমান সহ্য করতে হয় নি। তাঁর পূর্বপরিচয় মহাভারত থেকে জানা যায় না ; তিনি কেবলমাত্র 'গবলগণ-নন্দন' বলেই পরিচিত। বিবিধ বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন—কোনো সূতবংশীয়ের পক্ষে যা সম্ভব ছিল না। এই অসাধ্যসাধনও যে কেমন করে হয়েছিল, তার কোনো সংবাদ আমাদের কাছে নেই। মহাভারতের আখ্যানভাগে তাঁর প্রবেশও বিলম্বেই ঘটেছে। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠির যখন সপরিবারে হস্তিনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বিষণ্ণ মনে সমস্ত বিষয়টা পর্যালোচনা করছেন, সেই অবসরে সঞ্জয়কে এই মহাকাব্যে প্রথম প্রবেশ করতে দেখা যায়। তার আগেই ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে অনুরোধ করেছেন পাণ্ডবদের বনগমন থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য ; কিন্তু বিদুর জানতেন যে পাণ্ডবরা আর ফিরবেন না। তিনি সে চেষ্টা করেন নি। ধৃতরাষ্ট্রের আর-একটি অনুরোধ ছিল—যদি একান্তই তাঁরা প্রত্যাবৃত্ত না হন তাহলে তাঁদের যেন শস্ত্র, রথ, পদাতি এবং ভোগস্বারা সংকৃত করে বিদায় করা হয়। সেই অনুরোধ কতটা পালিত হয়েছিল বলা যায় না, তবে পাণ্ডবগণ তাঁদের রথ এবং অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্টই বহন করেছিলেন। বিদুর যখন ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে থাকতেন না তখনই সঞ্জয়ের ডাক পড়ত এবং এই একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি সর্বতোভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে সহায়তা প্রদান করতেন। তিনি কোনোদিনই বক্রপন্থার সমর্থক ছিলেন না, কারণ তাঁর কোনো পক্ষপাতের অভিপ্রায় ছিল না। তিনি কাউকে তোষণের জন্য স্পষ্টবাক্য বলতে দ্বিধা বোধ করতেন না। দুর্যোধনের সম্মুখেও তিনি বহুবার কটু এবং নিন্দাসূচক বাক্য ব্যবহার করেছেন ; কিন্তু তিনি কদাচ তাঁর প্রতিপালক দুর্যোধনের অহিতচিন্তা করেন নি। এই কারণেই তিনি মহাভারতের রাজনীতিতে একজন সম্মানিত পুরুষ বলে গণ্য হয়েছেন। বিদুরের মতো তিনি 'অগাধবুদ্ধি' আখ্যা লাভ করেন নি, কিন্তু তাঁর মতো স্থিরবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ আর কেউ ছিলেন না। অতএব যখন তাঁকে সন্ধিস্থাপনের দূতরূপে পাণ্ডবদের কাছে পাঠানো হল, তখন কারুরই কোনো অভিযোগ ছিল না। তিনি বরাবরই

কুরুকুলের সমর্থক ছিলেন এবং তাঁর দৌত্য সম্পূর্ণ দুর্যোধনের অনুকূলে গিয়েছিল, কেননা তিনি চতুর্দশ-বর্ষব্যাপী পরিব্রাজক পাণ্ডবদের রাজনীতিতে পুনঃ-প্রবেশটা শুভফলপ্রসূ হবে বলে বিবেচনা করেন নি। পাণ্ডবরা নিঃশব্দভাবে অবস্থান করুন এটা অবশ্যই তাঁর অভিমত ছিল না কিন্তু কুলক্ষয়কারী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়া, শাসক হিসাবে দুর্যোধন যে যুধিষ্ঠির অপেক্ষা অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ, সেটাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য, তাঁর বক্তব্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক উত্থাপন করা যায়, কিন্তু যেজন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যকে তিনি কৌরবপক্ষের অনুকূলে সফল করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। সমগ্র মহাভারতে 'সঞ্জয়যান'-পর্বটি রাজনৈতিক দৌত্যকর্মের দিক থেকে অতিশয় চিত্তাকর্ষক। এইপ্রকার উদ্যোগ বোধ করি সঞ্জয়ের মতো নির্মলবুদ্ধি, অপক্ষপাত ব্যক্তি ভিন্ন আর কারুর পক্ষে সম্ভব হত না।

মহাভারতের সবচেয়ে জটিল রাজনীতিক মত-বিনিময়ের সূচনা হতে দেখা যায় বিরাটগৃহে অভিমন্যুর বিবাহের অব্যবহিত পরে। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে বোঝাপড়ার এইটিই শেষ পর্যায়। এর পরেই সরাসরি সম্মুখসমরে এতদিনকার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে যাবার পরেও বিরাট-নগরেই রয়ে গেলেন। দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে যে পণ রাখা হয়েছিল তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল যে দ্বাদশবর্ষ বন-বাস ও একবর্ষ অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবরা নিজের রাজ্য ফিরে পেতে পারবেন। সেই শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা হস্তিনায় গিয়ে সোজাসুজি বলতে পারতেন যে তাঁদের রাজ্য তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু, সেটি তাঁরা করলেন না, কারণ তাঁদের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে দুর্যোধন তাঁদের হত্যা করতে পারেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে, প্রথমে দূত পাঠিয়ে পূর্বশর্ত সম্বন্ধে কৌরবদের নিশ্চিত অভিমত অথবা প্রতিক্রিয়া তাঁরা লক্ষ্য করবেন ; তারপরে পরবর্তী নীতি নির্ধারণ করবেন। এ সন্দেহ কিন্তু অমূলক ছিল বলেই মনে হয়। পাণ্ডবেরা যাত্রা করেছিলেন হস্তিনা থেকে এবং হস্তিনায় ফিরে এসে স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁদের ত্রয়োদশ বর্ষ যাপনের দিনক্ষণ যথাযথভাবে নির্দেশ করা উচিত ছিল ; তাহলে বিতর্কের কোনো অবকাশ থাকত না এবং ভীষ্ম, দ্রোণ বিদুর প্রভৃতির সম্মুখে ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের হৃতরাষ্ট্র ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হতেন। দুর্যোধন কখনই পিতার কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের বধ করতে সাহসী হতেন না। কেন যে পাণ্ডবেরা এই সহজ এবং যুক্তিপূর্ণ পথ অবলম্বন করেন নি, সে সম্বন্ধে মহাভারতকার নীরব। মহাকাব্যের বর্ণনা থেকে মনে হয়, যুদ্ধের প্রথম উদ্যোগটা আসছিল পাণ্ডবদের পক্ষ থেকেই, কারণ তাঁরা নিজেদের দূরে রেখে সন্ধির সমস্ত উপায়গুলিকেই এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এতে দুর্যোধনেরই সুবিধা হয়েছিল ; কারণ তিনিও যুদ্ধই চাইছিলেন। তিনি যখন দেখলেন পাণ্ডবেরা একটি দূরন্ত বজায় রেখে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছেন তখন তিনিও স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের জন্য মনঃস্থির করে ফেললেন। যাই হোক, উভয়পক্ষই একদিকে যুদ্ধোদ্যম এবং অপরদিকে লোক-দেখানো দৌত্যকর্ম—দুটি পন্থাই অবলম্বন করলেন কিছুটা সময় নেবার জন্য।

বিরাটগৃহে বিবাহোৎসবের পরেও যাদবগণ, পাঞ্চাল-গণ এবং দ্রুপদগণ সকলেই রয়ে গিয়েছিলেন। একটি সভায় সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে কী করা কর্তব্য, সে সম্বন্ধে আলোচনা হল। প্রথমে বাসুদেব কৃষ্ণ একটি ছোটো বক্তৃতায় তৎকালীন পরিস্থিতির উল্লেখ করে বললেন, "কৌরবরা যেরকম আচরণ করে চলেছেন তাতে যদি এখনি যুদ্ধে পাণ্ডবেরা আহূত হন তাহলে তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁদের বিনাশসাধন করবেন। যদি আপনারা অনুমান করেন যে পাণ্ডবেরা সংখ্যায় অল্প বলে কৌরব-দের পরাজয় করতে অসমর্থ হবেন, তাহলে যাতে তাদের সহায় করা যায় সে বিষয়ে যত্নশীল হোন। কিন্তু দুর্যোধন এ বিষয়ে কী করবেন, তার কিছুই আমরা জ্ঞাত হতে পারি নি। পরের অভিপ্রায় অবগত না হয়ে কার্য-আরম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত হতে পারে? অতএব, যাতে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্ধ প্রদান করেন, এই রকম সন্ধির জন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি আমাদের দূত হয়ে তাঁর কাছে গমন করুন।" তারপরে বলদেব তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বললেন, "কৃষ্ণ যা বললেন সেটি যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যেমন শ্রেয়স্কর, দুর্যোধনের পক্ষেও সেইরূপ। পাণ্ডবগণ অর্ধরাজ্যমাত্র গ্রহণ করে ক্ষান্ত হতে সম্মত আছেন ; অতএব দুর্যোধন তাঁদের রাজ্যার্ধ প্রদান করে

সুখে কালযাপন করুন। এইটি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হলে প্রজাগণের কোনো অনিষ্ট ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। এখন, আমারও মত হল একজন উপযুক্ত ব্যক্তি উভয়কুলের শান্তিসাধনের জন্য দুর্যোধনের কাছে গিয়ে এই প্রস্তাবে তাঁর কী মত সেটি জেনে আসুন।" এরপর তিনি আবার বললেন, "যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ নন, সুহৃদ্-গণের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়ে-ছিলেন। দুর্যোধনের সভামধ্যে বহু অক্ষবেত্তা ছিলেন যাঁদের কাউকে তিনি অনায়াসে পরাজিত করতে পারতেন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তিনি অক্ষপারদর্শী গান্ধাররাজ শকুনিকেই দ্যূতে আহ্বান করলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ এঁর সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলেন এবং ক্রমে ক্রমে ক্রোধা-বিষ্ট হয়ে পরাজয়পূর্বক এঁর সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করলেন। এতে শকুনির কিছুমাত্র অপরাধ নেই। এখন উপায় হচ্ছে এই যে একজন বাগ্মী পুরুষ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধিবিষয়ে প্রস্তাব করুন, তাহলে তিনি অবশ্যই সন্ধিবিধানে সম্মত হবেন। কৌরবদের সঙ্গে সংগ্রাম না করে সন্ধি করাই কর্তব্য। সন্ধিদ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হয়ে থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রামের দ্বারা উপার্জিত তা অর্থই নয়।" বলদেবের ভাষণে সত্যের অপলাপ ছিল না, অতএব যুধিষ্ঠির কোনো প্রতিবাদ করলেন না, কিন্তু সাত্যকি যৎপরো-নাস্তি ক্ষুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে লাগলেন, "হল-ধরের বক্তব্যের মধ্যে বক্রোক্তিগুলি একেবারে অশ্রুত। যখন অক্ষবিশারদগণ জেনেশুনে এই দ্যূতানভিজ্ঞ ব্যক্তি-টিকে পরাজিত করেছেন তখন তাঁদের জয় কোন্ বিধিতে ধর্মানুগত বলে প্রমাণিত হতে পারে? যদি যুধিষ্ঠির নিজের গৃহে ভ্রাতাদের সঙ্গে ক্রীড়া করবার সময় দুর্যোধন প্রভৃতি সেখানে সমাগত হয়ে তাঁকে পরাজিত করতেন, তাহলে ইনি ধর্মত পরাজিত হতেন। ওই দুরাত্মারা তা না করে প্রকৃতপক্ষে যখন এঁকে কপট দ্যূতে পরাজিত করেছেন, তখন তাঁদের মঙ্গল কোথায়? এখন মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজের প্রতিজ্ঞাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনি কী কারণে সেই দুরাত্মাদের কাছে অবনত হতে যাবেন? ইনি বনবাস থেকে মুক্ত হয়ামাত্র নিজের পৈতৃক পদের অধিকারী হয়েছেন, তবে কেন তিনি পৈতৃক রাজ্য অধি-কারের জন্য আবেদন, নিবেদন করতে যাবেন? অতএব হয় আজ কৌরবগণ সসম্মানে রাজ্য যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পৈতৃক রাজ্য প্রদান করুন নতুবা তাঁরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যান।" এর পর রাজা দ্রুপদ তাঁর মত প্রকাশ করে বললেন, "সাত্যকির সঙ্গে আমি একমত। দুর্যোধন স্বেচ্ছায় কখনই রাজ্য প্রদান করবেন না এবং পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁকেই অনুমোদন করবেন। আমার মতে বলদেবের বাক্য কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি দুর্যোধনের সঙ্গে মৃদুতা অবলম্বন করেন, তিনি তাঁকে মৃদু ও অসার বিবেচনা করে থাকেন। অতএব, আমাদের এখন তীব্রভাব অবলম্বন করাই শ্রেয়। আমরা এখন থেকেই সৈন্যসংগ্রহ এবং মিত্রগণের কাছে দূত প্রেরণ করব, কেননা দুর্যোধনও সর্বত্র দূত পাঠাতে আরম্ভ করবেন—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রে, দুর্যোধন প্রভৃতির কাছে পাঠানো যেতে পারে। তাঁদের কাছে যেসব সংবাদ প্রদান করতে হবে তা আপনারা এঁকে বলে দিন।" এই সঙ্গে তিনি কোন্ কোন্ রাজ্যে যুদ্ধের সহযোগিতা প্রার্থনা করে দূত পাঠানো যেতে পারে তারও একটা তালিকা দিলেন। আলোচনায় শেষ পর্বে কৃষ্ণ আবার এই বাদানু-বাদের উত্তর দিতে উঠলেন। তিনি বললেন, "কুরু এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁরা কখনও মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমাদের সঙ্গে অশিষ্ট ব্যবহার করেন নি। যদি দুর্যোধন ন্যায়ত সন্ধিস্থাপন করেন তাহলে কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাতৃনাশ বা কুলক্ষয় হয় না ; কিন্তু যদি তিনি সন্ধি না করেন তাহলে আগে অন্যান্য রাজ্যে দূত পাঠিয়ে পরে আমাদের আহ্বান করবেন।"

এই আলোচনার পর যাদবগণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন এবং পাণ্ডবদের পক্ষে সংগ্রামের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরের মতানু-সারে তাঁর প্রজ্ঞাশীল বয়োবৃদ্ধ পুরোহিতকে কৌরবদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে উপদেশ দেওয়া হল যে তিনি যেন হস্তিনায় গিয়ে ধর্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের মন প্রসন্ন করেন অথচ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। প্রত্যেকের সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে হবে যাতে একজনের সঙ্গে আর-একজনের মতভেদ ঘটে। প্রধান রাজপুরুষ অর্থাৎ অমাত্যদের অন্তর্ভেদ ঘটলে অথবা সৈনিকেরা বিমুখ হলে তাদের একতা সম্পাদনের জন্য কৌরবদের অনেকটা সময় লেগে যাবে। সেই অবকাশে পাণ্ডবেরা সৈন্যসংগ্রহ

এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যসংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সেরে নিতে পারবেন।

এইখানেও দূতনির্বাচনে যুধিষ্ঠির ব্যর্থতা প্রমাণ করলেন। পুরোহিতরূপে তিনি অনায়াসেই ধৌম্যকে পাঠাতে পারতেন, কেননা তিনি ছিলেন তাঁদের নিজের লোক এবং সুপরিচিত ব্যক্তি। কৌরবেরা একজন অখ্যাত পাঞ্চাল পুরোহিতকে কিছুমাত্র গুরুত্ব প্রদান করলেন না এবং এই পুরোহিতটিও মামুলি বক্তব্য ছাড়া আর কোনো কূটনৈতিক বাগবিস্তার করে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারলেন না। ইনি কৌরবরাজসভায় উপস্থিত হয়ে কেবল এইটুকু বললেন, "ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই এক-জনের সন্তান। পৈতৃক ধনে এঁদের দুজনেরই সমান অধিকার। কিন্তু, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সেই পৈতৃকপদে আরোহণ করলেন আর পাণ্ডুপুত্রেরা তা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলেন—এর কারণ কী? যদিচ পাণ্ডবেরা কৌরবদের চেয়ে সমধিক বলবান তথাপি তাঁরা যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের রাজ্যাংশ যাতে তাঁরা লোকহিংসা না করে পান এইটাই তাঁরা চান। অতএব, আপনারা ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে তাঁদের প্রাপ্যটুকু প্রদান করুন। এখনও এর কাল অতীত হয়ে যায় নি।" এর প্রত্যুত্তর এল কর্ণের কাছ থেকে। তিনি বললেন, "যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করেছেন এবং তাঁর অরণ্যবাস সম্পূর্ণ করেন নি। আগে তিনি প্রতিজ্ঞাকাল অতিবাহিত করুন, তারপর রাজ্যলাভের প্রশ্ন উঠবে। আর যদি তাঁরা ধর্মপথ পরিত্যাগ করে নিতান্তই যুদ্ধের বাসনা করেন তাহলে ত্রয়োদশীতে কৌরবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-লাভ করে তাঁদের অনুতপ্ত হতে হবে।" দ্রুপদরাজের অভিজ্ঞ দূতপ্রবর এর উত্তর জানতেন না এবং বাগ্মিতার সামর্থ্যও তাঁর ছিল না; তিনি অকৃতকার্য তথা বিড়ম্বিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন, যদিচ কৌরবেরা তাঁর সঙ্গে সজ্জনোচিত ব্যবহারই করেছিলেন।

কর্ণের ভাষণ কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে শঙ্কিত করে তুলে-ছিল। নিশ্চিত যুদ্ধের আশঙ্কায় তিনি বিরত বোধ করতে লাগলেন। তখনকার মতো যাতে সমস্যার সমাধান পেছিয়ে দেওয়া যায়, তিনি সেই চেষ্টাই করলেন। তিনি সভাকে জানালেন যে তিনি সেইদিনই সঞ্জয়কে পাণ্ডব-দের কাছে দূত নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু কী তাঁর বক্তব্য, সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না। পাঞ্চাল পুরোহিতের সামনেই এই কথা হল। তাঁকে সৎকার প্রদর্শন করে পাণ্ডবদের শিবিরে প্রেরণ করা হল। বহিরা-গত ব্যক্তিকে বিদায় দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সভায় আহ্বান করে নিয়ে এলেন; তারপর তাঁকে বললেন, "তুমি শীঘ্র রথ নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে যাও। তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করে জানাবে যে তাঁদের সব সংবাদই আমি অবগত আছি এবং তাঁরা যে কত শক্তিশালী তাও আমার অবিদিত নেই। আমি সর্বদাই পাণ্ডবদের শান্তি কামনা করি। আমার নিজের মত হচ্ছে এই যে, যুদ্ধের আগেই তাঁর ন্যায্যভাগ তাঁকে প্রদান করা কর্তব্য; কিন্তু আমার মন্দবুদ্ধি অনাভিজ্ঞ পুত্র মনে করছে যে তার অংশ সে অনায়াসেই নিজের অধিকারে রাখতে পারবে। যাতে এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের আগুন না জ্বলে ওঠে এবং সবাইকার হিত হয়, তুমি পাণ্ডবদের সেই-রকমভাবে বোঝাবে এবং উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করে উপস্থিত রাজগণের মধ্যে সেইরকম বাক্য প্রয়োগ করবে।" ধৃতরাষ্ট্র এখানে ইঙ্গিত করলেন যে, যেহেতু তিনি নিজে রাজা নন, সেহেতু তিনি সরাসরি রাজ্যাংশপ্রদানের কোনো আদেশ জ্ঞাপন করতে অসমর্থ; তিনি তাঁর মনোভাব জানাতে পারেন মাত্র। কিন্তু, পাণ্ডবদের যখন খাণ্ডবপ্রস্থ প্রদান করা হয় তখন সেই আদেশ দিয়ে-ছিলেন তিনি নিজে, দুর্যোধন নন। অবশ্য তখনও দুর্যোধন হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করবার জন্য আদৌ বিবেচিত হন নি। কার্যত, রাজা চালাচ্ছিলেন ভীষ্ম এবং ধৃতরাষ্ট্র—এই দুজনে। তথাপি, তিনি সেই মুহূর্তে যদি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের রাজ্যাংশ প্রদান করতে আদেশ করতেন তাহলে দুর্যোধন তাঁকে কোনো-ক্রমেই অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। দুর্যোধন কখনও পিতার আদেশ অমান্য করেন নি। যদিও ধৃতরাষ্ট্র বার-বার লোকসমাজে জানাতেন যে পুত্রেরা তাঁর কথা শোনে না, তথাপি খুব সাধারণ বিষয় ছাড়া যে-কোনো গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে দুর্যোধন পিতার আদেশ লঙ্ঘন করবার মতো দুর্বিনীত ছিলেন না। যুদ্ধে পিতার সম্পূর্ণ গড় অভিপ্রায় আছে জেনেই তিনি সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন। সঞ্জয়কে যেভাবে উপদেশ দেওয়া হল তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ইচ্ছা ছিল রাজ্যাংশ না প্রদান করা এবং এই কপটতাই তাঁর পক্ষে সর্বনাশ ডেকে আনল। সেই মুহূর্তে মাতা

গান্ধারীও নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারতেন, কিন্তু তিনিও মৌন রয়ে গেলেন। এতে মনে হয়, তিনিও নিভৃত অন্তরে চাইতেন—দুর্যোধন একলা রাজত্ব করুন। গান্ধারীর সত্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে কিন্তু সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যশাসনে তাঁর দৃঢ় হস্তক্ষেপও প্রশংসনীয় হত, যেক্ষেত্রে তাঁর স্বামী নিয়ত দোলাচলচিত্ত এবং সন্তানস্নেহে একান্তভাবে আপ্লুত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গান্ধারী রাজসভায় উপস্থিত হয়ে একা-ধিকবার দুর্যোধনকে সন্ধির জন্য স্বীকৃত হতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তখন সময় পার হয়ে গেছে—দুর্যোধন মনস্থির করে ফেলেছেন।

সঞ্জয় বিরাটনগরে উপস্থিত হয়ে সর্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরের কুশলসংবাদ গ্রহণ করলেন। যুধিষ্ঠিরও প্রতিসম্ভাষণে কৌরবদের সকলের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানতে চাইলেন, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর প্রদত্ত গ্রামসমূহ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে প্রত্যাহরণ করেছেন কি না, অথবা তিনি যাদের বৃত্তিপ্রদান করতেন তাঁদের বৃত্তিলোপ করেছেন কি না। উত্তরে সঞ্জয় বললেন যে যাঁদও সাধু, অসাধু উভয়প্রকার লোকেই দুর্যোধনের পক্ষে আছেন, তথাপি তিনি শত্রুদেরও দান করে থাকেন এবং তিনি যে ব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তিলোপ করবেন—সেটা অসম্ভব। এইভাবে দুর্যোধনের চরিত্রগত মহানুভবতার উল্লেখ করে সঞ্জয় তাঁর বক্তব্য উত্থাপিত করতে আরম্ভ করলেন। সূচনায় তিনি বললেন, "রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ অনুমোদন করছেন না। তিনি সন্ধিবিষয়টি স্বরান্বিত করবার জন্যই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনারা সেই বিষয়ে অনুমোদন করুন। আমরা যুদ্ধ সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশঙ্কিত বোধ করছি এবং আমি আপনাদের সঙ্গে বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতির শরণাপন্ন হচ্ছি।" সঞ্জয় এখানে রাজ্যার্ধের প্রসঙ্গ একেবারেই উত্থাপন করলেন না, তিনি কেবলমাত্র পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধোদ্যম যাতে বন্ধ হয়, সে বিষয়ে আবেদন জানালেন। অর্থাৎ, তিনি যে কেবল যুদ্ধবিরতিসম্পর্কিত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, সেটাই জানাতে চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যার্ধপ্রদান সম্বন্ধে নিজের অক্ষমতার কথা যা বলেছিলেন, সেটিকে দুর্বল যুক্তি বোধ করে সঞ্জয় সেই প্রসঙ্গ না তোলাই শ্রেয় মনে করলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রসঙ্গই তাঁর উত্তরে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, "দেখো বৎস সঞ্জয়, (বৎস সম্বোধনে সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ছিলেন বলে মনে হয় এবং এর পরে যুধিষ্ঠির তাঁকে অর্জুনের আত্মসম সখা বলাতে অনুমান হয় যে সঞ্জয় অর্জুনের সমবয়স্ক ছিলেন।) আমি তো তোমার কাছে যুদ্ধের অভিলাষ প্রকাশ করি নি। তবে, তুমি কিসের জন্য যুদ্ধের বাসনায় ন্যস্ত হচ্ছ? যদি সহজে অর্থ সিদ্ধ হয় তাহলে কেউ কি যুদ্ধ বাসনা করে? আমরা বনবাসে আসবার পর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সঙ্গে আমাদের অতুল ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করে সেই মহারাজ্যকে নিষ্কণ্টক বিবেচনা করেছিলেন। তিনি এখনও প্রভূত ঐশ্বর্য ভোগ করেও পরিতৃপ্ত হচ্ছেন না এবং আমাদের অর্থসম্পত্তি নিজের বলে জ্ঞান করছেন। এই অবস্থায় শান্তি রক্ষিত হতে পারে না। এখনও যদি দুর্যোধন আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের চিহ্নস্বরূপ আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দেন তাহলে আমি শান্তিপক্ষ অব-লম্বন করব—এটা তোমাকে নিশ্চিতরূপে জানাতে পারি।" কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ধারণা যথার্থ ছিল না, কারণ তাঁদের সমুদয় রাজ্যসম্পত্তির কোনো-কিছুই দুর্যোধন বা তাঁর পিতার অধিকারে ছিল না। পাণ্ডবগণ যে মুহূর্তে বনগমন করেন সেই মুহূর্তে দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে তাঁদের সমুদয় রাজ্য যুধিষ্ঠিরের অনুপস্থিতিতে দ্রোণাচার্যকে প্রদান করা হয়েছিল এবং দ্রোণ সেই দান প্রতিগ্রহ করেছিলেন। তখন তিনি বলে-ছিলেন যে, "এই সুখ হেমন্তকালীন তালচ্ছায়ার মতোই মুহূর্তমাত্র স্থায়ী; অতএব প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করো, ভোগ করো এবং দান করো। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হলেই তোমাদের বিপন্ন হতে হবে।"—ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হলে যখন পাণ্ডবপক্ষ থেকে খাণ্ডবপ্রস্থ দাবি করা হল, তখন দ্রোণ একবারও এ বিষয়ে মুখ খুললেন না এবং কৌরবগণও এই দানের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন বলে মনে হল। তাঁরা তো খুব সুযুক্তি অনুসারেই একথা বলতে পারতেন যে পাণ্ডব-দের বিষয়সম্পত্তি তাঁরা আগেই দ্রোণাচার্যকে প্রদান করেছেন, অতএব পাণ্ডবেরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন বিপ্রসাং বিষয়টি তাঁরা তাঁদের পিতৃতুল্য গুরুর কাছ থেকে পুনর্বার কামনা করবেন কিনা। তাহলে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সংকটের মধ্যে পড়ে যেতেন এবং সমগ্র ঘটনা অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়ে যুদ্ধের নিবৃত্তি ঘটাতে পারত।

কিন্তু, আসল ব্যাপার যেটা ঘটেছিল, সেটা হচ্ছে এই যে, বিষয়টা নামেই দ্রোণাচার্যের সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়েছিল, কৌরবেরাই তার সমস্ত ভোগদখল করে আসছিলেন। সেই কারণেই কার্যত খাণ্ডবপ্রস্থ দুর্যোধনের অধিকারেই চলে এসেছিল। কিন্তু তথাপি নীতিগতভাবে প্রশ্নিত পাণ্ডবদের সমগ্র বিষয়সম্পত্তি দ্রোণের বিষয়-ভুক্ত বলেই গণ্য হওয়া উচিত এবং মহাভারত এ বিষয়টি কেন উত্থাপন করেননি তার কোনো সদুত্তর নেই। এবিষয়ে দ্রোণের নীরবতা বস্তুত অত্যন্ত পরিতাপজনক এবং ব্রাহ্মণোচিত সততার গুরুতর অভাব তাঁর চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর প্রত্যক্ষভাবেই এই দানের কথা জানতেন। ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে মৌন অবলম্বন করা স্বাভাবিক হলেও এত বড়ো ধর্মজ্ঞ বিদুর বিষয়টি চেপে গেলেন কোন্ উদ্দেশ্যে। তাঁরও উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না, কারণ এটাও তাঁর বিভেদপন্থার একটা বিশেষ কৌশল।

যাই হোক, সঞ্জয় এবারও প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যপ্রদানের কোনো উল্লেখ না করে বললেন, "মহারাজ, আপনি ধর্মানুগত ; অতএব ক্রোধভরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংহারে প্রবৃত্ত হবেন না। কৌরবগণ তা হলে বিনা যুদ্ধে কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করবেন না। আপনি যদি শেষ পর্যন্ত এই জ্ঞাতিবধের মতো পাপানুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হন তাহলে কিসের জন্য এত বৎসর ধরে বনবাসের দারুণ ক্লেশ সহ্য করলেন? বহুরাজ্য তখনও আপনার বশীভূত ছিল এবং সেই সময়েই আপনি যথেষ্ট সহায়-সম্পন্ন হয়ে দুর্যোধনকে পরাস্ত করতে পারতেন। কিন্তু, তা না করে, বহু বৎসর বনে কাটিয়ে আপনি অপর পক্ষের বলকে বর্ধিত করবার সুযোগ দিয়েছেন এবং নিজের সহায়বর্গের বল হ্রাস করেছেন। এখন এই অনুপযুক্ত সময়ে আপনি কী ভেবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছেন? আমার অনুরোধ আপনি জ্ঞাতিদ্রোহের মতো পাপানুষ্ঠান করে সজ্জনের পথ কদাচ পরিত্যাগ করবেন না।" স্পষ্টতই সঞ্জয়ের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ থেকে পাণ্ডবদের আগে নিবৃত্ত করা। এই কারণেই তিনি বললেন একবার যুদ্ধের সূচনা হলে রাজ্যবিভাগের প্রশ্ন আর থাকবে না এবং তখন কৌরবগণ যুদ্ধ দ্বারাই সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবেন। অতএব, পাণ্ডবপক্ষ যদি যুদ্ধে না অবতীর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলেই বিষয়লাভের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু যুধিষ্ঠির বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সম্পত্তি প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত আগে না গৃহীত হলে তিনি যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবার কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত হলেন না। তিনি বললেন, "সঞ্জয়, তুমি আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করতে চাইছ ; কিন্তু আমাকে তিরস্কার করবার পূর্বে তোমার সবিশেষ জানা উচিত, আমি যা আচরণ করছি, তা ধর্ম কি অধর্ম। যে লোক বিপদ্‌গ্রস্ত না হয়েও আপৎকালের অনুরূপ ব্যবহার করে সে নিন্দনীয়, কিন্তু বিপন্ন হয়েও যে আপৎধর্মকে উপেক্ষা করে, সেও সেই পরিমাণেই নিন্দনীয়। কোথায় অধর্ম ধর্মের রূপ ধারণ করে এবং কোথায় ধর্ম অধর্মের মতো প্রতীয়মান হয়, তা প্রজ্ঞাবলে নির্ধারণ করা যায়। আমি তা নির্ণয় করেই তোমার সঙ্গে আলোচনা করছি। কৃষ্ণ এখানে উপস্থিত আছেন ; তিনি কৌরব এবং পাণ্ডব উভয়কুলের হিতৈষী। এখন তিনিই বলুন যে যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহলে নিন্দনীয় হব কিনা ; আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয় কিনা। তিনিই বলুন এস্থলে আমার কী কর্তব্য হতে পারে।" কৃষ্ণ সময়োচিত উত্তেজনা প্রদর্শন করে কঠোর ভাষায় সঞ্জয়ের বক্তোক্তির প্রত্যুত্তরস্বরূপ বললেন—"সঞ্জয়, দেখা যাচ্ছে তুমি সব জেনেশুনেও কৌরবদের হিতসাধনে তৎপর হয়ে পাণ্ডবদের নিগ্রহচেষ্টা করছ। বোধ হয় তুমি পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধ ছেড়ে দিয়েই সন্ধি স্থাপন করতে বলছ। কিন্তু সেটা কিরকম সন্ধি হবে? ক্ষত্রিয়েরা কি এইরকম সন্ধি ধর্মসংগত মনে করেন? এস্থলে ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে ধর্মরক্ষা হয়, না যুদ্ধ না করলে ধর্ম রক্ষা হয়? তুমিই বলো, এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি। রাজা দুর্যোধন চিরন্তন রাজধর্ম অতিক্রম করে পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর কাজকেও তস্করের কাজ বলেই প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। অতএব, ন্যায্য বিষয়ের জন্য যুদ্ধ করে যদি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে হয় তাও প্রশংসনীয় ; তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারকার্যে বিমুখ হওয়া কোনোক্রমেই উচিত নয়। তোমারই বরঞ্চ কৌরবদের সভাস্থলে ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা উচিত এবং বলা উচিত যে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছেন। এখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর যা কর্তব্য নির্ধারণ করুন।" সঞ্জয় যে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন

চতুর বাসুদেব কৃষ্ণ সেইখানেই তাঁকে কঠিনভাবে আঘাত করলেন। রাজ্যভাগ সম্বন্ধে কোনো কথা বলা সঞ্জয়ের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক ছিল, কারণ ধৃতরাষ্ট্র ন্যায্য অংশ পাণ্ডবদের দিতে চাইলেও সেটি পরোক্ষে অস্বীকৃত হয়েছিল, যেহেতু তাঁর পুত্র সেরকম ইচ্ছা পোষণ করতেন না। সঞ্জয় যদি ঠিক এই উক্তিটি যুধিষ্ঠিরের গোচর করতেন তাহলে তিনি এই বলে হাস্যাস্পদ হতেন যে তাঁর দৌত্যকর্মে আসার সপক্ষে কোনো তাৎপর্য নেই। কিন্তু তিনি এটুকু বলতে পারতেন যে উভয়পক্ষের যুদ্ধচেষ্টার নিবৃত্তি ঘটানোই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায় ছিল। সেটা পাণ্ডবদের দিক থেকে স্বীকৃত হলে তাঁরা হাস্তিনায় যথাস্থানে গিয়ে রাজ্যভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু সেরকম উপদেশও তাঁকে দেওয়া হয় নি। অতএব তিনি আর কথা বাড়ালেন না, দুতসুলভ বিনয়প্রদর্শনের পর মার্জনা ভিক্ষা করে বিদায় গ্রহণ করলেন। কথাবার্তা এইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সঞ্জয়কে বিদায় দেবার পূর্বমুহূর্তে যুধিষ্ঠির আর-একটি প্রস্তাব তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, দুর্যোধন যদি কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং অন্য আর-একটি গ্রাম তাঁদের পাঁচভাইকে প্রদান করেন তাহলেও তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন এবং আর যুদ্ধে অগ্রসর হবেন না। যদিও এই দাবিকে তাঁর রাজ্যের একাংশ বলা হয়েছে তথাপি এই অংশটি নেহাত কম ছিল না, কারণ প্রত্যেকটি স্থানই ছিল এক-একটি বৃহৎ এবং প্রধান জনপদ, এবং এই ভূখণ্ড লাভ করলে পাণ্ডবেরা অচিরকালমধ্যেই একটি সমৃদ্ধ বৃহৎ রাজ্য গঠন করতে পারতেন। যাই হোক, সঞ্জয় হাস্তিনায় ফিরে এসে একান্তে ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথাই জানালেন যে দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে যে রাজ্যার্ধ প্রদান করা হয়েছিল তিনি সেইটুকুই গ্রহণ করতে অভিলাষ করেন। যদি এইটি কৌরবদের অভিপ্রেত না হয় তাহলে তাঁরা ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। এর পরে প্রকাশ্যে সভাস্থলেও তিনি পাণ্ডবদের যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হল এবং সন্ধির প্রস্তাবও কোনো মীমাংসায় পৌঁছাল না। এর পর সব ব্যাপারের অবসান ঘটল যখন বাসুদেব কৃষ্ণ স্বয়ং এসে কৌরবসভায় প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষভাবে পাণ্ডবদের প্রত্যেকটি দাবি জানালেন এবং কৌরবপক্ষের অস্বীকৃতি বহন করে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণের দৌত্যে কূটনীতি ছিল না, কারণ তিনি যা নিবেদন করেছিলেন তাতে অস্পষ্ট কিছুই ছিল না এবং তিনি কোনো কূটনীতির অবতারণা করতে চান নি, যেহেতু তাঁর আসার উদ্দেশ্যই ছিল যুদ্ধের নিশ্চয়তা নিরূপণ। সেটা প্রায় সর্বসম্মতভাবেই স্থির হয়ে গেল এবং এইখানেই মহাভারতের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক রাজনৈতিক মতবিনিময়েরও পরিসমাপ্তি ঘটল। অনেকে মহাভারতের উদ্যোগপর্বের এইসব বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করতে চান না, তাঁরা আখ্যানভাগের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন ; কিন্তু এই প্রাক্‌যুদ্ধের মন্ত্রণাপর্বটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক, কেননা আজও এই ধরনের কূটনৈতিক বাক্‌বিনিময়ের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়।

ক্রান্তদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়

চার

শিয়ালদা স্টেশন। চিটাগং মেল। সৌম্যকে তুলে দিতে এসেছে জুলি, সঙ্গে বাড়ির গাড়ির ড্রাইভার। ট্রেন ছাড়তেই জুলি রুমাল নেড়ে বিদায় দেয়। সৌম্য কিছুক্ষণ বাইরে মাথা বাড়িয়ে তাকায়। তারপর সদ্য-কেনা প্রভাতী সংবাদপত্রে মুখ ঢাকে।

একটু দূরে বসে ছিলেন এক পরিচিত সহযাত্রী, সন্তোষ সাধুখাঁ। কুশলপ্রশ্নের পর তিনি আলাপ জুড়ে দেন। "গান্ধী মহারাজের ওটা কি সত্যিকার অসুখ, না ডিপ্লোমাটিক অসুখ? অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিংএ হাজির না থাকার অজুহাত? আছেন বোম্বাইতে, যোগ দিয়েছেন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে, অথচ এ. আই. সি. সি.-র বেলা অসুস্থ!"

সৌম্য জুলির কথা ভাবছিল। ভাবনায় ছেদ পড়ায় মনে মনে বিরক্ত হয়। বলে, "আজকাল তিনি কথায় কথায় গুরুদেবের গানের একটা পঙ্‌ক্তি আওড়ান। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।' ওঁর ছেলেরা এখন সাবালক হয়েছে। বাপের কথায় ওঠে না, বসে না। মানে মানে সরে থাকাই বুড়ো বাপের পক্ষে শ্রেয়। সিদ্ধান্ত যা নেবার তা ওরাই নিজেদের বিবেচনায় নেবে। ফলাফলের জন্যে নিজেরাই দায়ী হবে। আপৎকালে কংগ্রেস একটা সৈন্যদল। অন্য সময় একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। একজনের নির্দেশে নয়, অধিকাংশের মতে কাজ করবে। আজকের পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নেতারা সাবালক পুত্রের মতোই ব্যবহার করবেন। তাঁদের মধ্যেও সে-রকম একটা ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে জবাহরলালের মধ্যে। মনে হচ্ছে তিনিই বাপের বড়ো ছেলে। যদিও বয়সে বল্লভভাই-রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেয়ে ছোটো। বাপু তো অনেক আগে থেকেই ঘোষণা করে বসে আছেন যে জবাহরলালই তাঁর উত্তরাধিকারী।"

সন্তোষবাবু তা শুনে বলেন, "জবাহরলালের নেতৃত্ব কি কংগ্রেসসুদ্ধ সবাই মেনে নেবে? দেশসুদ্ধ তো দূরের কথা।"

"তা যদি বলেন, দেশসুদ্ধ লোক কি গান্ধীজীকে মানে? তাঁকে ভক্তি করে সবাই, কিন্তু কেউ তাঁর একটি কথাও মানে না। উপায় হিসাবে অহিংসার উপরে কারো

বিশ্বাস নেই। গত মহাযুদ্ধে জার্মান পক্ষে দু কোটি আর রুশ পক্ষে দু কোটি লোক মারা গেছে। এ ছাড়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষেও বহু লোক মরেছে। কিন্তু কোথাও কি হিংসার প্রেস্টিজ কমেছে? আমাদের এ দেশেও না। বাপু এখন রাশ ছেড়ে দিচ্ছেন। কংগ্রেস যদি স্বেচ্ছায় অন্য পথ নিতে চায় নিতে পারে। তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে কংগ্রেস নির্বাচনে নামবে। যদি জেতে, আবার মন্ত্রিত্ব করার আহ্বান পেলে আবার মন্ত্রিত্ব করবে। অবশ্য জিন্না সাহেব যদি বাগড়া না দেন। তিনি পাঁচ বছর আগে থেকে শাসিয়ে রেখেছেন যে তুলকালাম কাণ্ড করবেন।" সৌম্য স্মরণ করে।

"বাপরে, বাপ! জিন্না সাহেব! গান্ধীজী সতেরো বার তাঁর দরবারে হাজির হয়েছেন। তিনি একবারও রিটার্ন দেন নি। দ্বিতীয় এক বড়লাট আর কী! বড়লাটকেও কি তিনি তোয়াক্কা করেন? সিমলা বৈঠকটা তো তাঁর জেদের জন্যেই ভেস্তে গেল। ওয়েভেল চেয়েছিলেন লীগের বাইরে থেকে একজন ইউনিয়নিস্ট মুসলমান। তাঁরা যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। জিন্না বাদ সাধলেন। লীগপন্থী ভিন্ন আর কেউ মুসলিম প্রতিনিধি হতে পারে না। যাঁর অনমনীয় জেদের কাছে রাজপ্রতিনিধি পর্যন্ত নতজানু, তিনি তুলকালাম কাণ্ড করলে কংগ্রেস নাচার।" সন্তোষবাবু বলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। সৌম্যর মাথায় গান্ধী টুপি দেখে জনতার ভিতর থেকে একজন মৌলবী সাহেব বলে ওঠেন, "দাদাজী, এমন দিন ছিল যখন জিন্না সাহেবই মহাত্মাজীকে বাঁচাবার জন্যে বোম্বাই থেকে বারডোলি ছুটে যান। তাঁর দৌড়ের জন্যেই তো সেবার গণসত্যাগ্রহ শুরু হবার আগেই বন্ধ হল। অসময়ের বন্ধুই তো আসল বন্ধু। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে, তাঁর দলের লোকদের বাদ দিয়ে সাত-আটটা প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করলে তাঁর মান থাকে কোথায়? আরো আগে সাধারণ নির্বাচনের সময় মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলিতে লীগ-প্রার্থী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-প্রার্থী মুসলমানদের খাড়া করা হয়েছিল। মুসলমানে মুসলমানে লড়াই বাধিয়ে দেওয়াটা কি ইংরেজ শাসকদের মতো হিন্দু শাসনপ্রত্যাশীদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নয়? গান্ধী মহাত্মাকে চেপে ধরলে তিনি বলবেন তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন। কায়দে আজমের সঙ্গে কথাবার্তার সময় তাঁর ওই একই কৈফিয়ত। তিনি কংগ্রেসের হয়ে কথা বলবার অধিকারী নন। আবার সাধারণ নির্বাচনের দিন আসছে। আবার তেমনি ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হতে যাচ্ছে। দাদাজী, আপনি কি সেটা ভালো মনে করেন? যদি না মনে করেন তো গান্ধী মহাত্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের সঙ্গে আপসে আসন ভাগ করে নেয় তা হলে তার সুর বদলে যাবে। সে আর পাকিস্তানের ধুয়ো ধরে নির্বাচনের কেল্লা ফতে করতে চাইবে না। আমরা মুসলমানরাও বুঝি যে পার্টিশন আমাদের পক্ষেও ভালো নয়। কিন্তু কংগ্রেসী মুসলমানদের কাছে হার মানতেও আমরা নারাজ। ওঁরা দেশের জন্যে জেলে গেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা ঠিক। কিন্তু হিন্দুস্তানের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের দিক থেকে চিন্তা করলে কায়দে আজমের মনোনীত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত নয়। আমিও তো এক কালে কংগ্রেস ছিলুম। জেলেও যে যাই নি তা নয়। কিন্তু এখন আমার বিচারে কায়দে আজমের হাত শক্ত করাই মুসলমানদের সকলের কর্তব্য।"

সৌম্য হতবাক। জাপানিদের আক্রমণের মুখে যাদের বাঁচাতে সে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়েছিল তারাই এত সহজে ভুলে গেল কংগ্রেসের কী ভূমিকা আর লীগের ভূমিকাটা কী। মহাত্মার অনশনের কথা ইতিমধ্যেই ভুলে গেছে। যাক গে!

"দেখুন, মিঞা ভাই, আপনি নিজেই তো একদিন কংগ্রেসে ছিলেন। আপনার নিজেরও একটা দাবি আছে কংগ্রেস থেকে দাঁড়াবার। দলে ভারি হলে মন্ত্রী হবার। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের মতো নির্যাতন সহ্য করেছে কে? খান আবদুল গফফর খান নির্বাচনে বিশ্বাস করেন না, মন্ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনিও গান্ধীজীর মতো নিঃস্পৃহ সত্যাগ্রহী। আমিও তাঁদের অনুগামী। কংগ্রেস যদি নির্বাচনে না লড়ত, মন্ত্রিত্ব না চাইত তা হলে সত্যাগ্রহ আরো ভালো জমত, দেশের স্বাধীনতা আরো গৌরবময় হত। কিন্তু পলিসি স্থির করতে হয় পার্টির নাড়ী টিপে। নির্বাচনে নামতে না দিলে কংগ্রেস ভেঙে দুখানা হত। মন্ত্রিত্ব করতে না দিলেও তাই। ফলে যা হবার তা হয়েছে। গান্ধীজীর হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি একফোঁটাও বিরাগ বা বিদ্বেষ

নেই। কংগ্রেস মুসলমানদেরও পার্টি। যাঁরা পাকিস্তান চান না তেমন মুসলমানের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। মুসলমানরা একবাক্যে পাকিস্তান চাইলে তাঁদের গায়ের জোরে বাধা দেওয়া কংগ্রেস নীতি নয়। আপসও নয় কংগ্রেস নীতি। কংগ্রেসের নীতি অহিংস অসহযোগ। মুসলিম লীগকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস যাবে বনবাসে।"

মৌলবী সাহেব উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন, "অহিংস অসহযোগের বংশীধ্বনি শুনে আমিও তো কুলত্যাগ করেছিলুম, দাদাজী। কুলত্যাগ বুঝলেন না? স্কুল-ত্যাগ। মদের দোকানে পিকেট করতে গিয়ে মাস ছয়েক বন্দীও ছিলুম। সেসব দিন কি ভোলা যায়? তার পরে এল উলটোরথের দিন। প্রায় সবাই সুড়সুড় করে স্কুলে কলেজে ফিরে যায়। আমিও। অহিংস অসহযোগের উপর বিশ্বাস টলে যায়। নেতাদের অনেকেই কাউন্সিলে গিয়ে সরকারের সঙ্গে লড়বার নতুন কায়দা শেখান। মনে হল সেইটেই ঠিক পথ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপর আমার অগাধ আস্থা। হিন্দু-মুসলমানকে একজোট করতে হলে চাই নির্বাচিত সদস্যদের দু পক্ষের একটা চুক্তি। তার নাম বেঙ্গল প্যাক্ট। মুসলমান সদস্যদের কথা হল শতকরা পঞ্চান্নটা চাকরি তো মুসলমানদের এমনিতেই পাওনা। তার উপর আরো পঁচিশ দিতে হবে, যাতে তারা এগিয়ে-থাকা হিন্দুদের ধরে ফেলতে পারে। তা হলে দাঁড়ায় শতকরা আশি। অবশ্য সাময়িকভাবে। দেশবন্ধুর দরাজ দিল। তিনি এককথায় রাজি। কিন্তু মুশকিল বাধায় হিন্দু জনমত। আশি দূরের কথা, পঞ্চান্নতেও হিন্দুদের আপত্তি। তার মানে হিন্দুরা বরাবর এগিয়ে থাকবে, মুসলমানরা কোনো দিন তাদের ধরতে পারবে না। কংগ্রেস-লীগের লখনউ চুক্তি অনুসারে বাঙলাদেশের হিন্দুদের সংখ্যানুপাত কম বলে তারাই পাবে ওয়েটেজ। শতকরা পঞ্চাশের বেশি। তারা বড়ো জোর পঞ্চাশে রাজি হতে পারে। তার কম নয়। বি. সি. চ্যাটার্জির ফরমুলা হল ফিফটি ফিফটি। মুসলিম প্রতিনিধিরা নারাজ। অমনি করে বেঙ্গল প্যাক্ট ফেঁসে যায়। হিন্দু মুসলিম একজোট হয় না। দেশবন্ধু কাউন্সিলের ভিতরে গিয়েও ভোটের জোরে সরকারকে হারাতে পারেন না। তাঁর পলিসি ব্যর্থ হয়। তিনি মনের দুঃখে মারা যান। তখন থেকেই কংগ্রেসের উপর আমাদের অনাস্থা শুরু। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদের পর কংগ্রেসের মুখোস খুলে গেছে। তা বলে সব মুসলমান লীগপন্থী বনে গেছে তা নয়। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতি তো আর কোনো দল দিচ্ছে না। যে দল দিচ্ছে তারই ভোটে জেতার সম্ভাবনা বেশি। পাকিস্তান যদি হয় ভোটের জোরেই হবে। গায়ের জোরে নয়। সারা ভারতে মুসলমানদের ভোটের জোর হিন্দুদের তুলনায় কম, সারা ভারত পেলে মুসলিম লীগ ভোটের জোরে শাসন করতে পারবে না। তাই ভারতের একটা অংশই চায়। সমস্তটা নয়। আপনারা তো দুই-তৃতীয়াংশই পাবেন, তবে অহিংস অসহযোগ করতে যাবেন কোন দুঃখে!"

"বাঙালি হিন্দু, পাঞ্জাবি হিন্দু-শিখ, উত্তর-পশ্চিমের পাঠান—এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তান চাপিয়ে দিলে এরা তো বিদ্রোহ করবেই। করবে আসামের হিন্দু আর খ্রীষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও। যদি আসামকেও পাকিস্তানের শামিল করা হয়। বিদ্রোহ যাতে গৃহযুদ্ধের আকার না নেয় সেইজন্যেই তো আমাদের অহিংস অসহযোগ। আমাদের মানে গান্ধীজীর অনুগামীদের। কংগ্রেসের হয়ে আমি কথা বলতে পারব না। তিনি নিজেও পারবেন না। সেকালের যাঁরা নো-চেনজার একালে তাঁরাও হয়েছেন প্রো-চেনজার। কাকে নিয়ে কাজ করবেন গান্ধীজী? জিন্না সাহেব কি বুঝতে পারছেন না যে গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্তার চেয়ে জবাহরলাল, বল্লভভাই এবং আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ? পাকিস্তান আপসে পেতে হলে এঁদের সঙ্গেই আপস করতে হবে। গান্ধীজী আপস করবেন না। দরকার হলে অহিংস অসহযোগ করবেন।"

"আপস কে না চায়, দাদাজী?" মৌলবী সাহেব একান্ত আন্তরিকভাবে বলেন, "কিন্তু তার একটা পদ্ধতি আছে। চাই আর-একটা কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট। যেমনটি হয়েছিল লখনউতে ১৯১৬ সালে। উদ্যোক্তা হয়েছিলেন টিলক মহারাজ আর জিন্না সাহেব। আহা, টিলক মহারাজ যদি থাকতেন তা হলে কি জিন্না সাহেব পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করতেন? তেমনি চাই আবার এক বেঙ্গল প্যাক্ট। দেশবন্ধু যদি অকালে চলে না যেতেন তা হলে কি বাঙলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের আজকের এই হাল হত? কাগজ খুললেই গালিগালাজ, খিস্তি

খেউড়। মুসলমানমাত্রেই রাবণ, হিন্দুমাত্রেই রাম। কিংবা হিন্দুমাত্রেই শয়তান, মুসলমানমাত্রেই ফেরেস্তা। কই, আপনাকে তো রাবণের মতো দেখায় না, আর আপনিই বলুন, আমিও কি শয়তানের মতো দেখতে?"

সন্তোষ সাধুখাঁ বলে ওঠেন, "আরে না, না, ভাই-সাহেব। আপনাকে বরঞ্চ পীর সাহেবদের মতো দেখতে। আমরা হিন্দুরা পীরদের খুব মানি। আপনিই মিটিয়ে দিন না আজকের এই বৃথা কলহ। হিন্দু কি মুসলমানকে ছেড়ে বাঁচতে পারে, না মুসলমান হিন্দুকে ছেড়ে? পাকিস্তানের প্রস্তাবটা তো পরস্পরকে এলিয়েন করার পরিকল্পনা। মুসলমানের রাজ্যে হিন্দু থাকবে না, থাকলে এলিয়েন হিসাবে থাকবে। আর হিন্দুর রাজ্যে মুসলমান থাকবে না, থাকলে সে হবে এলিয়েন। হিন্দু-মুসলমানের অতীতের সম্পর্ক কি ছিল এলিয়েনের সঙ্গে এলিয়েনের সম্পর্ক? সিরাজের জন্যে হিন্দুরা যত কেঁদেছে আর কে তত কেঁদেছে? এই বিভেদ নবাবি আমলে ছিল না। এটা ইংরেজেরই সৃষ্টি। ইংরেজ বিদায় নিলেই এর বিলোপ ঘটবে। আপনি যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি কে জানেন? তিনি প্রথম সারির গান্ধীবাদী কর্মী সৌম্য চৌধুরী। সম্প্রতি দু বছর জেল খেটে ফিরছেন। ইংরেজকে ভারত ছাড়াতে গিয়ে এই দুর্ভোগ।"

"গোস্তাকি মাফ করবেন, দাদাজী।" মৌলবী সাহেব সশ্রদ্ধ হয়ে বলেন, "ছোটো ভাইয়ের নাম গোলাম রহমান। আপনি বাইরে এসেছেন, ভালোই হয়েছে। বাইরে না এলে বুঝতে পারতেন না পদ্মানদীর জল কতদূর গড়িয়েছে। আপনাকে বাইরেই থাকতে হবে, আবার জেলে গেলে চলবে না। জেলে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবেন। গান্ধী মহারাজও খেই হারিয়ে ফেলেছেন। সমস্যাটা শুধু ইংরেজদের থাকা না-থাকা নিয়ে নয়। হিন্দুদেরও থাকা না-থাকা নিয়ে। মুসলমানদেরও থাকা না-থাকা নিয়ে। সিরাজের আমল থেকে আমরা সবাই এখন বহুত দূরে সরে এসেছি। পরস্পরের উপর বিশ্বাস টলে গেছে। ইংরেজদেরকে যেমন কংগ্রেসওয়ালারা ভারত ত্যাগ করতে বলছেন, তেমনি কংগ্রেসওয়ালাদেরও লীগওয়ালারা বলছেন পাকিস্তান ত্যাগ করতে। ইংরেজরা ভারত ছাড়লে হিন্দুরাই সমগ্র ভারত পাবে, তাই মুসলমানরা চায় ভারতের একাংশ। মুসলিম ভারত বা পাকিস্তান। এই ভাগাভাগির থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট আর বেঙ্গল প্যাক্ট। জিন্না সাহেবের সঙ্গে দরাদরি করতে হবে মহাত্মা গান্ধীকে। হক, নাজিম, সুহরাবর্দীর সঙ্গে দরাদরি করতে হবে শরৎচন্দ্র, কিরণশঙ্কর, শ্যামাপ্রসাদকে।"

সৌম্য অন্যমনস্কভাবে বলে, "আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু একটি শর্তে। আগে ইংরেজরা ভারত ছাড়বে, তারপরে নেতাদের মধ্যে দরাদরি বা ভাগাভাগি হবে। যাবার বেলা ওঁরা লীগনেতাদের হাতেই সারা ভারত সঁপে দিয়ে যাক।"

এবার আরো কয়েকজন তর্কে যোগ দেন। তর্ক করতে করতে সবাই যখন অন্যমনস্ক তখন ট্রেন এসে দাঁড়ায় রানাঘাট স্টেশনে। বহু যাত্রী নেমে যায়, বহু যাত্রী ওঠে। হঠাৎ এ কী! এ কে! জুলি!

"কেমন আছ, সৌম্য? কষ্ট হচ্ছে না তো? যা ভিড়।" জুলি বলে।

"তুমি এলে কোত্থেকে?" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"মেয়েদের কামরা থেকে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এক মিনিটের মধ্যেই মনঃস্থির করি যে তোমার সঙ্গেই যাব। নইলে তোমার জন্যে দিনরাত ভেবে মরব। ড্রাইভারকে বলি মাকে জানাতে। আর চেকারকে বলি প্ল্যাটফর্ম টিকিট নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস টিকিট দিতে। এখানে ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়ায়? একটা টেলিগ্রাম করতে হবে মুস্তাফী মেসোমশায়কে যে, তোমার সঙ্গে আমিও আসছি।" জুলি একনিঃশ্বাসে বলে যায়।

"কী কাণ্ড! লোকে ভাববে তোমাকে নিয়ে আমি ইলোপ করছি।" প্ল্যাটফর্মে নেমে টেলিগ্রাফ অফিসের খোঁজে যেতে যেতে বলে সৌম্য। আর কেউ শুনতে পায় না কি না কে জানে!

"সেটা ভুল। আমিই তোমার সঙ্গে ইলোপ করছি।" জুলি হাসে।

গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে দেখে হুড়মুড় করে ওরা দুজনেই সৌম্যর কামরায় উঠে পড়ে।

জুলিকে উঠতে দেখে তিন-চারজন পুরুষ জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হন। সে হাত জোড় করে মাফ চায়, ধন্যবাদ দেয়। আসন করে নেয় সৌম্যর পাশাপাশি। বলে, "পরের স্টেশনেই আমি নেমে যাব।"

পরের স্টেশনে গাড়ি অল্পক্ষণ থামে। সেখানে নামা নিরাপদ নয়। এর পরে পোড়াদা জংশন। রিফ্রেশমেন্ট রুমে গিয়ে ওরা উপবাস ভঙ্গ করে। তারপর যে যার কামরায় যায়।

গোয়ালন্দে নেমে ওরা চাঁদপুরের স্টীমারে ওঠে। এবার আর ঠাঁই-ঠাঁই নয়। একসঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন। একসঙ্গেই ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পদ্মা-নদীর রূপ অবলোকন। গল্পগুজব। নানা কথা।

"রাইন ট্রিপ মনে পড়ে যায়। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে ছিলে না। ছিল সুকুমার।" জুলি বলে সসংকোচে।

"আমারও মনে পড়ে। আমিও নিঃসঙ্গ ছিলুম না। ছিলেন আমার এক বিদেশিনী বান্ধবী।" সৌম্য বলে অসংকোচে।

"তা হলে তুমি ওঁকেই বিয়ে করলে পারতে?" জুলির অভিমান।

"খেপেছ! তাঁর সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক নয়। বিয়ে করলে করতুম অলকাকে। কিন্তু তা হলে আমাকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতে হত। আমার জীবনের ধারাভঙ্গ হত। অলকার ভালো বিয়ে হয়েছে। ও সুখেই আছে।" সৌম্য তাকে ভোলে নি।

"অলকাকে নিয়ে রাইন ট্রিপ করলে না কেন তাই ভাবছি। তোমার মতো স্বদেশী মানুষের কেন বিদেশিনী বান্ধবী?" জুলি কটাক্ষ করে।

"উনিও ভারতভক্ত আর শান্তিবাদী। আমাদের শান্তিই বলেছে, বসুধৈব কুটুম্বকম্। আমি তো লঘু-চেতা নই যে একে আপন ওকে পর ভাবব। স্বাধী-নতার জন্যে লড়েছি, আবার লড়ব, কিন্তু শত্রুভাবে নয়, বন্ধুভাবে।" সৌম্য বলে।

"সেইখানেই তো তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ আর পথভেদ। তোমার বিশ্বাস ইংরেজদের অন্তঃপরিবর্তন হবে। যেন প্রত্যেকেই এক-একটি অ্যান্ড্রুজ সাহেব বা মীরা বেন। গান্ধীজীর ওই এক ধারণা। অন্তঃপরি-বর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্যে কষ্ট যা সইবার তা আমাদেরই সইতে হবে। ওদের নয়। কেন, ওদের নয়, কেন? সত্যি, ভগবানের কী অবিচার! রাশিয়া আর জার্মানি ধ্বংস হয়ে গেল, ইংলন্ডের গায়ে আঁচড়টি লাগল না। যেটুকু লাগল সেটুকু ধর্তব্যই নয়। কী ভাগ্যবান ওরা! জিতে গেল শঠতার জোরে। কমিউনিস্ট রাশিয়া, তার সঙ্গে ক্যাপিটালিস্ট ব্রিটেনের আঁতাত। অবিকল প্রথম মহাযুদ্ধের মতো। যেন বিশ্রীবটা মায়া। দেখে-শুনে গা জ্বালা করে। বাবলীটা জিতে গেল।" জুলির ক্ষোভ।

"ওসব হল উচ্চ রাজনীতি। কার সাধ্য বোঝে। সবাই তো ধরে নিয়েছিল চেম্বারলেন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। জার্মানিকে লড়তে দেবেন রাশিয়ার সঙ্গে। রাশিয়াকে জার্মানির সঙ্গে। ব্রিটেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবে। কিন্তু চার্চিল হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নতুন শত্রু হিট-লারকে টিট করতে পুরোনো শত্রু স্টালিনের সঙ্গে হাত মেলালেন। মান অপমান তুচ্ছ করে ছুটে গেলেন মস্কোতে, খোসামোদ করলেন, 'মার্শাল স্টালিন'! 'মার্শাল স্টালিন'! যেন কতকালের ইয়ার! খানাপিনার বহর কত! চার্চিলের পেট টইটম্বুর। একটা আস্ত শুওরছানাকে রোস্ট করে এনে চার্চিলের সামনে রাখা হয়। পেটে তিলধারণের ঠাঁই নেই। খেলে গোটা খেতে হত। কেটে নিলে চলত না। চার্চিল মাফ চান। তখন স্টালিন সেটাকে নিজের পাতে টেনে নিয়ে অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করেন। চার্চিল তো হাঁ! ওদিকে হিটলার হলেন পরম নিরামিষাশী। সসেজটুকুও মুখে তুলবেন না। যেটা শশার মতো সব জার্মান কামড়ে খায়।" সৌম্য নিজে নিরামিষভোজী।

"ভগবানের কী অবিচার! নিরামিষ খায় যে হাতি তারই হয় হার। আমিষ খায় যে সিংহ তারই হয় জিত। তুমি ভাবছ গান্ধী জিতবেন। সরকার হারবে। দুরাশা! সেটা তোমাদের দুরাশা!" জুলি সহানুভূতির স্বরে বলে।

"গান্ধী জিতবেন কেন বলছ? সত্যাগ্রহ জিতবে। সত্য আর অহিংসা মিলে যে অস্ত্র তার নাম সত্যাগ্রহ। এ অস্ত্র পরাজয় জানে না, মানে না। তবে এর জয় যুদ্ধ-ক্ষেত্রে জয় নয়, যা সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এর জয় প্রতিপক্ষের হৃদয়কন্দরে। প্রতিপক্ষ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, হাত মেলাও। আর ঝগড়া নয়। এখন থেকে সদ্-ভাব। গান্ধী-আরউইন চুক্তি। তেমনি একটা চুক্তি হতে পারত লিনলিথগাউয়ের সঙ্গে। হল না। হতে পারে ওয়েভেলের সঙ্গে। হচ্ছে না। হতে পারে তাঁর পরে যিনি আসবেন তাঁর সঙ্গে। এখন থেকে আশা ছাড়বেন কেন? বাপু চিরকাল আশাবাদী।" সৌম্যও তাই।

"গান্ধী-বড়লাট চুক্তি ওই একবারই হয়েছিল। আর হয় নি, হবেও না। ওটা ব্রিটিশ পলিসি নয়। ওরা জিন্নাকেও গান্ধীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। জিন্না সেটা জানেন বলেই গোঁ ধরে বসে আছেন তাঁর পাকিস্তান চাই। তাতে গান্ধীর জয় নয়, পরাজয়। আমি তো আশাবাদের লেশমাত্র কারণ দেখছি নে। লড়তে আবার হবেই। আর সেটা অহিংস মতে নয়। কিন্তু আমি আর লড়তে চাই নে। বিয়ে করে ঘরসংসার পাততে পারলেই ধন্য হব।" জুলি আন্তরিকভাবে বলে।

"তোমাকে আমি আর লড়তে বলব না। কিন্তু আমি লড়তে চাইলে তুমি যেন বাধা না দাও।" সৌম্যর আকুল মিনতি।

"বাধা দেওয়া দূরে থাক, আমিও তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ব। যদি না খোকাখুকুরা বাধা দেয়।" জুলি মিষ্টি হেসে বলে।

"তার মানে কি দুটি?" সৌম্য কৌতুক করে।

"দুটি না হলে ভাইবোনের জুটি হয় না। সেটাই তো কাম্য। তবে কে বলতে পারে কী হবে না হবে!" জুলি গম্ভীর হয়ে যায়।

"আমি চাই নে যে আমার ছেলেমেয়েরা ব্রিটিশ প্রজা হয়। তোমারও চাওয়া উচিত নয়। সবুর করতে হবে।" সৌম্য দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

"সবুর করতে-করতে মা হবার বয়স পার হয়ে যাবে। যারা জন্মাতে চায় তারা জন্মাতে পারবে না। এ কী রকম অহিংসা! আমি তো মনে করি ব্রহ্মচর্য ও একপ্রকার হিংসা।" জুলি বেপরোয়া হয়ে বলে।

সৌম্য চমকে ওঠে। "কই, একথা তো কোনোদিন শুনি নি। তোমার মুখেই প্রথম শুনছি। কোথায় পড়েছ? কে লিখেছে?" সৌম্য জানতে চায়।

"কোথাও পড়ি নি। কেউ লেখে নি। এটা আমার মৌলিক চিন্তার ফল। আবার বলছি, ব্রহ্মচর্য ও একপ্রকার হিংসা। যারা জন্মাতে চায়, জন্মাতে পারত, তাদের প্রতি হিংসা।" জুলিও দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

"যাদের অস্তিত্ব নেই তারা জন্মাতে চাইবে কী করে? ওটা তোমার সন্তানকামনার কল্পরূপ।" সৌম্য হেসে উড়িয়ে দেয়।

"তুমি কি বলতে চাও যে জন্মের আগে তোমার অস্তিত্ব ছিল না? আমার অস্তিত্ব ছিল না? বলতে পার সাকার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু নিরাকার অস্তিত্ব? যেমন পরমাত্মার।" জুলি চেপে ধরে।

সৌম্য স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে আত্মা থাকলে তার অস্তিত্বও থাকে। সাকারভাবেই হোক আর নিরা-কারভাবেই হোক।

"আত্মার অস্তিত্ব যদি থাকে তবে নিরাকার আত্মা সাকার হতে চাইবে, তোমার আমার কল্যাণে সাকার হবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? আমি তো স্পষ্ট অনু-ভব করি যে অজাত শিশুরা জন্মানোর অপেক্ষায় আছে। কী করবে, বেচারিরা অসহায়! একটি মা থাকাই যথেষ্ট নয়, একটি বাপও থাকা চাই। বাপ না থাকলে মা-ও অসহায়। পৃথিবীতে কত রকম দুঃখ আছে। এটাও একরকম দুঃখ।" জুলি করুণ কণ্ঠে বলে।

"তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিলে, জুলি। তোমাকে যারা পাগলী বলে তারাই পাগল। তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে পারা কঠিন। তোমার মতো বুদ্ধিমতী নারী ওই এক-জনই ছিলেন। সাবিত্রী। যমকেও তর্কে হারিয়ে দিলেন। তুমি কি পূর্বজন্মে সাবিত্রী ছিলে?" সৌম্য সবিস্ময়ে, সকৌতুকে সুধায়।

"সব মেয়েই সাবিত্রী। কেউ কম, কেউ বেশি। সবাই তো আর শতপুত্র চায় না। কারো কারো একটিই যথেষ্ট।" জুলি উত্তর দেয়।

সৌম্য হেসে বলে, "হিসেব করে দেখছি কবার যমজ, কবার ত্রয়ী, কবার চতুষ্টয় জন্মালে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে শতপুত্র হয়। সাবিত্রীদের শুধু দীর্ঘজীবী নয়, দীর্ঘযৌবনা হতে হবে।"

"পোড়া কপাল! মেয়েরা কি কুকুর-বেড়াল যে এক-সঙ্গে এতগুলির জন্ম দেবে? পয়োধর তো মোটে দুটি।" জুলিও হাসে।

বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ওরা চাঁদ-পুরে পৌঁছে যায়। ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে। নদীর জলে লক্ষ তারা।

বাকিটুকু রেলপথে আবার। ট্রেনে ওঠার আগে দুজনে মিলে ভোজনাগারে নৈশ আহার সেরে নিতে যায়।

"টেলিগ্রাম ওঁরা পেয়েছেন কি না কে জানে! তোমার জন্যে তৈরি থাকতেন, হয়তো আমার জন্যে নয়। কেন ওঁদের বিব্রত করা? তার চেয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া ভালো। কী বল, সৌম্য?" জুলিই অর্ডার দেয়।

"এমনিতেই পেঁছিতে দেরি হবে। সময়ে আহার বিধেয়। কিন্তু বেশি নয়। ওঁদের ওখানে না খেলে ওঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন।" সৌম্য অনুমান করে।

ট্রেনে ওঠার সময় চেকার বলেন, "আপনার তো সেকেন্ড ক্লাস টিকিট। আপনি থার্ড ক্লাসে কেন?"

"পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। তেমনি, পড়তে যাচ্ছি গান্ধীবাদীর হাতে, থার্ড ক্লাসে যেতে হবে সাথে। তবে এতে যদি কোনো থার্ড ক্লাস যাত্রীর জায়গায় টান পড়ে তবে আমাকে স্বস্থানে যেতে হবে।" এই বলে জুলি আসন ছেড়ে দাঁড়ায়।

"না, না, আপনি বসুন। এমন অদ্ভুত কথা কখনো শুনি নি, ম্যাডাম। এ'কে তো আমরা বহুবার দেখেছি। ইনি কোথায় এতদিন ছিলেন? বেশ কয়েক বছর দেখি নি মনে হয়।" চেকার জিজ্ঞাসু হন।

"দেখবেন কী করে?" সৌম্য উত্তর দেয়। "গান্ধীজী থাকবেন জেলে আর আমরা থাকব বাইরে, এটা কি ভালো দেখায়। ইনিও জেলখানায় আটক ছিলেন।" সৌম্য জুলির দিকে তাকায়।

"আমার কী সৌভাগ্য!" চেকারের উক্তি প্রতি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়।

"অমন করলে আমি কিন্তু সেকেন্ড ক্লাসেই পালাব।" জুলি শাসায়।

"না, না, আপনারা আরাম করে বসুন। আপনারা এ'দের আরো একটুখানি জায়গা ছেড়ে দিন।" সহযাত্রী-দের বলে চেকার নেমে যান।

গল্প করতে-করতে সময় কেটে যায়। লোকের যা স্বভাব, অচেনার সঙ্গেও চিরচেনার মতো আলাপ জমায়।

স্টেশনে সৌম্য আর জুলিকে অভ্যর্থনা করতে এসে-ছিলেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন মুস্তাফী। সঙ্গে ও কে? ও যে মিলি!

"মিলি? সত্যি তুই?" জুলি ওকে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে তোলে। "কই, বেবি কই? কী যেন ওর নাম?"

"রণ। যুদ্ধের সময় জন্ম। ইংরেজদের মুখেও উচ্চারণ করা সহজ। রণকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। ঠিক সময়ে খায়, ঠিক সময়ে শোয়। আমি এসব বিষয়ে ইংরেজদের মতোই কড়া।" মিলি জুলিকে জড়িয়ে ধরে।

"তারপর, সৌম্য, কবে শুভকর্ম সম্পন্ন হবে? আর কোনখানে? আমরা সপরিবারে যোগ দেব।" মুস্তাফী বলেন।

"চাল নেই, চুলো নেই, বিয়ে! যেন ঢাল নেই, তরো-য়াল নেই, লড়াই। গান্ধীবাদীরা একটা করে, আরেকটা করে না। যতদিন না দেশ মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু জুলির মা অপেক্ষা করতে চান না। আমার বাপ্‌ও অনুমতি দিয়ে-ছেন। এখন একটা আস্তানার জন্যেই আটকাচ্ছে।" সৌম্য জানায়।

"আচ্ছা, সে ভার আমার উপর ছেড়ে দাও।" তিনি আশ্বাস দেন।

"না, সুকুমার আসে নি। পরে আসবে। আমি প্লেন ধরে পালিয়ে এসেছি।" মিলি বলে জুলির জিজ্ঞাসার উত্তরে।

পাঁচ

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তার হিসাবনিকাশ করতে বসে মানস দেখছে বাঙলাদেশ যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় নি তবু এখানে ত্রিশ লক্ষের মতো মানুষ মারা গেছে। এত মানুষ ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স বা আর্মেরিকায় মারা যায় নি। এমন কী, ভারতীয় সৈনিকদের মৃত্যুসংখ্যাও এত বেশি নয়। আর সবাই মারা গেছে যুদ্ধবিগ্রহে, বাঙালীরা মারা গেছে দুর্ভিক্ষে। ওদের তবু সান্ত্বনা আছে, ওরা ফাসিস্ট অসুরদের পরাস্ত বা নিপাত করেছে। বিশ্বকে করেছে তাদের হাত থেকে উদ্ধার। ওদের প্রাণদান সার্থক। কিন্তু এদের কী সান্ত্বনা!

এই ত্রিশ লাখ লোক তো দেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রামে নেমে প্রাণ দিতে পারত। তা হলে অন্তত একটা প্রদেশ তো স্বাধীন হতে পারত। এদের প্রাণদান সার্থক হত। এদের গৌরবগাথা গান করতেন গায়করা, গ্রথিত করতেন কবিরা। চিত্রকররা আঁকতেন এদের বীরত্বের ছবি। ভাস্কররা গড়তেন এদের বীরোচিত মূর্তি। এদের নিয়ে লেখা হত নাটক আর যাত্রা। কিন্তু এদের মৃত্যুর জন্যে কোথায় সেই গৌরববোধ? দুঃখ, শোক, করুণা, বিবেকের দংশন এবং অসহায়তার জন্যে লজ্জা, এ ছাড়া যদি আর কিছু থাকে সেটা সরকারের অব্যবস্থার উপর অভিশাপ। এ সরকার খুনী সরকার। শয়তান সরকার। স্যাটানিক গভর্নমেন্ট।

বছর দুই আগে কলকাতার রাস্তায় হামিদের সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে নিয়ে ট্রাম থেকে নামেন। বলেন, "কোথায় যাচ্ছেন? চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। অনেকদিন পরে দেখা। কিছু বলতে চাই।"

হ্যাঁ, তিন বছর বাদে দেখা। হামিদ আর তাঁর সঙ্গীর পরনে খাকসারদের মতো খাকি পোশাক। হাতে বেলচা নেই। এই যা তফাত।

"এইমাত্র ইস্তফাপত্র পেশ করে আসছি।" হামিদ মানসকে চমকে দেয়। "চীফ সেক্রেটারি নিতে চান না। আমি বলি, নিতেই হবে। এ সরকারের হুকুম আমি তামিল করতে পারি নে।"

মানস জানতে উদ্‌গ্রীব। "ব্যাপার কী, হামিদ?"

"আমার মহকুমায় কেউ না খেয়ে মারা যায় নি। আমি যেমন করে পারি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছি—রাখতুম। সরকারের এতে এক পয়সা খরচ হয় নি, হত না। কিন্তু আমার ব্যবস্থাটা ওঁদের পছন্দ নয়। যাতে ব্যাপারিদের মুনাফা, সেটাই ওঁদের পছন্দ। মানুষের প্রাণ ওঁদের কাছে তুচ্ছ। আমার উপরে রাগ—আমি ব্যাপারিদের কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছি। লোকে আমার উপর খুশি, সরকার অখুশি।" হামিদ একনিঃশ্বাসে বলে যান।

"তা আপনি ইস্তফা দিতে গেলেন কেন? ছুটি চাইতে পারতেন। কিংবা অন্য কোনো পদে বদলি।" মানস তাঁর মঙ্গলের জন্যেই বলে।

"না, জজ। তা হয় না। দুর্ভিক্ষের জন্যে সরকারি কর্মচারীমাত্রেই দায়ী। আপনিও। প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে। আপনারও উচিত ইস্তফা দেওয়া। ছুটি নিয়ে বিবেককে এড়ানো যায় না।" হামিদ চলতে-চলতে বলেন।

ট্রামে করে ওঁরা তিনজনে মিলে মানসের বন্ধু স্বপন-দার ওখানে যান। দুই থাকসার চা খেয়ে এক আনা করে চায়ের পিরিচে রেখে দেন। ওঁরা বিনামূল্যে কিছু নেন না। বন্ধুত্বের খাতিরেও না।

মানস দুঃখ করে বলে, "আমার বন্ধু ব্যথা পাবেন।" কিন্তু ওঁরা অবুঝ। ওঁদের নিয়ম ওঁদের মানতে হবে।

হামিদকে জেরা করে মানস জানতে পেরেছিল যে তাঁর বিরোধটা যাঁর সঙ্গে তিনি খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সুহ্‌রা-বর্দী। কিন্তু দোষটা পুরোপুরি মন্ত্রীরও নয়। বর্ধনের কাছে মানস শুনেছিল যে মার্চ মাসের শেষের দিকে কলকাতার বাজারে ধানচাল মজুত ছিল মাত্র দশ দিনের উপযোগী। অগত্যা নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতে হয়, যাতে মফঃ-স্বল থেকে অবাধে ধানচাল কলকাতায় আসে। মফঃ-স্বলের অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয় ধানচালের চলাচলে বাধা না দিতে। বাধা দিতে গেলে শাস্তি। মফঃস্বলে টান পড়লে সরকার থেকে ধানচাল ডাম্প করা হবে। ধানচালের বান বইয়ে দেওয়া হবে। ব্যাপারিদের ভয় দেখানো হয়, মজুত করেছ কি আঙুল পুড়িয়েছ। কে কার কথা শোনে! ওরা যে-কোনো দামে কেনে। যে-কোনো দামে বেচে। দাম আরো বাড়বে বলে ধরে রাখে, লুকিয়ে রাখে। গোপন মজুতদার কে নয়? যে নিজের বাড়ির জন্যে ছ মাসের খোরাক কিনে রাখে সেও দোষী। ওদিকে আরেকজন ছ দিনের খোরাক কিনতে পাচ্ছে না। যাদের ক্রয়শক্তি কম, যারা একসঙ্গে বেশিদিনের খাদ্য কিনতে পারে না, তাদের সংখ্যাই তো বেশি। সরকার তাদের জন্যে কোনো ব্যবস্থা করেন নি। সেটাই হল গোড়ায় গলদ।

বাঙলাদেশের অবস্থা দেখে সাবধান হন যুক্তপ্রদেশের সরকার। গভর্নর হ্যালেট তখন সর্বেসর্বা। মন্ত্রীরা জেলে। তিনি একটা ইকনমিক বোর্ড গঠন করেন। তার সেক্রেটারি করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর রুদ্রকে। রুদ্র তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে বোর্ডের কাজ নিয়েই থাকেন। আর হ্যালেট স্বয়ং বোর্ডের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বোর্ড গম-চালের গতি-বিধির খুঁটিনাটি খবর রাখে। বাছা-বাছা আই. সি. এস. অফিসারদের জেলার শাসনকার্য থেকে সরিয়ে এনে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা বুল-ডগের মতো পাহারা দেয়। ব্যাপারিরা চোরাবাজারি বা মজুত করতে গেলে ঘাঁক করে কামড়ে দেন। গম চাল সবাই সব সময় কিনতে পারে, মজুত করার দরকার হয় না। মানস যে সময় ছুটিতে ছিল সে সময় যুক্তপ্রদেশেও অন্নাভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সরকার সতর্ক থাকায় ব্যাপারিদের পৌষমাস আর সাধারণ ক্রেতা-দের সর্বনাশ হয় নি।

ছুটি থেকে ফিরে হামিদের মুখে তার অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত শুনে আর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনি-মিনি খেলা দেখে মানসও বিবেকের জ্বালায় দগ্ধ হয়। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলেই কি এর প্রতিকার হবে?

একটি মানুষও কি প্রাণে বাঁচবে? হামিদকে একথা বোঝায়, নিবৃত্ত হতে বলে। ইস্তফাপত্র ফেরত নিতে পরামর্শ দেয়। হামিদ বলেন, "না, জজ। এরা নরঘাতক, এরা মহাপাপী। আমি কেন পাপের ভাগী হব?"

উচ্চতর পদগুলিতে তখন মুসলিম অফিসারদের প্রভূত চাহিদা। দুদিন বাদে পদোন্নতি। হামিদকে ছাড়তে চায় কে? কিন্তু তিনি কেবল নিয়মনিষ্ঠ নন, নীতিনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি শয়তান সরকারের সঙ্গে আপস করেন না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান আলিগড়ে। সেখানে তালা তৈরি করেন। বেকার সমস্যার সমাধান করতে তাঁর যেটুকু সাধ্য। হিংসা অহিংসা ব্যতীত আর সব বিষয়ে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে তাঁর মিল। মানসকে তিনি একজন গান্ধীবাদী মনে করেন বলেই তার সঙ্গে এমন সাযুজ্য। কিন্তু অহিংসায় তাঁর অবিশ্বাস।

শতমারী ভবেৎ বৈদ্য, শতসহস্রমারী ভবেৎ ধন্বন্তরি। রেশন-প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার উন্নতি হয়। তার জন্যে দরকার হয় প্রোকিয়োরমেন্ট ব্যবস্থার। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও এ দুটি রহিত হয় নি, হবেও না কলকাতার ক্ষুধা আর কলকাতার লোকের ক্রয়শক্তি অব্যাহত থাকতে। মানস চিন্তা করে কলকাতার বিকেন্দ্রীকরণের। আবার যদি মন্বন্তর হয় গ্রামের লোক এসে কলকাতা লুট করবে। বিপ্লব ডেকে আনবে কলকাতার অপরিমিত ভোগ।

ত্রিশ লক্ষ মানুষের অপমৃত্যুর অভিশাপ মানসকে দু বছর কাল বিষাদগ্রস্ত করে রেখেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবে যে দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি প্রতিহত করতে হলে চাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে হাতে এসেছিল টাটা-বিড়লার পরিকল্পনা। তার কিছুদিন পরে গান্ধীজীর পরিকল্পনা। সেও তার নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে মেতে ওঠে। যেন কত বড়ো অর্থনীতিবিদ্! স্বরাজই যথেষ্ট নয়। চাই নিউ অর্ডার। নতুন শৃঙ্খলা। নতুন করে বাঁচা।

ত্রিশ লক্ষ মানুষের শোচনীয় মৃত্যু বৃথা হবে না, যদি তাদের দেশের লোক নতুন করে বাঁচতে পারে। অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে আছে, রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে নীতিধর্ম। নিছক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে মানস আরো গভীরে যায়, তার থেকে আরো গভীরে। তার প্রতীতি দৃঢ় হয় যে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের খাতে যে ব্যয়টা হবে সেটা বন্ধ না হলে বা খুব কম না হলে সাধারণ মানুষের অন্নে বস্ত্রে শিক্ষায় চিকিৎসায় বাসস্থানে টান পড়বেই। রাষ্ট্রকে বন্দুক আর মাখন—এ দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবেই। বন্দুক বেছে নিলে মাখনের অভাব হবেই। মাখন দূরের কথা, রুটিও পর্যাপ্তভাবে মিলবে না। মানুষ আধপেটা খেয়ে তিলে তিলে মরবে।

কিন্তু বন্দুক বেছে না নিলে দেশরক্ষার বেলা সৈনিকরা কি খালি হাতে লড়বে? সৈনিকরা হেরে গেলে নাগরিকরা কি অসহযোগ আর গণসত্যাগ্রহের জোরে আত্মরক্ষা করতে পারবে? স্বাধীন ভারতকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। উত্তরগুলি যদি গতানুগতিক হয় তবে দরিদ্রতম দেশবাসীর ভাগ্যে আবার ক্রয়শক্তির অভাব আর তার থেকে অন্নাভাব আছে।

মানস গান্ধীবাদীদের সঙ্গে একমত হয় যে ভারতের গ্রামগুলিকে অন্নে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করতে হবে। যাতে তাদের ওসব কিনতে না হয়। আলো হাওয়া জল তো কেউ কেনে না। তেমনি, মোটা চাল আর মোটা কাপড়ও কেউ কিনবে না। নিজেদের শ্রম দিয়ে নিজেরাই উৎপাদন করবে এবং নিজেদের প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত হলেই বিক্রি করবে। ফাঁপা টাকার লোভে বিক্রি করলে পরে পস্তাতে হবে। মন্বন্তর থেকে যদি লোকে এইটুকু শিখে না থাকে তবে লোকশিক্ষার জন্যে আবার মন্বন্তর অবতীর্ণ হবে। যুদ্ধও তো সেইরকম এক লোকশিক্ষা। গত দুই মহাযুদ্ধ থেকে দুনিয়ার লোক যদি নিরস্ত্রীকরণের আবশ্যকতা শিখে না থাকে তবে তাদের শিক্ষার জন্যে যুদ্ধও আবার অবতীর্ণ হবে। ভারতের লোক দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ দেখে নি। না দেখলে শিখবে কী করে?

তিন বছর আগেকার যুদ্ধবিরোধিতা ছিল ত্বক্-গভীর। কংগ্রেস নেতারা যদি বড়লাটের পরিষদে যেতেন আর যুদ্ধ চালাবার ভার নিতেন, যুদ্ধবিরোধিতা রূপান্তরিত হত যুদ্ধোন্মাদনায়। সেটা জাপানের বিরুদ্ধে। কিন্তু ওদিক থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন তা হলে যুদ্ধোন্মাদনার মোড় ঘুরে গিয়ে হত ব্রিটিশবিরোধী। কোথায় অহিংসা আর কোথায় তার প্রেস্টিজ? জনমানসে তার শিকড় কোথায়?

জনগণকে যদি অসামরিক প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত না রাখা হয়, যুদ্ধের দিন তাদের ক্ষুধার অন্ন আর পরিধানের বস্ত্র না জোটে তা হলে তারা কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করবে, না স্বদেশী সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্যে বিদ্রোহ বা বিপ্লব করেব? অগস্ট অভ্যুত্থান ইংরেজদের হটাতে ব্যর্থ হলেও ভবিষ্যতের জন্যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে। ইংরেজ সরকার না হয়ে কংগ্রেস সরকার যদি যুদ্ধে নামে আর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে অভুক্ত রেখে পরলোকে পাঠায় তা হলে কেরেনস্কি সরকারের মতো সে সরকারেরও পতন হবে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে যদি বোঝায় অক্ষমতারও হস্তান্তর তা হলে দেশের লোক যেমন ইংরেজকে ক্ষমা করছে না তেমনি কংগ্রেসকেও ক্ষমা করবে না।

তবে দোষটা পুরোপুরি ইংরেজদের নয়। কলকাতার নাগরিকদেরও। তাদের ক্রয়শক্তি দিয়ে তারা গ্রামবাসীদের মুখের গ্রাস কিনে নিয়েছে। বোকার মতো ওরা কাঁচের বদলে কাঞ্চন বেচে দিয়েছে। টাকা নিয়ে মানুষ করবে কী, সে টাকা দিয়ে যদি ন্যায্য দামে খাবার কিনতে না পাওয়া যায়? যদি খাবার কিনতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়? শহর-গ্রামের মধ্যে এটা স্বাভাবিক সম্পর্ক নয়, এটা শোষক-শোষিত সম্পর্ক। এর জন্যে ইংরেজকে দায়ী করা আত্মপ্রবঞ্চনা। এ সম্পর্ক যদি স্বাধীনতার পরেও শোষক-শোষিতের সম্পর্ক থাকে তা হলে শোষিতরা একদিন দলবদ্ধ হয়ে শোষকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লব বাধাবেই। সেটা অহিংসার থেকে হিংসায় মোড় নিতে পারে।

ইংরেজরা তো একদিন না একদিন যাবেই, তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কলকাতার যদি বিকেন্দ্রীকরণ না হয় তবে বিপত্তি অনিবার্য। শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রক্ত যদি মাথায় ওঠে তবে মরণ অবশ্যম্ভাবী। তেমনি, সারা বাঙলাদেশের বিভব যদি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয় তবে গ্রামগুলো মরবে, গ্রামবাসী জনগণ মরার আগে মারবে। সমস্যাটা যুদ্ধকালেই সঙ্গিন হয়, শান্তিকালে নয়। তাই শান্তিকালে সবাই নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুময়। সময়ে সাবধান হলে এই মন্বন্তর নিশ্চয় এড়ানো যেত। যে পরিকল্পনা এটা এড়াতে শেখায় সেই পরিকল্পনাই শ্রেয়।

মন্বন্তরের সময় দেশী ক্যাপিটালিস্টদের মতিগতি দেখে মানসের মোহভঙ্গ হয়েছিল। বিদেশী ক্যাপিটালিস্টদের মতোই তারা মুনাফা-উপাসক। সৎ অসৎ যে-কোনো উপায়ে তাঁরা মুনাফা লুটবেনই। অমনি করে ক্যাপিটাল বাড়াবেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা যদি কংগ্রেসের হাতে হস্তান্তরিত হয় তবে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হবে দেশীয় ধনপতিদের হাতে হস্তান্তরিত। গান্ধীজী বলছেন বটে ধনপতিদের স্বেচ্ছায় ট্রাস্টী হবার কথা, কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় না হন তবে তাঁর উপর জোর করে ট্রাস্টীশিপ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। একপ্রকার না একপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে। নইলে সোশিয়াল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে না। কংগ্রেসকে বুর্জোয়া অপবাদ বহন করতে হবে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের জায়গা নেবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। মানস এর পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। পক্ষে নয় এইজন্যেই যে এতে ধনসম্পদ বিকেন্দ্রীকৃত হবে না, গরিবের পেট ভরবে না। বিপক্ষে নয় এইজন্যেই যে সদ্য-স্বাধীন দেশের জীবনের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্র প্রবর্তন, তা না করে একলম্ফে সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হতে গেলে ডিকটেটরদের কবলে পড়তে হবে। তারা সিভিলও হতে পারে, মিলিটারিও হতে পারে।

স্বাধীনতার পর যা হবার হবে, আগে তো দেশ স্বাধীন হোক। দুই শতকের বিদেশী শাসক তো অপসৃত হোক। বিদেশী সৈনাদেরও যেতে হবে, নইলে বিদেশী শাসন প্রকারান্তরে থেকেই যায়। গান্ধীজীর প্রথম শর্তই হল বিদেশী সৈন্যদের বিদায় নিতেই হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত বিদেশীদের সৃষ্ট দেশীয় সৈন্যদলকেও ভেঙে দিতে হবে। এ কাজটা কিন্তু ক্ষমতা-হস্তান্তরের পর্যায়ে পড়ে না। যাদের হস্তান্তর করা হবে তাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এটা যেমন সিভিল সার্ভিসের বেলা তেমনি আর্মি নেভি এয়ার ফোর্সেরও বেলা। ব্রিটেন যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না করেই ভারত ত্যাগ করে তা হলে যারা সিংহাসন অধিকার করবে তারা বিদেশীদের সৃষ্ট সিভিল সার্ভিস তথা আর্মি নেভি এয়ার ফোর্স বিলোপ করতে পারে। ক্ষমতার হস্তান্তর বলতে বোঝায় এক মালিকের হাত থেকে অপর এক মালিকের হাতে তুলে দেওয়া। আর ক্ষমতার হস্তান্তর না করে রাজ্য ত্যাগ করা বলতে বোঝায় ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা নিযুক্ত সামরিক ও অসামরিক

যাবতীয় কর্মচারীর চাকরি খতম। তাদের মধ্যে যারা বিদেশী তারা বিদেশে গিয়ে ক্ষতিপূরণ আর পেনসন দাবি করবে। যারা ভারতীয় হলেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ তারাও ব্রিটেনে গিয়ে ক্ষতিপূরণ আর পেনসন দাবি করতে পারে। কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তর হলে তাঁদের চাকরি খতম হবে না। পূর্বশর্ত সংরক্ষিত হলে চাকরির জের চলবে।

কলকাতা থেকে সিভিলিয়ান বন্ধু প্রমোদকুমার পুরকায়স্থ তাঁর বিভাগীয় কাজে মানসের স্টেশনে এসে-ছিলেন। তাঁর কাছে শোনা গেল যে ইংরেজ অফিসাররা সদলবলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথাই ভাবছেন। কিন্তু তার আগে তাঁদের দিতে হবে ক্ষতিপূরণ এবং আনু-পাতিক পেনসন। পেনসনের হার গণনা করা কঠিন নয়, সেটা একটা আইনে গণনা করে রাখা হয়েছে। সেটা এত-দিন ইংরেজদের বেলাই খাটত, এবার ভারতীয়দের বেলাও খাটবে। মানস চাইলে যখন খুশি আনুপাতিক পেনসন নিয়ে সরে পড়তে পারবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার যদি ক্ষমতার হস্তান্তর না করেই ভারত ত্যাগ করে তবে মানসকেও বিলেতে গিয়ে আনুপাতিক পেনসন আদায় করতে হবে। আর যদি ক্ষমতার হস্তান্তর করে যায় তবে স্বদেশে থেকেই নতুন সরকারের কাছ থেকে আনু-পাতিক পেনসন পাবে।

মানস বলে, "থাসা খবর। কিন্তু ক্ষতিপূরণের কী হবে?"

পুরকায়স্থ বলেন, "প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ অফিসাররা যখন ইজিপ্ট থেকে বিদায় হন তখন যে হারে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন সেই হারে ক্ষতিপূরণ চাইবেন কিনা কলকাতার ইংরেজরা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছেন। ইনফ্লেশনের দরুন বর্ধিত হারে চাইতে পারেন। কিন্তু লাগে টাকা দেবে কোন্ সেন? ব্রিটিশ সরকার না ভারত সরকার? চক্তি অনু-সারে দিতে বাধ্য ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সেই বাধ্যতা-টাকেও ব্রিটিশ সরকার হস্তান্তরিত করতে পারেন, যদি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ হস্তান্তরের প্রত্যাশায় ইংরেজরা এখন কংগ্রেসের সঙ্গে আর ঝগড়াঝাঁটি করতে চান না। তাড়াতাড়ি ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে আজকাল নতুন চাকরি পাওয়া যায়। যুদ্ধের পর অনেক পদ খালি আছে। দেরি করলে সেসব পদ ভর্তি হয়ে যাবে। তাড়াটা ইংরেজ অফিসারদেরই। ওঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে ভারতে ওঁদের রাজত্ব গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ভেদনীতির সাহায্যও না। মুসলমানরাও অধীর। হিন্দুদের তো কথাই নেই।"

পুরকায়স্থ এর পরে যা বলেন তা শুনে মানস তো হাঁ। বাঙলাদেশ নাকি দুভাগ হবে। কলকাতা, চব্বিশ পরগনা আর বর্ধমান বিভাগ মিশে যাবে বিহারের সঙ্গে। বাদবাকি শামিল হবে পাকিস্তানের।

"দূর! বাজে কথা! এটাও কি ইংরেজদের মুখে শোনা?" মানস সুধায়।

"না, এটা ওদের মুখে নয়। একজন কংগ্রেস নেতার মুখে। তিনি মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে একটা আপসের সূত্র খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছেন। ইংরেজ কখনো কংগ্রেসের হাতে সারা ভারত সমর্পণ করবে না। মুসলিম লীগকেও তো কিছু দেবে। কিন্তু সারা বাঙলা সারা পাঞ্জাব, সারা আসাম দিলে কংগ্রেস বাকিটা নেবে না। আবার গণ-আন্দোলন করবে। আবার জেলে যাবে। ইংরেজ অফিসারদের ভারতে আটকে রাখবে। ইংরেজরা যদি থাকতে না চান তো আপস করবেন। এক হাতে কংগ্রেসের সঙ্গে, আরেক হাতে লীগের সঙ্গে। তার মানেই হল পার্টিশন। সব দিক রক্ষা করতে গেলে বাঙলাদেশের পার্টিশন চাই। যেমন হয়েছিল আমাদের ছেলেবেলায়। চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই বিন্দুতে এসেছে। যাকে বলে পূর্ণবৃত্ত। তবে সেবার পূর্ববঙ্গ ভারতেই ছিল। এবার যাবে পাকিস্তানে। ফলে বাকি দেশটার নাম হবে হিন্দুস্তান।" পুরকায়স্থ যতদূর জানেন।

"না, না, তা কিছুতেই হতে পারে না।" মানস চেঁচিয়ে ওঠে। তা শুনে যূথিকা ছুটে আসে। তার চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

মানসের উত্তর শুনে সে হেসে কুটিকুটি। "কাল-নেমির লঙ্কাভাগ। কারা এঁরা? কে এঁদের পোছে? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! বাঙলাদেশ কখনো ভাগ হতে পারে? অসম্ভব! অবাস্তব! গাঁজা!"

মানস উত্তেজিত হয়ে বলে, "শুধু তাই নয়, বিহারের সঙ্গে মার্জার!"

পুরকায়স্থ ওদের ঠাণ্ডা করে বলেন, "বিহারে যত-রকম খনিজ আছে তার কোথাও তত নেই। সেসব খুঁড়ে বার করলে আরো চার-পাঁচটা জামশেদপুর গড়ে উঠবে। মার্জার হলে বাঙালিরই লাভ। পূর্ববঙ্গে আছে কী? চা, পাট, মাছ। ওর থেকে আর কতটুকু লাভ হবে?"

মানস মেনে নিতে পারে না। "পূর্ববঙ্গে আছে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, তিস্তা, মহানন্দা, গোরাই, মধু-মতী, ইছামতী। পূর্ববঙ্গে আছে বাঙলাদেশের প্রাণ। বাঙলাদেশের হার্টল্যান্ড। 'কলকাতা, 'কলকাতা' করে তোমরা পাগল। কলকাতার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে তোমরা পূর্ববঙ্গ বিকিয়ে দেবে। কলকাতায় আছে কী? আফিস, আদালত, সওদাগরি কোম্পানির হাউস। সবই তো ইংরেজের কীর্তি। তোমাদের গর্ব করবার মতো কী আছে? ওটা একটা ব্যাড বার্গেন। ওতে রাজি হওয়া মানে মুসলিম লীগের কাছে যুদ্ধে হার মানা। ওরা যেন যুদ্ধে জিতে কংগ্রেসওয়ালাদের উপর পার্টিশন চাপিয়ে দিচ্ছে। কংগ্রেস কি হেরে গেছে? লীগ কি জিতে গেছে? হোক না গৃহযুদ্ধ। দেখা যাক না কে হারে কে জেতে। জিতলে সমস্তটাই কংগ্রেস পাবে। সমস্ত ভারত, সমস্ত বঙ্গ। হারলে সমস্তটাই হারাবে, সমস্ত ভারত, সমস্ত বঙ্গ। আর নয়তো দেশ আর প্রদেশ ভাগ হয়ে যাবে তলোয়ারের ধারে।"

যূথিকা উৎসাহ দিয়ে বলে, "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। এটা কিন্তু কৌরবপক্ষের কথা নয়, পাণ্ডবপক্ষের কথা। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়ল না তারা কোন্ সুবাদে দেশের একভাগ চায়?"

পুরকায়স্থ হাসেন। "শুনেছিলুম আপনারা দু-জনে অহিংসাবাদী, গান্ধীশিষ্য। কিন্তু আপনাদের জঙ্গি চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ঢাল তরোয়াল পেলে আপনারাও লড়াইয়ে নেমে পড়বেন, ইংরেজকে তাড়াতে নয়, মুসলমানকে হারাতে।"

"ওমা, মুসলমানকে হারাতে কে বলেছে?" যূথিকা অনুরোধ করে। "আমরা মুসলমানদের পর ভাবি নে, ওরাও আমাদের আপন। কথা হচ্ছিল পাকিস্তানপন্থী-দের নিয়ে। যারা পাকিস্তানপন্থী নয় তাদের নিয়ে নয়।"

"আজকের পরিস্থিতিতে দুই অভিন্ন হয়ে উঠছে, মিসেস মল্লিক। অশিক্ষিতদের কথা বলতে পারব না, কিন্তু শিক্ষিতরা প্রায় সকলেই পাকিস্তানপন্থী। যাঁরা নন তাঁরা ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি অফিসেই এক-একটি পাকিস্তান রুক। এ এক অদ্ভুত মেনটালিটি। এঁদের সঙ্গে যুক্তি বৃথা, তর্ক বৃথা। এঁদের ইনসটিংট এঁদের বলছে যে ইংরেজ আর বেশি দিন থাকবে না, তখন কংগ্রেসই রাজা হবে। দিল্লীতে কংগ্রেস রাজা হলে বাঙলার গভর্নরও হবেন কংগ্রেসের আজ্ঞাবহ। মুসলিম লীগ মন্ত্রীরাও তাঁর বশংবদ হবেন। সুযোগ-সুবিধা হিন্দুরাই বেশি পাবে। কারণ কংগ্রেস কার্যত হিন্দু-দেরই প্রতিষ্ঠান। দু-চারজন মুসলমান আছেন বলে কি কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান? তার কাছে অপক্ষ-পাত প্রত্যাশা করা যায় না। তা ছাড়া, মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতই যে দরকার। ওরা বহুকাল থেকে পশ্চাৎপদ। কী করে এগোবে যদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুদের পেছনেই থাকে? চাকরির প্রতিযোগিতায় হিন্দুরাই জিতবে। প্রমোশন হিন্দুরাই পাবে। যে প্রদেশে মুসলমানরাই সংখ্যাগুরু সে প্রদেশেও চাকরি-বাকরিতে তারা হবে সংখ্যালঘু। ইংরেজ চলে গিয়ে হিন্দুর পদোন্নতি হবে, মুসলমানের তাতে কী? পাকি-স্তান বানিয়ে দাও, দেখবে মুসলমানেরও পদোন্নতি হবে। এই যাদের মেনটালিটি তাদের সঙ্গে মারামারি করে কী হবে? ভাগাভাগি করাই শ্রেয়। একভাবে না একভাবে করতেই হবে ভাগাভাগি। দেশ ভাগ না করলে ক্ষমতা ভাগ। ক্ষমতা ভাগ না করলে দেশ ভাগ। দেশ ভাগ করলে প্রদেশ ভাগ। আমি তো রাজি হব না পাকিস্তানে চাকরি করতে। মল্লিকের কথা আলাদা। উনি তো চাকরিই করবেন না।"

"না, আমি চাকরিই করব না। আমার জীবনে অন্য কাজ আছে। কিন্তু আমাকে অবাক করছে এই ভাগাভাগির জল্পনা-কল্পনা। কেন—মিলেমিশে কাজ করতে পারা যাবে না কেন? কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল কেন সম্ভব হবে না? দিল্লীতে সম্ভব হলে কলকাতায়ও হবে। কলকাতায় হলে দিল্লীতেও হবে। গভর্নর হবেন নিরপেক্ষ সুযোগ্য ব্যক্তি। কোনো একটি দলের আজ্ঞাবহ নন। তিনি একজন পার্শী বা খ্রীষ্টানও হতে পারেন। আমাদের আদর্শ হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান পার্শীর সমন্বয়। মহামানবের সাগরতীর। ভারত মহাসাগরকে যেমন ভাগ করা যায় না, ভারতবর্ষকেও তেমনি ভাগ করা যায় না। বঙ্গোপসাগরকে যেমন ভাগ করা যায় না, বাঙলাদেশকেও তেমনি ভাগ করা যায় না। মুসলিম

লীগের পার্টিশন প্রস্তাব আমি মেনে নিতে পারি নে। কিন্তু মুসলিম অফিসার ক্লাস যদি একবাক্যে পাকিস্তান দাবি করেন তা হলে তো আমি বন্দুক নিয়ে তাঁদের সঙ্গে লড়তে পারব না। হিন্দু অফিসার ক্লাস যদি বর্ণবিমুখ হন তা হলে তো আফিসে আফিসে গৃহ-যুদ্ধের কথাই ওঠে না। তার আগে আমি চাকরিই ছাড়ব।" এই বলে মানস দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

যূথিকা রাগ করে বলে, "তুমি ডিফিটিস্ট। মুসলিম অফিসার ক্লাস সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় নয়। দেশভাগ চাকুরেদের স্বার্থ হতে পারে, চাষিদের স্বার্থ নয়, মজুর-দের স্বার্থ নয়। সকলের বৃহত্তর স্বার্থেই দেশের ঐক্য রক্ষা করতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে।"

"দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের ঐক্য রক্ষা করতে হবে, এই, পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমি একমত, দিদি। কিন্তু তার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে, এতদূর যেতে আমি নারাজ। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখুন যুদ্ধের কী পরিণাম। কোথায় জার্মানির ঐক্য! প্রোলিটারিয়ানরা গ্রাস করেছে আধখানা জার্মানি। ওদের হাত থেকে কেড়ে নিতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তবে হয়তো ওরাই কেড়ে নেবে বাকি আধখানা। মুসলমানদের অধিকাংশই প্রোলি-টারিয়ান। ওরা যদি একধার থেকে কমিউনিস্ট বনে যায় ভারতের একভাগ তো জয় করে নেবেই, বাঙলাদেশের বেশির ভাগও ওদের দখলে যাবে। যুদ্ধ না করে সন্ধি করে মুসলিম লীগকে দিলে ক্ষতি কী? আমি তো মনে করি মুসলিম লীগই লেসার ইভিল।" পুরকায়স্থ বলেন।

"একমত হতে পারছি নে।" মানস কণ্ঠক্ষেপ করে। "মুসলিম লীগ হচ্ছে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল। আর কমিউনিস্ট পার্টি গণতন্ত্র না মানলেও সামাজিক ন্যায় মানে, সুতরাং একদিক থেকে প্রগতিশীল। সুতরাং লেসার ইভিল।"

"আপনি কি জানেন যে মুসলিম লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে? কমিউনিস্টরা পাকিস্তানের পক্ষে। ওদের লক্ষ্য জমি-দারি উচ্ছেদ, ফসলের তেভাগা ইত্যাদি। পাকিস্তানে সেসব সুগম হবে।" পুরকায়স্থ শুনেছেন।

"মুসলিম লীগ কারো বন্ধু নয়। কমিউনিস্টদেরও একদিন শায়েস্তা করবে। একবার ইসলাম বিপন্ন বলে শোর তুললেই মুসলিম চাষিরাই হিন্দু কমিউনিস্টদের কাস্তে নিয়ে কোপাবে আর মুসলিম মজুররাই হাতুড়ি দিয়ে পেটাবে। মুসলিম কমিউনিস্টরাও পার পাবে না, নাস্তিক বলে ফাঁসিকাঠে ঝুলবে। মুসলিম শাসনে নাস্তিকের ক্ষমা নেই। পৌত্তলিকেরা থাকলেও থাকতে পারে।" মানস বলে।

যূথিকা রাগ করে, "ইভিল তো ইভিল, তার আবার লেসার কী? গ্রেটার কী? তার সঙ্গে সন্ধি কিসের? মানুষ তোমরা নও তো, মেষ! তোমাদের কেউ সম্মান করবে না।"

এই বলে রান্নাঘরে যায়। অতিথির জন্যে রাঁধতে। দুই বন্ধুতে অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলে। সরকারি বদলি আর প্রমোশন।

"ইংরেজরা কেউ যুদ্ধের সময় হোমে যায় নি। অনেকেই সাত-আট বছর হল হোম থেকে নির্বাসিত। জানেন তো ওরা হোম বলতে অজ্ঞান। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হোম আমার কেমন লাগল। হা হা! ইংল্যান্ড কি আমার হোম? এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ওরা সবাই এখন ঘরমুখো। কিন্তু ছুটি দিচ্ছে কে? একসঙ্গে পাঁচশো কি ছশো অফিসারকে ছুটি দিলে শাসন চলবে ঠিকই, কিন্তু সেটা ব্রিটিশ শাসন হবে না। তা বলে সবাইকে জোর করে আটকে রাখাও যায় না। ছুটি নিয়ে বহু ইংরেজ যাচ্ছে। তাদের জায়গায় বহু পদ খালি হচ্ছে। এই তো বর্ধন প্রমোশন পেয়ে দিল্লী চলল। 'দিল্লী চলো' স্লোগানটা এখন আমাদের মুখে মুখে। আমি ভাবছি দিল্লীকা লাড্ডু পাইলেই খাইব। আপনি?" পুরকায়স্থ সুধান।

"না, ভাই। আমার দাঁত ভেঙে যাবে। পেটে সইবে না। আমি বাঙলায় লিখি। যেখানে লেখক, পাঠক ও প্রকাশক সেখানেই আমার স্থান। যেখানে বাঙলাদেশের মাটি, জল, মানুষ সেখানেই আমার স্মৃতি। 'দিল্লী চলো' নয়, 'পল্লী চলো' এই আমার স্লোগান। যাক, বর্ধনের জন্যে আমি আনন্দিত।" মানস যূথিকাকে খবরটা দেয়।

[ক্রমশ

রবীন্দ্রনাট্য : গান দিয়ে দ্বার খোলানো

সন্তোষকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান—তার প্রয়োগের যাথাযথ্য নিয়ে কিছু বলতে হলে আগেই আলাদা করে ওই গানের আলাদা চরিত্র নিয়েও দু-চার কথা বলে নেওয়া ভালো। তাঁর নিজেকে বিকাশ করার মুখ্য মাধ্যম তো বটেই ; উপমান্তরে এই দিক অলৌকিক কোনো পদ্মের পাপড়ির মতো। যার এক পিঠ কাব্য, হাওয়ার একটু দোলা লাগলেই চোখে পড়ে, অন্য পিঠে সুর। চোখে যেভাবে ঘুম, ফুলে সেভাবে রঙ লাগে। স্বপ্নে কে যেন দ্বারে ঘা দেয়, টের পাই না, কিন্তু সেই অবচেতনায় একটি হঠাৎ-নদীর প্রবাহে বাধা হয় না।

তোমার চোখে করুণা দেখেছিলাম, সোজাসুজি লিখলেই হত, এই দ্রুত যুগে স্বাভাবিক ছিল সেইটাই, অথচ কবি বলেন দেখেছিনু করুণা তব। মানে, থাক বা না থাক, তিনি দেখেছিলেন। তাতেও তৃপ্তি নেই, যেন যথেষ্ট লাজুক হল না—শুরুতেই জুড়ে দিলেন, মনে হয়েছিল। একটা 'যেন'-র কাঁপা-কাঁপা আভাস। একটু অনিশ্চয়তা, যার সঙ্গে বিনয়ও মিশে আছে একটু। আমাদের গীতিসাহিত্যের বাণীতে বিরল একটি নুয়ান্স।

যদি জল আসে আঁখিপাতে লিখেই পরক্ষণে অকস্মাৎ 'ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে'। অভিযোগ নেই, অভিমানও না, খালি একটি অনুরোধ : তবু মনে রেখো।

যদি তাঁর স্বভাবের পক্ষে বিস্ময়কর একটু জোরের সঙ্গে বলেন, 'দ্বার ভেঙে তুমি এসো', পরমুহূর্তেই বুঝি অনুভব করেন আবদারটার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, তখন, তৎক্ষণাৎ সকাতরে খালি বলা, দুয়ার-টুয়ার ভাঙতে হবে না, তুমি ফিরে যেও না 'দয়া করে তবু রহিও দাঁড়ায়ে'—ব্যস, আর কিছু চাই না।

যেখানে তাঁর প্রতিটি গানেই এমনই নিহিত নাটক, সেখানে, সেই গানকেই তিনি আবার সেই নাটকে অকৃপণ প্রয়োগ করেন, যা প্রকরণ হিসেবেও দৃশ্যকাব্য গোত্রের। অর্থাৎ মানসিক্‌-বয়ঃপ্রাপ্ত রুচিসম্পন্ন বাঙালির পক্ষে শ্রাব্য একমাত্র গীতি-উপহার যেমন তাঁর, এই ভাষায়, প্রায় একমাত্র পাঠ্য নাটকেরও স্রষ্টা তিনি। তাঁর নাটক একই সঙ্গে দৃশ্যকাব্য আর শ্রাব্যকাব্য। এক অঙ্গে দুই।

এই নাটকে গানের প্রয়োগকে অনেকে অতিরেক মনে করেন। করতে পারেনও—দর্শকেরা ততটা নন, পাঠকেরা যতটা। রবীন্দ্রনাথের নাটক পাঠ্যও, একথা তো মুখবন্ধেই

বললাম। কেননা পাঠযোগ্যতা তথা সাহিত্যমূল্য আমাদের অন্যথা-সমৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যে অদ্যাপি বিরল। কী পেশাদারি, কী গ্রুপথিয়েটারের বৃহদংশ, সস্তায় কিস্তি মাত করতে চায়, প্রথমটা ষড়রিপুর কয়েকটিকে সাপের মতো খেলিয়ে, আর দ্বিতীয়টা রাজনীতির ফাঁপা ফানুস উড়িয়ে। তবু তেমন বরফের মতো জমাট বাঁধছে কই। যে জল সে জল।

যাক, এই প্রসঙ্গে ওসব কথা অবান্তর। রক্ত, এত রক্ত কেন? যেন এই জিজ্ঞাসার মতোই এত গান, এত গান কেন? এই গান কি শুধুই অলংকার? আমার উত্তর হ্যাঁ। অলংকার মানে আমরা বুঝি শুধুই সৌন্দর্য। কিন্তু কেন? অলংকারের একটা ধাতব শক্তিও আছে। এই ধাতু রবীন্দ্র-নাটককে সেই শক্তি দিয়েছে।

প্রকরণ হিসেবে নাটকের স্বকীয় লক্ষণ সম্পর্কে দু-চার কথা না বললে প্রস্তাবিত আলোচনাটা স্পষ্ট হবে না। নাটক হল সাহিত্যের সেই প্রকরণ যেখানে স্রষ্টা অদৃশ্য, অ-দৃষ্ট। প্রায় বিশ্ব-চরাচর থেকে বিধাতার মতো। বিধাতার নিবাস নাকি অন্তরীক্ষে, নাটকে নাটকারের স্থান প্রকৃতপক্ষেই নেপথ্যে। ওই নেপথ্য শব্দটি একদিন রচয়িতার নিজের গরজে তৈরি হয়েছিল কিনা কে জানে! তবে এটা ঠিক, ওই নেপথ্যে যে বা যাঁরাই থাকুন প্রধান কণ্ঠস্বরটি কিন্তু নাট্যকারেরই।

লিখতে-লিখতে একটু জটিল হয়ে গেল। খুলে বলি। কবিতায়, গানে, দিনপঞ্জীতে, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে, গল্পে বা উপন্যাসে লেখকের নিজের অংশে (অথারস পোরশান) যেসব কথা পাই তা সরাসরি লেখকেরই জবানি। নাটকের সংলাপে কোন্‌টা যে লেখকের আর কোন্‌টা চরিত্রের, সেই চাল থেকে কাঁকর বা চিনি থেকে কাঁচের গুঁড়ো আলাদা করা মুশকিল।

'কোরাইওলেনাস' নাটকের শুরুতেই যখন বিদ্রোহী নাগরিকদের মুখে শুনি—

> "Before we proceed any further,
> here we speak."
> "Speak, speak."
> "You are all resolv'd rather to die
> than to famish?"
> "Resolv'd, resolv'd."

ঠিক ঠাওর হয় না কথাগুলো কি শেকসপিয়ারের নিজের? অথবা যুথগত মুড়তাকে উপহাস? কিংবা চিরন্তন সত্যের উচ্চারণ নয়তো?

একই ধন্দ ঘটে ভেনিসের সওদাগর নাটকে পোরশিয়ার সংলাপে। "দ্য কোয়ালিটি অব মারসি ইজ নট স্ট্রেন্ড" ইত্যাদি বাক্যপরম্পরা যখন পড়ি তখন যদিচ টনটনে জ্ঞানি সবটাই ওই চতুরা রমণীর বাকচাতুরি, তবু সে যে যুক্তিচ্ছলে কিছু মানবিক সত্যকেও ভাষা দেয় সেটা অস্বীকার করার উপায় কই? এই নাটকেই ইহুদীদের পক্ষে আর বিপক্ষে যে আদ্যশ্রাদ্ধের মন্তর আওড়ানো হয়েছে, তার কোন্‌টা নাট্যকারের নিজের, অথবা তিনি দুটো থেকেই কি সমান দূরবর্তী? জুলিয়াস সিজার-এও একই অনিশ্চয়তা। ব্রুটাস বলেন, 'রোমানস, কানট্রিমেন, অ্যান্ড লাভারস! হীয়ার মী ফর মাই কজ'। আবার মার্ক অ্যানটনিও কিছু পরে চাপানের উত্তর দেন প্রায় একই ভাষায় : "ফ্রেন্ডস, রোমানস, কানট্রিমেন, লেন্ড কী ইয়োর ঈয়ারস।" দুজনের মধ্যে কার কথা শেক্‌স্‌পিয়ারের? হতে পারে দুজনেরই, হতে পারে কারুরই না। শুধুমাত্র জনমতকে কত সহজে বশ্য করা যায় তিনি কথাচ্ছলে তাই দেখিয়ে দিলেন।

নাট্যকারের এই এক সুযোগ—স্বকৃত কিংবা প্রকরণগত নিরপেক্ষতার। এর সুযোগ রবীন্দ্রনাথ যে একটু-আধটু গ্রহণ করেন না এমন নয়। স্মরণ করা যাক রঘুপতির সেই রোমাঞ্চক সংলাপ—"এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষ-কোটি প্রাণী চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা? হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি...হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে, হত্যা বিহগের নীড়ে, কীটের গহ্বরে, অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে, হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘের আক্রমে মৃগসম।"

বলা বাহুল্য, এই অভিমত রবীন্দ্রনাথের নয়, হতে পারে না। উক্তিপরম্পরা রঘুপতির মুখে জোগানো জুতসই কুযুক্তি মাত্র, অচিরে জয়সিংহের মুখে যা শোনা যাবে তা হয়তো কবির নিজেরই অন্তরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। অনাদি অনন্ত হিংসাই যদি সত্য হবে, "তবে কেন মেঘ হতে ঝরে আশীর্বাদসম বৃষ্টিধারা—

দগ্ধ ধরণীর বক্ষ-পরে—গলে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী স্রোতস্বিনী মরুমাঝে—কোটি কণ্টকের শিরোভাগে, কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া?"

এই তো রবীন্দ্রনাথ, তাঁর নিজস্ব নির্ভুল কণ্ঠস্বর।

সোজা কথায়, সর্বত্র প্রথাগত (তথাকথিতও বটে) নিরপেক্ষতা বা অলক্ষ্য সমদূরবর্তিতায় অটল থাকতে পারেন নি তিনি কিংবা চান না।

সেইহেতুই সংলাপের সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে আনেন গান। নাট্যবস্তু তাঁর প্রায় সব গানেই আছে। নাটকে যেগুলো ব্যবহৃত তাতে বক্তব্যের মর্মবস্তু যেন আরও ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কথাগুলো যদি পাতা, সুরে-গাঁথা গান তবে ফুলের বর্ণময় বাঙ্ময়তা।

অন্তত রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল তাই।

সব দেশেই নাটক সাহিত্যের সঙ্গে অল্পাঙ্গী সম্বন্ধে বদ্ধ। বাঙলাতেও ছিল। মাইকেল-দীনবন্ধুদের কালে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র—সকলের রচনাতেই সাহিত্যগুণ ওত-প্রোত। এই ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত করে অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রোত্তর কালে কোনো সামাজিক, ব্যবসায়িক অথবা কোনো-না-কোনো রহস্যময় কারণে নাটক যেন সাহিত্যের মূল ধারাটি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসে। ঘটনার চমক, দৃশ্যের ঝলক সবই আছে, সবই ছিল—তবু সব থেকেও কিসের যেন ঘাটতি থেকে যেত। অথচ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অথবা মন্মথ রায়—এঁরাও কিন্তু জাত-সাহিত্যিক। কিন্তু শিল্পজগতের এমনই নিষ্ঠুর নিয়তি, উপভোগ্য হলেই সময়ের হাতে ছাড়পত্র মেলে না। আবার পাঠযোগ্য হলেই নাটক মঞ্চসফল হয় না। যে নাটক মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে দেখা না দিল, সে নাটক ছাপার মতো উৎসাহী প্রকাশক পাওয়াও শক্ত। হয়তো সেইহেতু সাহিত্যিক মহলে নাটক লেখার গরজ ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যেতে থাকল। এই গ্রহণ লাগার আরও একটা হেতু থাকা সম্ভব। যে-চোখ দিয়ে জীবনের বাস্তব রিক্ষ দশার বর্ণনা পড়া সম্ভব, সেই চোখ দিয়ে সদলবলে সেই বাস্তবেরই উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করতে বোধহয় দর্শকমনে কোনও প্রতিরোধী রুচির শুচিবাই দেওয়ালের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়। তবু ক্ষীণ ধারাটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলা যায় না। তারাশঙ্কর, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার—পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটক লিখেছেন অনেকেই। বুদ্ধদেব বসু তো তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসরের উল্লেখযোগ্য ভাগ নাটকের পর নাটক লেখায় নিয়োগ করে গেছেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের সমান্তর, কখনও অন্যতর ব্যাখ্যা তথা উন্মীলন হিসেবে তাঁর নাটকগুলিরও বেশ কয়েকটি ধ্রুপদী।

নাটক শরৎচন্দ্রেরও আছে, তবে মৌলিক নয়—উপন্যাসের নাট্যরূপ। তা ছাড়া, কোন্‌টির রূপান্তরের কারিগর যে তিনি স্বয়ং, তা নিয়েও অল্পবিস্তর বিতর্ক।

সব ছাপিয়ে মূল কথাটা এই যে মঞ্চের সঙ্গে লেখার মেলবন্ধন আর তেমন অটুট রইল না। একটি সমৃদ্ধ ভাষার পক্ষে দশাটা অস্বাভাবিক।

সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রধান লেখকেরা লিখুন চাই না লিখুন, নাটক আজ বাঙলার প্রধান কোনো লেখকেরই আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম নয়।

ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রথমত ব্যবসায়িক চাহিদা ছিল সামান্যই। ছিলই না সম্ভবত, যত দূর সমীচীন অনুমান হয়। সেই দিক থেকে তাঁর কবিসত্তা যতটা, নাট্যকারসত্তাও ততটা নিরঙ্কুশ। ছাত্রছাত্রীদের, তৎকালীন আশ্রমিক আবাসিকদের আনন্দ দানের জন্যে লিখছেন, আবার ইচ্ছে গেল তো দুরূহতম পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন।

ফলে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির গুরুত্ব যত, নাটকেরও প্রায় ততটাই। 'রক্তকরবী' কি 'রাজা', 'বাঁশরী' কি 'রথের রশি'তে গোটা স্রষ্টাকেই পাই। পাই 'ডাকঘর'-এ কিংবা 'অচলায়তন'-এও। যেমন 'রাজা ও রানী'-তে, তেমনই 'বিসর্জন'-এ, 'মালিনী'-তে।

কোনো-কোনোটিতে তিনি বিদেশী ধারার অনুসারী। যেমন ধরা যাক মেয়েদের ছেলে সাজানো। এই কায়দাটা তিনি শেকসপিয়রের কাছ থেকে ধার করে থাকবেন। জনতার দৃশ্যেও কোনো কোনো নাটকে তিনি ওই একই পূর্বসূরীর অনুগামী। যদিও এই লেখকের মতে এলিজাবেথীয় নাট্যকারের জনগণ আর-একটু বেশি রঙ্গমাংসের, আর-একটু প্রত্যক্ষ, বাস্তব।

তাঁর অপরিণত বয়সের নাটকগুলিকে এই আলোচনার আওতায় আনছি না। যেখানে তিনি প্রতীকধর্মী সেখানে কেউ কেউ মেটারলিঙ্কের ছায়াপাত লক্ষ করেন। ইবসেনের অশরীরী অস্তিত্বও অনুভব করেন অনেকেই।

আখ্যানকাব্য আর নাট্যকাব্যকেও এই আলোচনার গণ্ডির বাইরে রাখতে চাই। কাব্যনাট্য আর নাট্যকাব্য—ভার্স ড্রামা আর ড্রামাটিক ভার্স আসলে দু জাতের ফুল। প্রথমটিতে নাট্যরসই প্রধান, খালি শরীরটার আকার কতকটা কবিতার। কাব্যমুখ্য শ্রেণীতে পড়ে 'কর্ণ-কুন্তীসংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', 'সতী', 'নরকবাস' ইত্যাদি। আর কাব্যনাট্য বলতে বোঝায় 'বিসর্জন', 'মালিনী' এবং 'রাজা ও রানী'র অনেকখানিকে। যেগুলি একেবারে বাদ দিতে চাই সেগুলি হল 'ভগ্নহৃদয়' (গীতিকাব্য), 'রুদ্রচণ্ড (বিনষ্ট, পৃথ্বীরাজ পরাজয়ের নতুন রূপ), 'প্রকৃতির পরিশোধ' আর 'বসন্ত নটরাজ', 'শেষ বর্ষণ' ইত্যাদি। এগুলো নাট্যপদবাচ্য আদৌ নয়, শুধুই গীতি। সংলাপ অংশ ভণিতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা পালন করে কিনা সন্দেহ। এই সংজ্ঞিগুলি সেকালের আশ্রমের উৎসবের অঙ্গ।

'শাপমোচন'-কেও এই খারিজের দলে ফেলা যেত, যদি না ভবিষ্যতে যেসব নতুনাটা তিনি লিখবেন তার বীজ এই রচনাটিতেই অঙ্কুরিত হত। নতুবা এর কথাবস্তুর সঙ্গে 'রাজা' আর 'অরূপরতন'-এর প্রভেদ সামান্যই। শুধু 'রাজা' যেখানে চরিত্র হিসাবে দুজ্ঞেয়, 'শাপমোচন'-এর অরুণেশ্বর সেখানে শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব। গন্ধর্ব কিন্তু মর্ত্যলোকবাসী, যেখানে মানুষ দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়—এই দুটি মাত্র বাক্যে রবীন্দ্রনাথ গোটা জীবনকে যেন তুলির একটানে আদ্যোপান্ত এঁকে ফেলেন। দুঃখ পাওয়া আর দুঃখ দেওয়া—মানবজীবন এই, শুধু এই? তুলনায় 'রাজা' বা 'অরূপরতন' অনেক বেশি অশ্রুপাত, বিমূর্ত। অরুণেশ্বর আর কমলিকাকে আমাদের বোধের বেড় দিয়ে ধরে ফেলতে পারি। রাজা, সুদর্শনা, সুরঙ্গমা যেন তেমন স্পর্শের অধিগত হয় না। তারা অন্যতর লোকের অধিবাসী।

প্রসঙ্গত, 'শাপমোচন'-এ গানগুলি কিন্তু পূর্ব-লিখিত, পরে এই নাট্যে সংযোজিত।

গানের কথা যখন অনিবার্যভাবে উঠলই তখন আসল কথাটা বলা যাক না। তাঁর নাটকে সুরের শোভাযাত্রা। এ ব্যাপারে বিদেশী নজির খুব বেশি প্রেরণা জুগিয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ শেকসপিয়ারে গানের ব্যবহার খুবই পরিমিত। যদিও ওফেলিয়ার মুখে

'He is dead and gone, lady,
He is dead and gone ;
At his head a grass-green turf.
At his heels a stone,'—

—এই সুরসংবলিত বিধুর বিলাপে প্রায় উইঁপং উইলো-র নম্র ছবিটি দেখা যায়। মলিয়ের-এ গান আছে বলে মনে পড়ে না তবে গ্যয়েট-এ সংগীতের কিছু প্রয়োগ করেছেন বলে স্মরণ হয়। ইয়েটস-ও সংগীত রচনা করেন নি এমন নয়, কিন্তু সুরকার তিনি নন। সেই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অনন্য।

ব্যাক রইল সেই আদি গ্রীক নাটক। সেখানেই কোরাস-এ সম্ভবত সম্মেলক সংগীতের প্রথম ইশারা। সংলাপে সুরসংযোগ প্রথম করেন কে? থেস্পিস? প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার 'ইসকাইলাস'-এ যা পাই তাকে পুরোপুরি গীত বললে বিশেষ ভুল হয় না। গিলবার্ট মারে তো এই নাটককে প্রায় অপেরার শ্বভাতি বলে জ্ঞান করতে চান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গিলবার্ট মারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় একসময় ঘনিষ্ঠ ছিল। পরবর্তী কালে গ্রীক নাটকে অবশ্য সুরেলা কোরাসের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসে, বিশেষ করে সফোক্লিসে। তবু কোরাস-কণ্ঠে সদাসংঘটন নিয়ে সম্মিলিত বিষাদ অথবা প্রত্যাসন্নের আভাস অমোঘ রাজবদ্মত ধ্বনিময়তা অব্যাহত।

নাটকে গান। কেন, তার উত্তরের সন্ধানে স্বদেশের দিকেই মুখ ফেরানো যাক না। প্রথম যুগের পরিস্ফুটে যা কিছু সাহিত্যসৃষ্টি তা তো সুরেই গীত হত। বৈদিক সামগান থেকে রামায়ণ, মহাভারত, তুলসীদাসের রামচরিতমানস—সমস্ত। সংস্কৃত নাটকেও গানের অকুণ্ঠ ব্যবহার। 'শকুন্তলা'-য় হংসপদিকার সংগীত স্মর্তব্য। যাত্রাকে বলা হত পালাগান, এখনও হয়। সম্ভবত—সম্ভবত কেন অবশ্যই—রবীন্দ্রনাথ বরং দেশীয় ঐতিহ্যেরই অনুসারী। সাহিত্যই গান, গানই সাহিত্য। সংস্কৃতে নাট্যসংগীতকে বলা হত ধ্রুবাগান।

বাঙলাতেও, উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্মরণ করা যেতে পারে তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন'। তাতে শাস্ত্রীয় রাগ, তালের ব্যবহার সুপ্রচুর, তবে কাব্যগুণের শোচনীয় ঘাটতি আমাদের দেশের সরকারি বাজেটের চেয়েও।

গীত এবং নৃত্য মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'-তে আছে, গিরিশচন্দ্রে তো আছেই। তবে রবীন্দ্রনাথে সংগীত সর্বপ্লাবী।

বাতিক্রমও কি কম? 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'মুকুট', পরিণত বয়সের 'মালিনী'। বাঙ্গকৌতুকে আর কৌতুকনাট্যে গানের ব্যবহার যৎসামান্য, যদি না 'জয় জয় দুকুড়ি দত্ত। ভুবনে অনুপম মহত্ত্ব'—এই কলিটি ইমন কল্যাণে গেয়, এই কথায় সত্যই প্রত্যয় করি। 'চিরকুমার সভা'-তে গভীর, গম্ভীর গানের পাশাপাশি ছড়ানো-ছিটানো হাসি-মশকরার ছড়াছড়ি। সেখানে 'স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে', 'পাছে চেয়ে বসে আমার মন' ইত্যাদি 'অক্ষয়'-চুটকির পাশাপাশি 'যেতে দাও গেল যারা'-র মতো গভীর গম্ভীর সংগীত। বাঙ্গকৌতুকনাট্যেও কি 'কী বলে করিব নিবেদন' বা 'এবার সখী সোনার মৃগ' প্রভৃতি উজ্জ্বল ঝলক নেই? আছে, ওই আত্মখণ্ডন তথা বৈপরীত্যের নামই তো রবীন্দ্রনাথ।

আর যে নাটকে রবীন্দ্রনাথ সুধা তাকে ভোলে নি, কোনও অমল প্রাণের জন্যে রেখে যাবেন এই শাশ্বত আশ্বাস সেই 'ডাকঘর' কিন্তু সংগীতবহীন। মৃত্যুর বছর দুই আগে গোটা সাতেক গান সংযোজন করলেন বটে, আবার (বাবু চেনজেস হিজ মাইন্ড) বাদ দিতেও বিলম্ব হল না। বাছাই করার পরেও রয়ে গেল একটি : 'সমুখে শান্তিপারাবার'। বলে গেলেন এটি যেন তাঁর মৃত্যুর আগে কিছুতেই গাওয়া না হয়। তাঁর শেষ উইল? সেই করুণকাহিনী মরমি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন শৈলজানন্দ মজুমদার। কারুণ্যে সিক্ত অনুরক্ত কারণে 'গৃহপ্রবেশ'ও ভ্রষ্টার বিধানে গীতরিক্ত শীতশাখার ন্যায় হতে পারত। কিন্তু তা হলে কি হিমিকে আমরা পেতাম? জীবন-মরণের সীমানা পারানো বন্ধুর দেখা পাওয়া অসম্ভব থেকে যেত।

'তাসের দেশ' আসলে কস্টুম-প্লে, অবশ্য প্রতীকধর্মী, এবং আমরা কে না জানি যে ওটা ঢের আগে লেখা একটি আষাঢ়ে গল্পের রূপান্তর। একদা গদ্যে বলা কাহিনীটি কিন্তু গানের পর গান, নইলে তাসের বাড়ির মতোই ভেঙে পড়ত। 'যাবই আমি যাবই' ইত্যাদি রাজপুত্র হরতনী সকলেই সুকণ্ঠ, সকলের বক্তব্যই সংগীতে ব্যক্ত।

অন্যান্য নাটকের মধ্যে ধরা যাক গোড়ার গলদ ঘুচিয়ে যেখানে ঘটেছে 'শেষরক্ষা'। জনপ্রিয় প্রহসন। সেখানে মূল চরিত্রদের একটি যদি বলে 'মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে',—পুরুষকণ্ঠে তবে তৎপর জবাব আসে 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না?'

তা ছাড়া ঠাকুর্দা দা-ঠাকুর বা ধনঞ্জয় বৈরাগীরা তো সেই ধাঁচেই গড়া,—যে ধাঁচ আমাদের যাত্রাগানের বিবেকের। 'বাঁশরি'-তে আবার এই-জাতীয় চরিত্রদের জ্ঞাতি পুরন্দর-কেও আমদানি করতে হয়েছে। নাটকের অন্তিম মুহূর্তে পিনাকেতে টংকার লাগিয়েছে সে, তবে না অভ্রভেদী অহংকার লণ্ডভণ্ড হয়ে ধুলোয় লুটিয়েছে।

অর্থাৎ কি প্রগাঢ় নাট্য, কি প্রহসনে,—অনেক কথা অনেকবার বলেও, লেখকের যেন মনে হত, আসল কথাটাই বলা হয় নি,—তাই সেই খেদ বা অপূর্ণতা মেটাতে কেবলই গান।

এই অপূর্ণতা-বোধ লেখকের চরিত্রেই নিহিত। আর সংগীত যে তাঁর নিজেকে মেলে ধরার প্রধান প্রকরণ, তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাই ঐ মাধ্যমটির আশ্রয় নেন।

সুতরাং কোনো অক্ষয়-কে হয়তো নতুন গানের পরিবর্তে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কত কাল পরে বল ভারত রে দুখসাগর সাঁতারি পার হবে'—এই মন-তোলপাড়-করা গানের (সুরের মূল খুঁজতে কি ওয়াজেদ আলি শার 'জব ছোড় চলে লখনৌ নগরী'-র করুণ রেশটি স্মরণ করতে হবে?) পাররাডি করে গাইতেই হবে 'কত কাল রবে বল ভারত রে/শুধু ডালে ভাত জল পথ্য করে/দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন/ধরো হুইস্কি সোডা আর মুরগি-মটন।' এমনকি 'অচলায়তন'-এর পঞ্চক-ও গেয়ে উঠবে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে' (যে গানটির সম্ভাব্য মূল যদিও 'ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চারদিকে মালঞ্চে ঘেরা/ভ্রমরাতে করছে গুনগুন কোকিলাতে দিচ্ছে সাড়া) এবং এই গানেরই শেষের দিকে নিষ্ঠুর রিক্ততা শিমূল ফুলের মতো ফেটে পড়বে মাত্র একটি কলিতে : 'কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।' বাঁচা নামে ব্যাপারটা কোনো দিন যে নিছক যত দিন

হোক, তত দিন গোনায় দাঁড়ায় এই কথাটা প্রথম এত কম কথায় জানিয়ে দিচ্ছে পঞ্চক। গভীর কথা লঘু সুরে বলা রবীন্দ্রনাথ রপ্ত করেছিলেন কবিতাতেও তার দৃষ্টান্ত "ক্ষণিকা"। এই গানটির পুনঃপ্রয়োগ পাই 'তাসের-দেশ'-এ। পাগল-বিশু। তাকেও গাইতে হয় 'ও চাঁদ, চোখের জলে লাগল জোয়ার।'

এ কি আত্মখণ্ডন,—না নাটারূপকে মণ্ডন? প্রথম যুগের দুটি নাটক : 'রুদ্রচণ্ড' বা 'নলিনী'তে গানের সংখ্যা গোটা-দুচ্চারের বেশি ছিল না।

বলা বাহুল্য, আমি 'বাল্মীকি-প্রতিভা' কি 'কাল-মৃগয়া'কে এই হিসাবের বাইরে রাখছি। আর কমবয়সের 'মায়ার খেলা' যে নাট্যের সূত্রে গানের মালা,—তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। তবু এই গীতিনাট্যটিতেই পাই প্রগাঢ় পরিণত এই কবিত্ব 'তোমাতে করিব বাস।' যাকে ভালোবাসি সে যে আমার বাসস্থানও (মনের)—এই কথা এমন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন একজন বাঙালি কবি শত বর্ষ পূর্বে রচিত একটি গানে।

পরবর্তী পরিণত-যুগে যত না-বলা বাণী এল গানের রূপে। স্রষ্টা হিসাবে যত অতৃপ্তি,—তা তৃপ্ত হল সংগীতে।

"বৈঠাকুরানীর হাট" নামে শিথিলবন্ধ উপন্যাস রচনার পরিণাম কি "প্রায়শ্চিত্ত"? অথবা তার শেষ "পরিত্রাণ" গানে গানে? ধনঞ্জয় বৈরাগীর কর্মধারা গান্ধী আন্দোলনের পূর্বাভাস কি না, তা নিয়ে সাল-তারিখের বিচার চলুক, আমরা বরং ততক্ষণ 'রইল বলে রাখলে কারে (ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও) রবার যেটা সেটাই রবে', এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসে বুক বাঁধি। বসন্ত রায়কে দিয়েও অন্তত একটি গান গাইয়ে নিতে ভোলেন না কবি।

'গোড়ায় গলদ'-এ যদি থাকে একটি গান তবে 'শেষ রক্ষা'য় গোটা দশেক। তা ছাড়া 'শারদোৎসব', 'ঋতু-রাজ রঙ্গশালা' আশ্রমের ছেলেমেয়েদের নয়ন ভোলাতেই এসেছে।

'চোখ যে ওদের ছুটে চলে'—অরূপরতন-এর এই গানটি বিলিতি রীতিতে প্রলোগ বা প্রাচীন ভারতীয় ধারায় "প্রস্তাবনা"। গানেই নাটকের মর্মকথার আভাস।

শুদ্ধ নাটকের কয়েকটি আগে লেখা, কয়েকটি আরোপিত, কয়েকটি নাটকের প্রয়োজনে লিখিত। একটি হয়তো প্রবাসীতে প্রকাশিত হল ১৩১৯ সালে, নাটকে ঠাঁই পেল ১৩২৩-এ। মধ্যবর্তী সময়ে সেটি কোথায় কী অবস্থায় ছিল, তা নিয়ে গবেষণা দরকার। কোনো-কোনোটি আবার নাটকের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ বদলও করে। 'রাজা' আর 'অরূপরতন'-এ যে-গান একটিতে স্বয়ং রাজার কণ্ঠে, অন্যটিতে সেটি হয়তো সুরঙ্গমার নিবেদিত উৎসার। দৃষ্টান্ত অনেক, 'রূপে তোমায়' কিংবা 'খোলো খোলো দ্বার' কয়েকটি নমুনামাত্র। 'গে'ছে কি চুল, তুলেছ কি ফুল' এই পুরুষ-জিজ্ঞাসা নারীকণ্ঠে স্বভাবতই 'গে'থেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল' ইত্যাদি জবানে বন্দী হয়ে গেল।

নাটকে গানের ব্যাপারে শেষ কথাটা প্রথম কথাও বটে। প্রথম বয়সে সংলাপকে সুর দিয়েছেন, যেমন গীতিনাট্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি।

মাঝখানে যখন প্রায় অর্ধশতক অতিবাহিত, তখন কি দ্বিতীয় যৌবনে কবির আবার মনে পড়ল যে মুখের মামুলি কথাকেও সুর দেওয়া যায়? একটি-দুটিতে পদ্য আর গীতির সহ-অবস্থিতি, ক্রমশ সৃজনী সাহস বাড়ে 'চিত্রাঙ্গদা'য়, গদ্যের যদি সামান্য মেশামেশি তবে 'শ্যামা' আর 'চণ্ডালিকা'য় কেবলই সংগীত। ('পরিশোধ' বা 'চণ্ডালিকা' নাটিকাটির কথা বলছি না, বলাই বাহুল্য।) নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'-য় গাঢ় গম্ভীর গান তো আছেই কিন্তু 'কখন বা চুলো তুই ধরাবি/কখন ছাগল তুই চরাবি—' এ আটপৌরে সংলাপটিকেও সুরলোকে উড়িয়ে দিতে তিনি কুণ্ঠাহীন।

বস্তুত ব্যক্তিগত যে বিশ্বাসই তাঁর থাকুক না কেন, সেই বিশ্বাসকে তিনি কদাচ শিল্পসৃষ্টির বাধা হতে দেননি। সেই সবুজ বয়সেই অপৌত্তলিক কবির হাতে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র "ভবদারা" গানটি তো আছেই, এমন কি রামপ্রসাদী সুরে 'পাষাণের মেয়ে পাষাণী', 'ভুল করে মা, বলেছি "মা" লিখতেও এতটুকু সংকোচ নেই তার। যাকে অভিমানে মা বলা ভুল হয়েছে বলছেন, তাকেই কিন্তু সম্ভাষণ করছেন ওই 'মা' কথাটি দিয়ে। বড়ো হৃদয়স্পর্শী।

রবীন্দ্রনাট্যের বিচারে ক্যাথারসিস-ক্লাইম্যাক্স ইত্যাদি পারিভাষিক কচকচির দরকার নেই তো! ঘটনার বিবর্ত-নের চেয়ে তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ উত্তরণে। যেমন শ্রীমতীর মহামরণের পর তাঁর পাদস্পর্শে রত্নাবলীর অনুশোচনা। জীবন দিয়ে একটি নটীর পূজা ওই একটি ঘটনায় পুণ্য হয়ে গেল। এরই চরম পরিণতি দেখি 'শ্যামা' নৃত্য-নাট্যে। সেখানে উত্তরণ না ঘটুক পাপীজন নিজের ক্ষমাহীনতাকে নিজেই ধিক্কার দেয়। গানে।

কোনো উৎসর্গপত্রই বলি, আর ব্রহ্মসংগীতই বলি, একটি গানে যাঁকেই তিনি জীবনের ধ্রুবতারা বলে থাকুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের স্থির ধ্রুবতারা কিন্তু ছিল সংগীতই। সেই সংগীত নাটকের সহকারবৃক্ষকে লতার মতো জড়িয়ে উঠেছে। যেহেতু তাঁর কনসেপ্ট অব ম্যান'—অ্যান্ড হিজ ডেসটিনি (মানব-বিষয়ক ধ্যান-ধারণা) পাশ্চাত্য থেকে আলাদা, সেইহেতু তাঁর নাটকের বিন্যাস চেহারা এবং চরিত্র পাশ্চাত্য থেকে আলাদা হতে বাধ্য। ফলে তাঁর নাটক ঘটনার ঘটা ততটা নয় যতটা অন্তর্গত অনুভূতি। আর সেই অনুভূতির ভাষার বলীয়ান বাহন শুধু সংলাপ কখনই হতে পারে না। তাকেই দূরন্ত তুরঙ্গম করে তুলতে পারে উধাও সুর, উদাত্ত ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ তো তবু গান দিয়ে নাট্যবস্তুর অন্তর-লোকের দ্বার খুলিয়েছেন। উপন্যাসেও তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিম সাধের তরণী তরঙ্গে ভাসান নি কি? স্মরণীয় 'আনন্দমঠ', 'মৃণালিনী' প্রভৃতি।

নাটকে গানের প্রাচুর্য। বরং বিপরীত দিক থেকে জিজ্ঞাসাটার অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যাক না কেন। অর্থাৎ প্রশ্নটা—এত গান কেন নয়; এত গান নইলে কী হত। আমার তো মনে হয় তার বাসন্তী ঋতুর "চক্রবৎ আবর্তনের" (বইটির ইংরেজি তর্জমার এই নাম) তত্ত্ব সত্ত্বেও ফাল্গুনীর ফিরে ফিরে প্রথম তথা নতুন হওয়ার অবকাশ থাকত অল্পই। এই নাটকের মর্মবস্তু বিজন মন্দিরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে তখনই, যখন একটি আর্ত অন্ধ বাউলের কণ্ঠে ওই আকুল সংগীতটি গীত হতে শুরু করে।

নিস্তব্ধ গিরিরাজকেও যিনি অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত রেখায় বিসর্পিত অভ্রভেদী সংগীতরূপে কল্পনা করেন, গান তাঁর সৃষ্টিলোকের চাবি হবে বইকি। বিদেশী এক কবি বলেছিলেন, "দ্য পোয়েট্রি অব আরথ ইজ নেভার ডেড।" রবীন্দ্রনাথের কাছে বোধহয় ওই সত্যটারই সামান্য একটু হেরফের : দ্য মিউজিক অব ড্রামা ইজ নেভার ডেড।

আমিও জেগেছি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কচুরিপানার মতো সংঘ ভেঙে ঘুমছুট মানুষ
ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
বাড়িঘরদোর নিয়ে জাগে নি কলকাতা
এখনো, কেলিয়ে আছে আলস্যের মশারি টাঙিয়ে!
লাইনসারানিদের ধমকাতে-ধমকাতে যায় গুবরেপোকা ট্রাম
ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, মানুষের বিদ্যুৎ-আহত
ছুটোছুটি নেই কোনোখানে।
শুধু সে-কারণে
একটি শেয়ালকাঁটা ফুল তার সম্ভ্রান্ত বিন্যাসে
চোখে পড়ে।
এমুড়ো-ওমুড়ো গেছি একই পথে
চোখেই পড়ে নি।
এখন চাঁদের মতো পশ্চাদ্ধাবক
মূর্তি তার ভোরবেলা তিনকোনা পার্কের একটেরে
জেগে গেছে,
স্বীকার করতেই হবে দ্রুত জেগে গেছে।
আমিও জেগেছি বলে তার দেখা পাই॥

আমি দীর্ঘ সাঁতার জানি

রফিক আজাদ

একজীবনে দুইটি নারী :
একটি রাত আর অপরটি দিন—
রাত্রি এবং দিবস মিলে
জীবন আমার পূর্ণ করে,
প্রথমটি তো মধ্য দুপুর,
ঝকঝকে খুব বৃষ্টিবিহীন
চোখ-ধাঁধানো রোদের বাহার,
রূপের ছটা সারা দেহে—
এ সবকিছু ছাপিয়ে তবু
সর্বদাই তো মনে পড়ে
স্নিগ্ধ দুটি চোখের তারা
জেগে ছিল, জেগে আছে।

রাতের মতোই কাজল কোমল
অপর নারীর স্নিগ্ধতা, প্রেম
গভীরভাবে আমায় টানে,
টেনে রাখে ছিলার মতো
জীবন-ধনুর মূল-মুহূর্তে ;
তার শরীরে হ্রদের জলে
ক্ষিপ্র মধুর সন্তরণে
নিমগ্ন হই মধ্যযামে।
আমার এলোমেলো জীবন
তার জীবনে ন্যস্ত করি,
বিন্যস্ত হই নতুনভাবে
নবতর মূল্যবোধে।

এই খেলাটি অন্যরকম
ছেলেখেলা : আমার রাত্রি
আমার দিবস মর্মঘাতী
টানাপোড়েন ; ঘুমে এবং
জাগরণে, গভীর গহন সন্তরণে
আমার দিবস-রাত্রি কাটে—

আমি সুখের ভিখারি নই,
ভিক্ষাবৃত্তি আমার তো নয়
অন্য কারু হতে পারে প্রিয় বাসন!

আমি দীর্ঘ সাঁতার জানি,
আমার জন্যে দুঃখ নামের
সমুদ্র চাই : দুঃখ সাঁতরে
সুখের উপকূলে উঠব
এইরকমই কথা ছিল।
আমিই পারি কেউ পারে নি
কারু পারার কথাও তো নয়—
দুঃখ নাম্নী পূর্ণপাত্র থেকে আমি
গণ্ডূষে জল পান করেছি।
আমার রীতি অন্যরকম,
আমি দীর্ঘ সাঁতার জানি॥

সঞ্চয়

রত্নাংশু বর্গী

কথা লুকিয়ে রেখেছি মায়ের আঁচলে
মা বলেছে কাউকে দেবে না
আমার স্বপ্ন বাবার নীল স্বপ্নের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি
চোখের দৃষ্টি ফিকে হয়ে এসেছে
তবুও অপেক্ষায় থাকেন শান্ত বৃদ্ধ
আমার রক্ত রেখে দিয়েছি
আমার প্রেমিকার গর্ভে
সে এক আশ্চর্য মেয়ে
জানে অনেক কিছুই, বোঝে যেন তার চেয়েও বেশি
কিন্তু বলতে চায় না কিছুই, শুধু
নিঃশব্দে হেঁটে যায় রাতের বারান্দা
অন্ধকারের ঘর ও নক্ষত্রের ছাদ।

দু-হাত-বাড়ানো ফুলপাতা

ওমর আলী

আমার চারদিক থেকে সরে যাচ্ছে সবুজ আঁধার, কামিনীর
কোমল পাপড়ি-মেলে-দেয়া চোখ, সরে যাচ্ছে সুবাস নিঃশ্বাস
আমার পায়ের নীচে ভরে যাচ্ছে নিফল নিজল শুধু তাপ
সরে যাচ্ছে পানির শব্দের মতো গৃহবাসী পাখিদের মুখ ;
মরে যাচ্ছে ঘাস কিংবা আদৌ ঘাসের কোনো চিহ্নই ছিল না
আমাকে এখন শুধু গিলে ফেলবে কেমন কঠোর জনহীন
হি-হি করে হেসে ওঠে সাদা করোটির মতো হাওয়া চারদিক,
আমার নিজের প্রতিধ্বনি ফেরে...এ কোথায় আমি আমি আমি...
আমার চোখের মধ্যে একটি ধানের চারা শুধু জন্ম নিক
একটি কালো ধানের কোমল অশ্রুর ছায়াতলে ফিরে যেতে...
একটি পাখির কণ্ঠে ডুব দিয়ে ওপারের কদম ফোটার
কাছে যাব কিংবা এই আমের ফুলের গন্ধে ভিজব দাঁড়িয়ে...
সরে যাচ্ছে নিবিড় জড়িয়ে ধরা সংসারের পাতা আর ফুল
সুই ও সুতোয় গাঁথা কয়েকটি উজ্জ্বলরঙে অবসরসুখ
সরে যাচ্ছে শরমে রক্তিম সেই সুবাস ফুলের আহ্বান
এখন চারদিকে শুধু বিষকাটা তীক্ষ্ণনখ দিয়েছে বাড়িয়ে
আমার হাতের মধ্যে আরেকটি হাত শুধু আবার আসুক
তোমার চোখের মধ্যে সাঁতার দিয়ে বলুক এই দ্যাখো আমি
তোমার হারানো সেই বন্ধু লোকালয় সেই হারানো হৃদয়
বুক ছুঁয়ে বৃক্ষছায়া প্রাণ ছুঁয়ে দু-হাত-বাড়ানো ফুলপাতা...

শহর সংস্করণ

শংকর বসু

পাঁচ

ধৈর্য-নামক গুণটির উপাসনা আর নিজের শরীরে অস্ত্রাঘাত করে যাওয়া সমতুল্য কিনা, এ বিষয়ে অমলের সংশয় ছিল। কখনও মনে হত না তা নয়, তখন অতি ধীর প্রায়-অদৃশ্য একটি প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে, সে দেখতে পেত। আবার যখন ধৈর্য খুনীর মতোই স্থির আর ঠাণ্ডা মনে হত তখন সে কোনো প্রক্রিয়ার অস্তিত্বই অনুভব করত না। বরং মনে হত সে ক্রমাগত নিজেকে ভুল বুঝিয়ে চলেছে, ভয় পাচ্ছে ভূমিকা গ্রহণ করতে, নিজের চিন্তাকে স্পষ্ট করতে তার ভয় হচ্ছে।

এর মধ্যে একটি গল্প ছিল, গল্পটি প্রায় দিনই যে কোনো অংশ আর অনুচ্ছেদ থেকে গড়ে উঠত, ভেঙে যেত, আবার শেষ থেকে শুরু বা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা চলে যেত সপরিবারে। গল্পটির কেন্দ্রবিন্দু অমলের চাকরি ছেড়ে দেওয়া নয়, সুভদ্রার কনফারমেশন, ঊর্মিলার এম. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ। এই দুটি ঘটনা শেষ পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবেই উতরে যাবে এবং অমল সেদিনই এস. গাঙ্গুলিকে একটি চিঠি লিখে জানাবে, 'আমি দুঃখিত, শরীরমন আর সায় দিচ্ছে না, আপনি আমাকে মার্জনা করুন, নব সমাচারের রিটেইনার হিসাবেই জানাচ্ছি, এই চিঠিটিকে আমার ইস্তফাপত্র বলেই গণ্য করবেন।'

'নব সমাচারের' জন্য হাড়ভাঙা খাটনি আর নামমাত্র মজুরির দিন এইভাবে শেষ হবে। ঐ অন্তিম সময় এগিয়ে আসছে ধীরে, অমলের একটি ভুলে সেই উজ্জ্বল দিনটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হতে পারে। হয়তো, সুভদ্রা কনফারমেশন পেল না, ঊর্মিলার এম.এ.র রেজাল্ট আশানুরূপ হল না—যত বিস্ময়করই হোক না কেন, এরকম দুর্ঘটনা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব সে কী করে ভাববে! কারণ দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার গতি সুভদ্রা বা ঊর্মিলার হাতে নেই, বরং তা দুটি দপ্তরের অধীন, দুটি সরকারি বিভাগই তার নিয়ন্তা।

তবু এর মধ্যে আশার গল্পটি এত যত্নের সঙ্গে পরিবারটি লালন করে চলেছিল যেন তা ঊর্মিলার গর্ভে যে সন্তান এসেছে প্রায় সেরকমই একটি সত্য। এই সন্তানসম্ভাবনার সঙ্গে গল্পটির মিলের কোনো অন্ত নেই, ভালোবাসার সঙ্গে যেমন শঙ্কা থাকে, যেমন তারা

দুজনই গোপনে ভাবত—শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হোক, উদ্বিগ্ন হত শিশুটির সর্বশরীর এবং ইন্দ্রিয় কল্পনা করে, বিকলাঙ্গ শিশু খুব কম মানুষেরই হয়, তবু এই আশংকা সম্পূর্ণ সরিয়ে রাখা সম্ভব হত না।

এক অপরাহ্ণবেলায় ঊর্মিলার স্ফীত উদরটিতে ঊর্মিলারই হাত সরে-সরে যাচ্ছিল। সে যেমন কিছুদিন আগে বলেছিল, আজও সেরকম ভাবেই বলল, 'এখন না —সব সময় টের পাওয়া যায়।'

খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখা অর্ধেক সংসার, আধখানা বেনচি জোড়া, স্তূপীকৃত বিছানা, দু-তিনটি ছবি আর ক্যালেন্ডারে গিলে ফেলা দেওয়াল—এইসবের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বেশ পুরনো আর মলিন হয়ে যাওয়া একটি দম্পতি হঠাৎ অনুভব করল ভালোবাসা। ভালোবাসা থেকে তারা সুখের কল্পনায় অতি সহজে স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। এইসব মুহূর্তে তাদের সমস্ত কথাই হ্যাঁ-বাকে, যে শহর নৈতিক এক বীভৎস বর্ণনামাত্র, সেই শহরের বাসিন্দা হয়ে ও যেরকম দুঃসাহস আর অতিকল্পনায় তারা এনে ফেলছিল একের পর এক স্বপ্নের কথা, আলোচনা করছিল খোলামেলা একটি বাসস্থান সম্পর্কে, তাতে হঠাৎ ছেদ পড়লে অমল সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে।

নাদু মিত্তির প্রায় তখনই ওপর থেকে ডাকতে থাকে, 'অমল আছ নাকি, অমল, একবার আসবে একটু।' ঊর্মিলা বেশ বিরক্ত বোধ করছিল বোঝা গেল। 'যাচ্ছি মেশোমশাই' শুনে সে বলে ফেলল, 'চোদ্দ পুরুষের মেশোমশাই, একবার ডাকলে তো সেই রাত বারোটা।' অমল একটু হেসেই ফেলে, বলতে চায়, আহা মানুষটা বড় নিঃসঙ্গ। শূন্যে প্রাসাদ বানায় প্রতিদিন, আর প্রতিদিন এক-একটি প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপ হয়ে যায়, সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে রোজই তাকে টেনে বের করে নিতে হয় নিজের রক্তাক্ত শরীর।

অমল সবে চটিতে পা গলিয়েছে এমন সময় বিধুবালা আঁচলে কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে এক কাপ চা নিয়ে ঢুকল, 'খাবি কিছু?' সম্ভবত কিছুক্ষণ আগের সুখ-কথা বিধুবালা শুনে থাকবে, তার মুখটি বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সাদা চুলগুলি উষ্ণীষ মনে হচ্ছিল। 'তোমার অর্শ কেমন আছে, দ্যাখো কী যে হয়েছে, আজও ভুলে গেলাম' বলেই সে হাসতে-হাসতে মার হাতে পাইলেক্সের ফাইলটি তুলে দিল। বিধুবালা অমলকে স্মরণ করিয়ে দেয়, 'ওপরে যাচ্ছিস তো, কড়াভাবে বলে দিবি ইলেকট্রিকের বিল দেওয়া সত্ত্বেও কারেন্ট নেই কেন, টাকাটা জমা দিয়েছে, না-কি খেয়ে ফেলেছে?' 'তোমার কি মনে হয় বললেই লাইন আসবে?' অমল হাসছিল, তাকে কেমন হাসিতে পেয়েছে, যেন অবিশ্বাস্য আর মজার সব ব্যাপার ঘটে চলেছে একের পর এক, এবং অমল তাতে কৌতুক বোধ করছে।

বহু প্রজন্ম ধরে ক শহরে বসবাস করছে, সাম্রাজ্যবাদকে সশরীরে দেখেছে শুধু নয়, তার সঙ্গে ব্যাবসা করেছে, আছে আলস্য আর বিনোদনের জাঁকজমকপূর্ণ সুখহর কাহিনী, যদিও পরে ঐ বংশটিতে ভাঙন ধরেছে, সাদাদের দেশে গিয়েছিল বলে তাদের কোনো-কোনো শাখা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর পুরনোপন্থীরা গভীর এবং ব্যাপক ক্ষয়ের স্তূপের উপর বসে এখন বুঝতে পারছে কী ভুল-ই করেছে। কিন্তু ভালোবাসে শুধু অতীতচারণ করতে। নাদু মিত্তির হুবহু এরকমই এক ছকে-বাঁধা চরিত্র হতে পারতেন। ছকে-বাঁধা মানুষ সম্পর্কে উৎসাহ বোধ করা কঠিন, তদুপরি ক শহরের এ বিষয়ে এমন দুর্বলতা আছে যে অতীত ঘিরে গাদা-গাদা বই তারা প্রসব করেছে। সেসব বই কর্পূরের মতো উড়ে যায়, একটি-দুটি বিজ্ঞাপনই সমস্ত কপি নিঃশেষিত করার পক্ষে যথেষ্ট। বিনোদনবিলাস, সাম্রাজ্যবাদের বর্ণনা, সন্ত্রাসবাদের রোমাঞ্চ আর শিল্পকলা থেকে জ্ঞানচর্চা—সবকিছুকে জড়িয়ে নেওয়ার রেওয়াজ আজও প্রবল। 'সেকালের পোশাক', 'ক শহরের অতীত আচার', 'ক শহরের ফিটন গাড়ির বিবরণ' ও 'সেকালের বাবুদের সাহস' হল এরকমই কয়েকটি পুস্তক। এইসব পুস্তকের তথ্য আর ধ্যানধারণাকে সমাজ-ইতিহাসচর্চা বলে চালানো হয়। এরকম প্রেক্ষাপটে নাদু মিত্তির বাস করেন অমলদের মাথার উপর। অবশ্য নাদু মিত্তির সম্পর্কে অমলের ধারণা অন্যরকম। তা যথাসময়ে উপস্থিত করা হবে।

ওপরে যেতে হলে অমলকে প্রথমে নীচে নেমে যেতে হবে। মাঝখানে প্রশস্ত একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্র রেখে থামসমেত বারান্দা চলে গিয়েছে তিন দিকে, অন্য দিকটিতে অমলদের সিঁড়ি। মূল বাড়িটি গড়ে উঠতে পারত অনেক কম জায়গা নিয়ে, কিন্তু তা করা হয় নি। বরং জায়গা আর ঘরগুলোর মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে বেশ খোলামেলা একটি ছন্দ। যেজন্য শুধু ঘরের কাঠামো মনে হয় না বাড়িটিকে, ঘরের থেকে অনেক বড়ো হয়ে ওঠে খোলামেলা জায়গা। আর তা যেমন আছে বাড়িটির মধ্যে, তেমনি বাইরের দিক থেকেও অনেকটা স্পেস বলয়ের মতো ঘিরে রেখেছে কার্নিশ, থাম, অলিন্দ আর দেওয়ালফাটানো অশ্বত্থের চারা। এরকম তিন-চারটি অশ্বত্থচারা রয়েছে যা বহুবার চেষ্টা করেও নির্মূল করা যায় নি। বর্ষাঋতু তাদের ঠাঁই বাঁচিয়ে দেয়।

এই চিঠিটা এসেছে করপোরেশন থেকে।

হুঁ।

জবাবটা তুমি একটু দেখে দাও, বাবা।

ঠিকই তো আছে।

বেশ, তাহলে কালই পোস্ট করে দেব, আসলে হয়েছে কি—ইন্সপেক্টার আমাকে বলল বাড়িটার এরিয়া, ঘরের সংখ্যা, ভাড়া এইসব কেটেছেঁটে দেখাতে, ঘুষ চাইছিল আর কি। পল্টু খুব বোঝাল—বাবা দিয়ে দাও, কিন্তু আমি দেখলাম ঐ লোকটাকে পয়সা দেওয়ার থেকে দুটাকা বেশি ট্যাক্স দেওয়াই ঠিক। সে টাকাটা তো কলকাতার কাজেই লাগবে, না-কি!

হ্যাঁ, কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে।

তা-ও ভেবেছি—ধরো রেশনের চাল খাবে না কেন, শহরসুদ্ধ লোক তো তাই-ই খাচ্ছে, আর ইয়ে—বাইরের ঘরে আমি একটা দোকান খুলব।

দোকান?

হ্যাঁ।

ঘরে বসে না থেকে, পুরনো কাগজ বেচা-কেনা করব।

বৃদ্ধ উৎসাহের আতিশয্যে ঘরের ভিতর থেকে বেশ বড়ো একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এলেন, স্তূপীকৃত বস্তা দেখালেন আর একটি লিস্ট বের করে পড়ে শোনালেন সম্ভাব্য ক্রেতা-বিক্রেতাদের নামঠিকানা। অমলের অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ যেন আশ্চর্য সারলা ফিরে পেয়েছেন, যেন এইবার তাঁর বহুদিনের এক স্বপ্ন সফল হবে, এ যেন এক উচ্চাশা তাঁর কাছে এবং তিনি একান্ত সংগোপনে এতদিন ধরে গড়ে তুলছিলেন এই একটি স্বপ্ন। পরে শিশিবোতলকাচভাঙা, লোহা-সিসে-তামা ইত্যাদির কেনাবেচা করবেন বলে কাগজকুড়োনো ছেলেদের সঙ্গেও নাকি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভেবো না যে আবার খোয়াব দেখতে শুরু করেছি।

ছিঃ ছিঃ, তা কেন ভাবব, আমি আপনার বয়সের কথা ভাবছিলাম।

বয়সটা অমল মনের কাছে, অসুস্থ তো নই। আমি হিসেব কষে দেখেছি ঠিকমত চালাতে পারলে মাসে চারশো টাকা অনায়াসে রোজগার করা যাবে। কোনোদিন কিছু করি নি বলে আজও কিছু করব না, এর কোনো মানে নেই।

নাদু মিত্তির ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কোনো ব্যাবসার পরিকল্পনা করতে চাইল না কেন? এই প্রশ্নটি অমলকে অনুসরণ করছিল সিঁড়ির ধাপে-ধাপে, দোতলায় এসে উঠোনের উপর টানানো ছেঁড়া, ভাঙা আর বেঁকে-যাওয়া লোহার জালটিতে জমা-হওয়া ছাতানাতার দিকে অমলের চোখ গেল। আর তার হঠাৎই মনে হল—শুধু চারশো টাকা নয়, নাদু মিত্তির, পঁয়ষট্টি বছরের একজন মানুষ, ফিরে পেতে চাইছেন আত্মবিশ্বাস। উদ্বাস্তু হয়ে আসা একটি বাঙাল পরিবার এ শহরে অতি কষ্টে বেঁচে থেকেও নিজেদের উন্নত করার যে চেষ্টাটি চালিয়ে গিয়েছে, নাদু মিত্তির সেই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে একা-একা অনেক ভেবেছে। হয়তো সে এই ছেঁড়া জালটির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকে শুধু তাই ভেবেছে, অমলকে একজন মানুষ ভেবেছে, ভেবেছে অমল ভাগ্যতাড়িত নয়। আর তখনই কানে এসেছে পল্টুর শিশ-ধ্বনি, নাদু মিত্তির তখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে, সামান্য কথাকাটাকাটিতে চিৎকার করে ফেলেছে, 'দরকার হলে বাড়ি বেচে দিয়ে বস্তিতে উঠে যাব, তোর মা ঠোঙা বানাবে, তবু আমি উত্তর কলকাতার নাদু মিত্তির এই পরিচয় দিয়ে ভিক্ষে করতে পারব না।' বা সময়-সময় বলে ফেলেছে, 'দেখ, জুটমিলে কুলির কাজে লাগব ঠিক করেছিলাম একসময়, তাহলে তো তুই আমাকে বাবা বলে পরিচয় দিতিস না' এইরকম হাজার এক কথা, হাজার রকমভাবে নাদু মিত্তিরের পরিচয় বদলে ফেলার এক মরিয়া চেষ্টা আজও কাজ করে চলেছে এবং তাতে অতীতের কোনো স্মৃতিভারাতুর কোমল দুঃখ নেই। বরং আছে পঁয়ষট্টি-বছর-হয়ে-যাওয়া একটি জীবনের প্রতিটি দিন ভেবেচিন্তে খরচ করার তীব্রতা।

ঘরে ঢুকতেই অমলকে বিমলবাবুর মুখোমুখি হতে হল, মানুষটি নিজের পছন্দ-অপছন্দ লুকিয়ে ফেলতে

জানেন না। পৃথিবী তাঁর কাছে সংকুচিত হয়ে এসেছে এতখানি যে সবকিছুই নানা আবেগের চেউয়ে জড়ানো ব্যক্তিগত, ছোটো একটি পৃথিবী। এই পৃথিবীতে নাদু মিস্তিরের জন্য সঞ্চিত আছে অযৌক্তিক ঈর্ষা, যেন নাদু মিস্তিরের অতীত সৌভাগ্যের পুঁজি লুটে নেওয়া হয়েছিল বিমলবাবুর কাছ থেকেই।

অর্থাৎ বিমলবাবু নাদু মিস্তিরকে এখনও তাঁর অতীতেই দেখতে পান, নাদু মিস্তিরের অতীতের প্রতি বিমলবাবুর ঈর্ষা আছে। তিনি ইলেকট্রিক বিল সম্পর্কে জানতে চাইলেন, অমল সে বিষয়ে কোনো কথা বলে নি শুনে মন্তব্য করলেন অমলের ভালোমানুষিটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। টাকা পয়সা দিয়ে অন্ধকারে থাকার কোনো মানে হয় না। ফুটো ছাত আর স্যাঁতসেতে মেঝের কথা নাহয় ছেড়েই দেওয়া গেল। তবে ঊর্মিলার এই অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগলে আর রক্ষা থাকবে না—একথাও বলতে ভুললেন না। এক নিশ্বাসে এইসব অভিযোগ সেরেই ভদ্রলোক জপ করতে বসে গেলেন, অমল তার বাবাকে তখন অকারণেই লক্ষ করে যেতে লাগল, মনে হল, বাহ, আজও তো বেশ ব্রাহ্মণের মতো দেখতে।

ছয়

ভূয়া রেশন কার্ড থেকে যদি এরকম কোনো সিদ্ধান্ত করা হয় যে ক. শহরে এমন অজস্র মানুষ আছে যাদের অস্তিত্ব সরকারি দপ্তরের গণনার মধ্যে নেই, তাহলে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে। অমলের যুক্তি ছিল মোটামুটি এরকম : যদি দেখা যায় একজন মানুষেরই দুটি ঠিকানায় দুটি আলাদা নামে কার্ড রয়েছে এবং সে দুটি জায়গা থেকেই রেশন তুলছে, তাহলে সেই মানুষটিকে ভূয়া, বা মানুষটির কোনো অস্তিত্ব নেই—একথা বলা চলে না। অন্যদিকে, ক শহরে যারা কাজের স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে তারা তো বেশিরভাগই আসছে শহরের বাইরে থেকে, সস্তার হোটেল তাদের নামে কার্ড রাখতে সক্ষম হলেও দেখা যেত শহরে মোট ভূয়া কার্ডের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে, শহরের বাইরে রেশন এতই অনিয়মিত এবং উঠে যাওয়ার মুখে যে, তা নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। বলা বাহুল্য, এ জিনিসটা ঠিক এভাবে ঘটছে না, বাড়তি রেশনের প্রয়োজন অনুভব করে রেশন-দোকানদাররাই বাড়তি দামে চাল, গম, চিনি, তেল ছাড়ছে—এ প্রায় একটি সমান্তরাল খাদ্যবণ্টনব্যবস্থা।

আমি এমন ঘটনাও দেখেছি যে গ্রাম থেকে গরিব চাষি-পরিবার এসে উঠেছে শহরের কোনো বাড়ির সিঁড়িঘরে। শর্ত হল বাড়িটির টুকটাক কাজ তারা করে দিচ্ছে আর এদের নামে কার্ড বের করার পর আশ্রয়দাতা চিনি এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে নিচ্ছে, চাষি-পরিবারটি তুলছে শুধু চাল আর গম।

বুঝলুম, কিন্তু তুমি কি এগুলোকেই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ বলতে চাইছ?

অতদূর না হলেও খাদ্যসমস্যা আর খাদ্যবণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে বেশ হতাশার ছবি ফুটে ওঠে।

খোলা বাজারের ভূমিকা কতখানি?

আমার মনে হয়, যদি আমরা সত্যিই সমস্যাটিকে ধরতে চাই তাহলে চাষ থেকে খাদ্যবণ্টন পর্যন্ত গোটা জিনিসটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা দরকার—এর থেকে সাপ বাণ্ড যাই বেরোক না কেন।

অমল এত কথা বলবে নিজেও ভাবে নি। আসলে এ প্রসঙ্গে তার মধ্যে কাজ করে চলেছিল গভীর ভয়। একজন এন. মজুমদার বিশেষজ্ঞের আলগাভাবটুকু বজায় রেখেই অমলের রক্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল একটুকরো ভয়। তারপর অমলের ভাবনা চলেছে মূলত ঐ ভীতির তাড়নায়, অন্যদিকে রবিবার থলে হাতে রেশনের দোকানে লাইন দেওয়া থেকে, দোকানদারের হাত-ঝটকা, হাত-সাফাইয়ে প্রতিটি কার্ডহোল্ডারের কাছ থেকে সামান্য-সামান্য মাল কেটে নেওয়ার মতো নিরীহ ঘটনার মধ্যেও যে লুকিয়ে থাকতে পারে অবয়বহীন মন্থর এক দুর্ভিক্ষ—তা যেন সে আজ এই প্রথম আবিষ্কার করল। যেমন তার মনে পড়ে গেল বাল্যকালের কথা, 'স্বাধীনতা' পত্রিকার এক-একটি কপি বিক্রি হয়েছিল দশ টাকা দামে, যেমন এখন যে কোনো দৈনিক কাগজ বিক্রি হতে পারে ঐ দামে যদি ক্রিকেটের দিগ্বিজয়ের সংবাদ-বিবরণ প্রকাশিত হয় রঙচঙে ছাপায়। তবু এই বাইশ বছরের মধ্যে খাদ্যসমস্যা সংবাদপত্রের সামান্য জায়গা নেয় নি, এমন একটিও দিন নেই। বাল্যকালের 'স্বাধীনতা' কাগজটির সমস্ত স্পেসই অবশ্য গ্রাস করেছিল দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা।

'সময় অনেক বদলে গিয়েছে'—বললেন সিনিয়র রিপোর্টার টি. পি. বসু, আর-একটি টেবিল ঘিরে বসে থাকা পাঁচজন মানুষ যেন সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে পেলেন হারিয়ে-যাওয়া একটি দুর্লভ চাবি। এস. গাঙ্গুলি কমনীয় চেয়ারটি হেলিয়ে দিলেন পিছনে, ফোমবসানো চেয়ারটি তাঁর শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে কাত হল একটু। সামান্য শব্দ শোনা গেল এই মুদ্রাটির দরুন।

এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে—

আপনি কি পরিকল্পনার কথা বলছেন?

না, তবে ঠিক না-ও বলতে পারি না।

তাহলে?

আমি স্বাধীনতার কথা বলতে চাইছি।

পাঁচজন মানুষ অতঃপর হারিয়ে যেতে লাগল ক. শহরের স্বাধীনতা-উপাখ্যানে। এখন তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে ততটা কথা বলছে না, বরং অনেক বেশি একনিষ্ঠ তারা, শহরটি কীভাবে ক্রমশ পুরনো রীতি-নীতি কেতা ঝেড়ে ফেলছে, ক শহরের বাইরের একটি কর্তৃত্বের পক্ষে যে প্রশাসন আগে কাজ করত, কর্তৃত্ব বদলে যাওয়ার একত্রিশ বছর পরে পুরনো প্রশাসনের অনেকেই অবসর গ্রহণ করেছে। নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও ঘটেছে লক্ষণীয় অদলবদল, প্রথম দশ-পনেরো বছর এসব করতেই কেটে গিয়েছে। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা এই, স্বাধীনতার পয়েন্টটি এমনকি কমিউনিস্টদের পক্ষেও আজ আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ নিজেদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি কর্তৃত্বকে কিছুতেই আর সেভাবে প্রতিপক্ষ হিসাবে খাড়া করা সম্ভব নয়, যেমন নৈতিকতার দিক থেকে একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র পারে না শুধু গাঢ় কালিতে হতাশা আর দুর্দশার বিবরণ ছেপে যেতে, সমষ্টির জীবনে ভয়ের বীজ বপন করতে।

শেষ পর্যন্ত ভূয়া রেশনকার্ড উদ্ধার-অভিযানের কাজটি অমলকে দেওয়া হলে সে নিজেকে খাদ্যদপ্তরের একজন সৎ ইনসপেক্টাররূপেই দেখতে পেল। অনুভব করল স্বাধীনতা, সময়, ইত্যাদি ধারণা। অমল এখন কোনো একজন বিশেষ মানুষ নয়, দপ্তরের পর দপ্তর ঘুরে সমস্যার পর সমস্যা বদলে সে নিজেই হয়ে উঠছে একজন পূর্ণবয়স্ক বেকার থেকে সুবিচারপ্রার্থী একজন নাগরিক, একটি রেশনকার্ড তার নিজের নামে ইস্যু করা আছে, তবু এখন সে নিজেও নামপরিচয়হীন ক শহরের এক ভূয়া অস্তিত্ব, ভূয়া রেশনকার্ড, যে খুঁজে বেড়াবে আরও অনেক ভূয়া মানুষকে।

বিশাল হলঘরটিতে ঢুকে, নীল-উর্দি-পরা এক ছোকরাকে চা দেওয়ার জন্য ইশারা করে, অমল একটু একা বসতে চেয়েছিল। স্থানসংকুলান না হওয়াতে অন্য-অন্য টেবিল থেকে একজন প্রেসের লোক, বিজ্ঞাপন বিভাগের শ্রীযুক্ত দাস ও আর বিনোদনের পাতার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত অমলের টেবিলটিতে উঠে এল। এর মধ্যে প্রেসের মানুষটিরই দেখা গেল কথা বলার বিশেষ আগ্রহ নেই। একই অফিসের চারজন কর্মী, যারা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত, কী করে তারা নিঃশব্দে চা খেয়ে যেতে পারে, চা খাওয়ার সময়টুকু ধরে কীভাবেই বা থেকে যেতে পারে নিজ-নিজ ভাবনায়। বিশেষ ক শহরটি সর্বদাই যেন কিছু প্রকাশ করতে চায়, কথা বলার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকে, এ শহরের অধিকাংশ মানুষই এড়িয়ে যেতে পারে না শহরের এই গাঢ় প্রভাব। যেজন্য অমলের মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে অফিস-কাছারির মানুষ থেকে পথচারী মানুষ পর্যন্ত সকলের বুকেই 'কথা' নামের ছোটো একটি ছাপ লুকিয়ে আছে আর এই সুপ্ত রহস্যটি তারা সবাই জানে বলে অপরিচিত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েও স্ট্যাম্পটি পড়ে ফেলতে পারে। বিপুল এবং পৌনঃপুনিক ব্যবহারে কেমন হলুদ হয়ে এসেছে শব্দটি।

'বুঝলেন অমলবাবু', দাশ কিংবা দাশগুপ্ত কেউ একজন বললেন, কিন্তু অমলের উদ্দেশে কথাটি তিনি শুরু করতে পারলেন না সেভাবে, কারণ অপরজন তৎক্ষণে বলে ফেলেছেন, 'বিজ্ঞাপনের দুনিয়া মেয়েরা দখল করে নিচ্ছে, ক-দিন বাদেই আমাদের যেতে হবে মেশিনঘরে। যা ইংরেজির তোড়, আমরা তো আর সাহেবি ইস্কুলে পড়ি নি।' মেশিনঘরের মানুষটি বসে ছিলেন উর্দি পরেই, তাঁর উর্দিতে লেগে আছে কালির ছাপ, যা শ্রমের চিহ্ন। মানুষটি না হেসে পারলেন না, 'এখানে ভ্যাকাসি নেই দাদা, নতুন মেশিনে আর বেশি লোকের দরকার নেই, কদিন পরে বোতাম টিপলেই দেখবেন কাগজ বেরিয়ে আসছে।'

এরকমভাবে গড়ে উঠতে পারে নিটোল একটি আলো-

চনা, এমনকি চারজন মানুষ আলোচনা করতে-করতে বেজায় উত্তেজিত হয়ে যেতে পারেন।

তবু দাশ, দাশগুপ্ত, প্রেসের লোকটি এবং অমল কিছুক্ষণ পরেই এসব ভুলে যাবে। হয়তো এ প্রসঙ্গ থেকে ততক্ষণে তারা সরে যাবে রাষ্ট্রনীতির বিষয়ে, আলোচনা করবে বিভিন্ন দল সম্পর্কে। আর শেষে সমস্বরে সবাই গেয়ে উঠবে একটি কলি, তা থেকে জানা যাবে রাজনীতি সম্পর্কে তাদের কোনো আস্থা নেই। বরং তারা সর্বদা অনুভব করে সংশয়, সংকট আর বিপুল বিচ্ছিন্নতা।

অচিরেই সেই বিচ্ছিন্নতা এল শরীরী-ভাবে, একে-একে সবাই উঠে গেলে অমলকে ভাবতে হল 'চাকরিটা ছাড়তেই হবে।' যেমন সে অনুভব করল, ব্যাপক ঘটনা-হীনতাই তাকে ঠেলে দিচ্ছে এক-একটি সমস্যার দিকে। নাহলে খাদ্যসমস্যা বিষয়ে একের পর এক নিবন্ধ লেখার দায় তার উপর বর্তাত না। প্রেস অত্যাধুনিক যন্ত্রে সেজে উঠেছে পরিকল্পনামাফিক, পরিকল্পনামাফিকই সমস্ত দপ্তরের বিজ্ঞাপনবিভাগে বেড়েছে মেয়েদের উপস্থিতি, যেমন এখন মেয়েরা সাংবাদিকতাও করছে। যদিও মেয়েদের এই ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে মেয়েদের নিজস্ব চেষ্টা যতটুকু আছে তার থেকে বহুগুণ বেশি রয়েছে 'সময়'-নামক শব্দটি। অথচ মেয়েদের কাজে যোগ দেওয়া কত পুরনো ব্যাপার, এ জিনিসের বয়স কবে অতিক্রম করে গিয়েছে একটি শতক। তবু যে দাশ বা দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে সময়ের উল্লেখ করে সমসাময়িকতার কথা বোঝাতে চায় কেন সে এক রহস্য। আবার এস. গাঙ্গুলি তাকে চিত্রিত করে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বর্ণনায়, যদিও সুকোমল গাঙ্গুলি চাইছিলেন ভুয়া কার্ডের বিষয়টি দুর্নীতির দিক থেকে উদ্ঘাটন করতে, তবু তিনি এক তীব্র টান অনুভব করলেন সময়ের, পরক্ষণে সময় হয়ে গেল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা। সুকোমল গাঙ্গুলির সঙ্গে দূরভাষযন্ত্রে কথা বলার সময় কৌতুককর ক্রশ কানেকশনটি কেমন এক অন্তর্বাস্তব বলেই বোধ হচ্ছে এখন তার। এ শহরের সমস্ত মানুষেরই আছে সময় সম্পর্কে এক বিচিত্র এবং উত্তেজক ধারণার প্রবাহ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ -হীন এই ঘোলা প্রবাহটি ক. শহরের সহস্র পশ্চাৎপদতা আর কয়েকটি বিরল অগ্রগতিকে এনে ফেলেছে একটিই বন্ধনীর মধ্যে।

সাত

ভদ্রলোককে অমল কিছুতেই চিনতে পারল না, একেবারে সামনে এসে অগত্যা বলতেই হল 'আমিই অমল চক্রবর্তী, আপনাকে ঠিক—', মাঝবয়সী ভদ্রলোক যেন-বা একটু সংকোচ বোধ করছেন। অমল তাঁকে অনুরোধ করল ভিতরে আসার জন্য। আর তার একটু পরেই গোটা ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ইন্দ্রই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছে। অমলদের বাড়ির একটি মস্ত সুবিধে হল তার অবস্থান। কলকাতার কেন্দ্রে, শহরটির এই কেন্দ্রে মাত্র ষাট টাকা ভাড়ায় দুটি খুপরি পেয়ে যাওয়া কল্পনা করা যায় না। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি চিরকুট ছিল, তাতে ইন্দ্র অমলকে অনুরোধ করেছে সে যেন বাড়িটি ছাড়ার আগে ভদ্রলোককে এই দুটি ঘরের অধিকার দিয়ে যায়। নাদু মিত্তিরকে রাজি করানো না গেলে, ইন্দ্রর প্রস্তাব : তুই ঘর ছাড়বি না। ইন্দ্র জানে যে ইতিমধ্যে একজন অমলকে পাঁচ হাজার টাকা সেলামি দিতে চেয়েছিল। দুজন প্রার্থীর অবস্থাই যথেষ্ট খারাপ, তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। ইতিমধ্যে বিধুবালা, বিমলবাবু সহ পরিবারের সবাই রায় দিয়েছে, বাড়ি ছাড়া চলবে না। বরং কষ্ট করে থেকেও, যদি কোথাও মাথা গোঁজার একটা ব্যবস্থা করা যায়, সেটাই দেখতে হবে। 'বাড়ি করা'—বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট কেনার কথাটা উচ্চারণ করতে তাদের সংকোচ ছিল, বা ওভাবে বললেই গোটা জিনিসটা তাদের পরিস্থিতিতে অলীক মনে হত, সেজন্য 'মাথা গোঁজার' কথা বলা হচ্ছে।

যে-কোনো কারণেই হোক, ভদ্রলোক নিজে থেকে তাঁর নাম প্রকাশ করেন নি, অমলও জিজ্ঞেস করতে পারে নি—আপনার পরিচয়? বরং ক শহরে একটি বাসস্থানের জন্য ভদ্রলোক কী-পরিমাণে ভেঙে পড়েছেন, একটু পরেই শুনতে হল সেই করুণ, একঘেয়ে গল্প।

এখন তাঁরা যেখানে আছেন তা এককথায় চার দেওয়ালে ঘেরা। একটি ঘর মাত্র, প্রাতঃকৃত্যের কোনো সুবন্দোবস্ত দূরের কথা, নগর-স্বাস্থ্য-দপ্তরের সাধারণের জন্য বানানো একটি বাথরুমেই সবাইকে ছুটতে হচ্ছে, পাশে ঘিনজি বাজার থাকায়, ঘরটি সাধারণের চোখে সব সময়ই উন্মুক্ত। এই বাড়িটিতেও জলকল কমন জেনে তিনি হতাশ হলেন না, বরং বললেন ঐ নিভৃতির কথা।

মেজ ছেলে এবার মাধ্যমিক দেবে।

পড়াশুনো করার জায়গা পাচ্ছে না?

জায়গার কথা নয়, সে সমস্যা তো আছেই।

তবে?

দিনরাত মাইক, হৈ-চৈ, খিস্তি—

ও।

মেয়েরা কাপড় বদলাতে গেলে, ঘর থেকে সবাইকে বের করে দিতে হয়।

বুঝেছি।

দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে হয়।

হুঁ।

ঐ একখানা ঘরে রান্না, অসুখ, ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, লোকজন—

বুঝতে পেরেছি। আপনি ইন্দ্রকে বলবেন, বাড়ি যদি কখনও ছাড়ি আপনাকে ওর মারফত জানাব।

ভদ্রলোক অমলের একটি হাত তুলে নিয়েছিলেন নিজের দুটি হাতের মধ্যে। গোটা একটা জীবনে এর থেকে বেশি কোনো কামনা তাঁর যেন সত্যিই নেই। অমলের ঐ কথাটুকুতে অবশ্য কী করে সে কামনা পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হল, সে এক বিস্ময়। হতে পারে, সমস্যাটি তাঁকে, তার পরিবারসমেত, এতখানি অসহায় করে দিয়েছে, এত একা হয়ে গিয়েছেন যে তিনি অমলের মধ্যে প্রকৃত সমবেদনা আবিষ্কার করতে পেরেছেন, বা চেয়েছেন। তাঁর এই অবস্থায় বড়ো বেশি প্রয়োজন এই শহরে এমন কিছু মানুষ খুঁজে বের করা, যারা হৃদয়বান, যাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে।

ক শহরের বিবরণ নামে কোনো কিছু রচনা করা নিতান্ত কঠিন, শহরটির বিবরণ এক তো হতে পারে নিসর্গের দিক থেকে, আর আছে এক ধরনের ইতিহাসবাদ। যথার্থই বিবরণ রচনা করতে বসলেও এক মহাবিপদ, শহরটির দশ কোটি মানুষকে একটি বিবরণের আলখাল্লায় টেনে আনা যায় না। তবে এই ঠিকানাবদলের ব্যাপারটি এক নিয়মিত ঘটনা, সর্বদাই যার প্রস্তুতি চলেছে। শহরটির এ কোনো নিজস্বতা নয় নিশ্চয়ই, কারণ সমস্ত বড়ো শহরেই মানুষের এরকম ওঠানামা, আশা-নিরাশার কাহিনী থাকে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় সেই আদিম আবেগটি, সবরকম অবস্থাতেই তারা আশা করতে জানে। আশার শরীর যদিও স্পষ্ট নয়, অনেক সময় তা শুধু যে পঙ্গু তাই নয়, বরং এক ধরনের পালিয়ে যাওয়া, আশার একটি রেশমগুটিতে আত্মগোপন করা। 'অমল, ভদ্রলোকের ঠিকানাটা রাখলি?' বিমলবাবু যে পাশেই শুয়ে ছিলেন সিগারেট ধরানোর আগে সে খেয়াল করে নি। এখন ত্রস্তভাবে সিগারেট লুকোতে-লুকোতে, কাশতে-কাশতে তাকে বলতে হল, 'ইন্দ্রকে জানালেই হবে।' সম্ভবত বিমলবাবু তাতে স্বস্তি পেলেন। যদিও বিধুবালা এবং সুভদ্রা বলল অন্য কথা, 'একেবারে আমাদের মতো, বাবা মা আর দুই ভাই বোন।' 'ভদ্রলোক কী করেন?'—ঊর্মিলা। 'যাহ, জিজ্ঞেস করা হয় নি। মনে তো হয় ছোটোখাটো কোনো কাজ করেন।' বলেই অমল উঠে পড়ল।

ইন্দ্র সমাদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা তার মনে পড়ে গেল। আগন্তুক ভদ্রলোক সম্পর্কে জানার জন্য ততটা নয়, বরং ঊর্মিলার দিন এসে যাচ্ছে, তার কিছু প্রস্তুতি দরকার। ইন্দ্র সমাদ্দার এ বিষয়ে অমলকে সাহায্য করবে, এমন একটা কথা অনেকদিন আগেই হয়েছিল। এখন সব ঠিকঠাক করে ফেলা দরকার। অমলকে একবার ভেবে নিতে হল সে কোথায় ইন্দ্রকে এখন পেতে পারে।

কয়েকটা জিনিসের দিকে নজর দিলেই চলবে : আহার, নিদ্রা, মানসিক শান্তি। বলেছিল ইন্দ্র। ছেলেবেলার বন্ধু বলেই সে অমলকে আলাদাভাবে পুষ্টিকর খাদ্য, আলোবাতাসে স্নান করে নিয়মিত—এমন ঘর, এসব কিছু বলে নি। হালকা কিন্তু ভালো বইয়ের কথা ইন্দ্র বলতে ভোলে নি। এসব আজকাল সবাই জানে, কিন্তু যে জিনিসটা অমলকে ভাবিয়েছিল তা হল ক শহরে এই যত্ন আর সতর্কতার বিষয়টি কতখানি নতুন। কেন এক শ্রেণীর মানুষ হঠাৎ জন্মের ব্যাপারে এতখানি সম্পৃক্ত বোধ করছে। কিছুদিন আগেও যা ছিল নেহাতই এক প্রাকৃতিক ব্যাপার, সেই বিষয়ে স্বচ্ছল মানুষজনের এতখানি সচেতনতা অন্য কিছুর আভাস বহন করে কিনা। এরকমভাবে সে আর ইন্দ্র আজ জড়িয়ে গেল কথায়, 'আসলে চিকিৎসাশাস্ত্রও বেশ বদলেছে।' 'মানে আগে

এসব জানা ছিল না?' 'না, তা নয়, প্র্যাকটিশের দিক থেকে বলছি, তখনকার ডাক্তাররা সামাজিক দিক থেকে ভয়ংকর গোঁড়া ছিল।' 'রাখ তো, কথায়-কথায় এই গোঁড়া আর আধুনিকের ভুয়ো লড়াই দেখাস না।' 'চটে যাচ্ছিস?' 'বোর লাগে শুনতে, যাই বলি না কেন, শেষ পর্যন্ত এই এক কথা—'।

'পরিবারকল্যাণ' বিভাগে মানুষের যে ভিড় আর ব্যস্ততা তার মধ্যে আড্ডা হওয়া কঠিন, নীল-স্ট্যাম্প-মারা লম্বা ফ্যাল কাগজে 'রিপোর্ট অর্ল' লিখতে-লিখতে ইন্দ্রও হারিয়ে ফেলেছিল কথার সূত্র। সাদা-উর্দি-পরনে এক-জন মানুষ তারস্বরে চিৎকার করে ডেকে যাচ্ছিল ক শহরের জননীদের, 'শেফালি দাশ, বেগম আখতার, লাবণ্য মাইতি, রেখা পাল, সুলেখা বোস, কল্যাণী মহাপাত্র, বিজয়া রায়, বন্দনা ব্যানার্জি, আলপনা দেবনাথ, অসীমা পাল, শিবানী পোদ্দার, লক্ষ্মী মণ্ডল—'। এই ডাক কখনও পরপর, কখনও-বা পাঁচ-দশ মিনিটের ছেদসহ-যোগে এমনভাবেই উচ্চারিত হচ্ছিল যেন তা কোনোদিন ফুরোবার নয়। চোখের কোল টেনে দেখা, একবার স্টেথো বসানো, বা ইউরিন অথবা ব্লাড রিপোর্টে চোখ বুলিয়েই দুর্বোধ্য সাংকেতিক লিপির মতোই ডাক্তারি হাতের লেখায় কিছু আঁচড় টানা চলতে থাকবে ঘন্টা-দুয়েক। নামডাকা শুরু হবে আবার তার পরের দিন, পরের পরের দিন, আগামী প্রতিটি দিন শুধু ঐ নামডাকা।

ইন্দ্রর মতে, নার্সিং হোম হল ভূয়া মানসম্মান আর আরামবোধের জায়গা, হাসপাতালই যন্ত্রপাতিতে সব-থেকে আধুনিক এবং তৎপর। তদুপরি সে নিজে এখানে রয়েছে, এইসব মিলে একটি সরকারি হাস-পাতালের রেজিস্টারে ঊর্মিলার নাম টুকে নিল সে। আর অমল এবার কল্পনায় নয়, বাস্তবেই দেখতে পেল ক শহরের লক্ষ লক্ষ জননীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রেমিকা।

তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।
হাসপাতালের দুর্নীতি সম্পর্কে?
দূর।
তবে, ক্লাশ ফোর স্টাফের গুন্ডামি?
আরে না, না।
চল, খেতে-খেতে শুনব।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল থেকে দুজন একসঙ্গে বেরিয়ে পার্কসার্কাস ময়দানের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, মেয়েদের কলেজের গেট থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে নতুন-নতুন মেয়েরা, এ দৃশ্য কত পুরনো। ইন্দ্রর গলায় তখন স্টেথোটি ঝুলত, বাঙলা চলচ্চিত্রের একজন ডাক্তার নায়কের মতোই তাকে লাগত, প্রতিদিন দাড়ি কামিয়ে আফটারশেভ সুগন্ধি ঘষে নিত গালে। ইন্দ্র চার-পাঁচটি প্রণয়-উপাখ্যান পেরিয়ে এসে আজও অবিবাহিত, যুবক একজন।

আগেকার সেই চাচার রেস্তোরাঁতেই তারা বসেছে, এখানে পুরুষেরও অধিকার আছে কেবিন দখলের। যেমন আছে বিচিত্র মানুষের একসঙ্গে বসে আহার করা, চা-পান আর তৃষ্ণা নিবারণ। জলের গ্লাসটি শেষ করে ইন্দ্রই প্রথম তাড়া লাগাল, 'বল।' 'বলছি', অমল হাত তুলে একটু সময় চেয়ে নিল যেন, তারপর বয়কে বলল, 'টোস্ট দুটো, ওমলেট আর চা।' এইটুকু বলে ফেলে সে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে, একবার নড়েচড়ে বসে যেন প্রসঙ্গ তৈরি করে নিল।

'তুই তো হাসপাতালের অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও বসেছিস আগে?' 'হুঁ।' 'এমনিতে সাধারণ গরিব মানুষই হাসপাতালে আসে।' 'যা বলতে চাস ঝটপট বল তো।' 'খেতে না পেলে অ্যানিমিয়া হয়?' 'অ্যানিমিয়া নানা কারণে হতে পারে, খেতে না পেলেও হতে পারে। তুই কি ঊর্মিলার জন্য ভাবছিস? প্রস্তুতির অ্যানিমিয়া হওয়ার ঝোঁক একটু থেকেই, সেজন্য আয়রন টনিক দেওয়া হয়। তুই দেখছি ভয়েই মরলি, দুনিয়াসুদ্ধু লোকের বাচ্চা হচ্ছে, আর তুই—না-না, সেকথা নয়। ধর, ৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত একটি মেয়ের সন্তান হল—' 'হতেই পারে, অনেকেরই হয়েছে, না-হলে শহরের জনসংখ্যায় লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিত পরে', 'শহরে ঠিক ওভাবে,—'মরে নি এই তো, কিন্তু মর্বিডিটি ছিল, আজও আছে মর্বিডিটি। যতগুলো মেয়ে এসেছিল আজ তার আশিভাগেরই লো-প্রেসার, অ্যানিমিয়া, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, প্লাস্টিক ব্লুরিসি, কেজিয়াস টি. বি. এনলার্জড লিভার, সার্কুলেটরি ডিস্টার্বেন্স এক্সেট্রা এক্সেট্রা...প্রত্যেকটিই সরাসরিভাবে অনাহার-অপুষ্টির সঙ্গে যুক্ত, আলো-বাতাসের অভাবের সঙ্গে যুক্ত।'

আট

শহরের সমস্ত পথ দিয়ে, গলগল করে রক্ত ছুটে আসার মতোই ছুটে চলেছিল লাল রঙের বাস। দু-একবার তা ট্রাফিক কনস্টেবলকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল, বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে গেল একজন ট্রাফিক কনস্টেবল। পরক্ষণেই সে যন্ত্রচালিতের মতো উঠে পড়ে, টুকে নিল ডরিউ, বি. টি, চার, সাত, আট, তিন, দুই, পাঁচ, বা এরকমই একটি নম্বর।

কাজের দিন বলে, বা ভিন্ন কোনো ব্যস্ততায়, যেভাবে যানবাহন আর মানুষ মুখে রক্ত তুলে ছুটে চলেছিল, তাতে মনে হতে পারে ক শহরটি বিপুল। বা শহরটি ক্রমশই ফুলে যাচ্ছে, নিজের কঠিন খোলার মধ্যে টেনে নিচ্ছে বিপুল দূরত্ব। দূরত্ব শহরের বলয়ের মধ্যে এনে ফেলল, সে আর শহরবাইর্ভূত থাকে না, বরং সে স্ফীত করে তোলে ক শহরটিকেই। ভয় থেকে, অদ্ভুত সব কল্পনা ডানা মেলে দিচ্ছিল। মানুষের এই উপর্যু-পরি স্রোত বহন করে চলেছে গোপন কোনো দুর্দশার বিবরণ, তারা পালিয়ে যাচ্ছে। এইসব হতভাগ্য মানুষ দূরত্বের কথা জানে না, জানে না শহরটি অতিক্রম করে গেলে চতুর্দিকে আছে শুধু শস্যক্ষেত, জ্বালানি কাঠের বন, মিষ্টি জলের একটি স্রোত আর বন্যপ্রাণী। বহুদিন যাবৎ শহরের রেলপথ ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু মালগাড়ির ওয়াগনের জন্য। ভাগলপুরের গোরু, বিহার-ইউ. পি.'র গম আর মেদিনীপুরের হলুদ ধান বহন করতেই রেলপথ চব্বিশ ঘন্টা বেজায় ব্যস্ত।

এভাবেই একজন পথচারী দৌড়ে যাচ্ছিল, তবে তার দৌড়টা ছিল এমন যে বাসের জানলা থেকে অমলের হঠাৎ মনে হল মানুষটা মরিয়া হয়ে পালাচ্ছে। ঘটনাস্থল শহরের কোনো কুলীন অঞ্চল নয়, শহর যেখানে এখনও থেকে গিয়েছে মাধ্যাতার আমলেই, এ'দো, ঘিনঘিন, নালা-নর্দমার মতো গলি এসে পড়েছে যেখানে কালো-ইঁট-বসানো ট্রাম লাইনের উপর, এ সেই, অতিপুরাতন চিৎপুর। নামটি উচ্চারণ করা মাত্র অসির ঝনঝন, বীরত্বের কুচ্ছিত চিৎকার, প্রেমের দীর্ঘ ন্যাকা সংলাপ আর খোদ শয়তানে আঁচড়ানো সবজে ঠুলিতে একটি চোখঢাকা ক্রুর ভিলেনের মুখ সহসা ভেসে ওঠে।

বাস থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য, ঘটনার গন্ধ পেয়ে দীর্ঘকাল উপবাসী মানুষের মতোই, বিকারের ঘোরে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মানুষটি মরে নি জেনে কেউ-কেউ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, মনে হচ্ছিল বেঁচে থাকার আশ্বাসও সেই সঙ্গে পেয়ে গেল তারা। দু-চারজন আরও নির্দিষ্টভাবে জানতে আগ্রহী—যথা, অপ্রাহ্যনি ঘটল কিনা, কোথাও লেগেছে কিনা। পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হল কারণ অনুসন্ধান, এই অনুসন্ধানের ফলাফল এত বিচিত্র আর বহুমুখী যে তা থেকে কিছুই আন্দাজ করা সম্ভব নয়। যেমন জানা গেল—মানুষটি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল, পরক্ষণেই শুনতে হল অন্য কথা, বাসটিই আচমকা ঘাড়ে এসে পড়ে। আবার শোনা গেল—এসব কিছুই নয়, লোকটা চেষ্টা করছিল একটি প্রাইভেট গাড়ির সামনে এমন পরিকল্পিতভাবে আছাড় খেতে যাতে রক্তপাত ঘটে কিন্তু তেমন স্থায়ী ক্ষতি কিছু না-হয় ; অর্থাৎ সে একটি পথদুর্ঘটনার শিকার হতে চাইছিল। উদ্দেশ্য দুরকম : এক, প্রাইভেট গাড়ির চালককে অসুবিধায় ফেলে কিছু উপার্জন করে নেওয়া, দুই, আত্মহত্যার মামলায় আসামী হয়ে চালান যাওয়া। দ্বিতীয় জিনিসটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে কিছুদিনের জন্য তার খাওয়ার সমস্যা মিটে যায়।

তখন বাস-যাত্রীরা এক যুথবদ্ধ সংলাপে ফেঁসে গেল প্রায়। তারা সময়ের কথা বলল, অভাব আর সমস্যা বিষয়ে কথা বলল, শয়তানের ছাপমারা কিছু ক্রুর মুখ আবিষ্কার করে ফেলল তারা, সমালোচনা করল, অভি-শাপও উঠে আসছিল। পিছনের পাইপ থেকে পাংশু ধোঁয়ার কিছুটা বাসের খোলে যখন ঢুকে পড়ল, ঠিক সেই সময় একজন বলল, 'এ আর কী হয়েছে!' যদিও বক্তার মুখে তেমন উৎকণ্ঠা কিছু নেই, সে যেন এক নির্লিপ্ত দর্শকমাত্র, এ শহরে ক্ষণকালের একজন ট্যুরিস্ট, বাসে সুনিশ্চিত জানে বিপদ যত ভয়ংকর আর বিপুলই হোক না কেন, সে ঠিক বেঁচে যাবে। আবার শুধু যে বেঁচে যাবে তাই নয়, চূড়ান্ত মৃত্যু আর ধ্বংসের সবটুকু সে-ই দেখবে, যেন সে একজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক, বিনাশের এক মহৎ উপন্যাস রচনার জন্যই তার জন্ম হয়েছে।

মাত্র দু-তিনটি স্টপে যাত্রী-বদল হতে-হতে কথা-বার্তার এই যুথবদ্ধতা ঝরে গেল, পঞ্চম স্টপটির পরে আর মনেই হচ্ছিল না যে একজন মানুষের মৃত্যুর মতো

একটি ঘটনা কোনোক্রমে এড়ানো গিয়েছে। ক শহরের পুরনো অঞ্চলটি থেকে থিয়েটার রোড পর্যন্ত আসতে অমলকে আরেকবার বাস বদল করতে হয়েছে। আর নিখুঁতভাবে এই পরিক্রমায় শহরটি শুধু যে নিসর্গের দিক থেকে আমূল বদলে গেল তাই নয়, ভাষাগত ভাবেও এসে পড়ে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন। সাদা চামড়ার মানুষের নামধামের সঙ্গে এখানকার পথ-ঘাটের সম্পর্ক যতটা না এই পরিবর্তনের কারণ, তার থেকে অনেক বেশি জোরালো কারণ হল মূহুর্মুহু রাস্তার নামের বদল। নামবদলের ব্যাপারটি এখন এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে তাতে করে মনে হয় শহরটি রাতারাতি ভুলে যেতে চাইছে সমগ্র অতীত, বেরিয়ে আসতে চাইছে ইতিহাসের শহরের নির্দিষ্টতা থেকে, বেঁচে উঠতে চাইছে স্ব-মহিমায়।

বাস্তবে যদিও মানুষজনের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিরোধী, প্রতিদিন অতীতের বিভিন্ন ঘটনাকে নতুন-নতুনভাবে মূল্যায়নের চেষ্টায় শহরের মহাফেজখানাটি হয়ে পড়েছিল প্রায় একটি অতিব্যস্ত রেস্তোরাঁ, সেখানে ছাত্র অধ্যাপক এবং গবেষকগণসহ বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রের কেরানিরা সমবেত হয়ে, কেবল চিৎকার করছিল : বোর্ড অব ট্রেড কমার্শিয়াল ১৮৭৬, মিসেলেনি ১৭৭৪, সিটি হাউস রেস্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ১৮৯৯, লটারি কমিটি রিপোর্ট, হাইকোর্ট পেপার্স, সিক্রেট পেপার্স অ্যাবাউট সিটি পিপল ১৮৪০, সিটি ফরমেশন, প্ল্যানিং ১৭৩০...

[ক্রমশ

জাহাজী গল্প

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

খেয়ালি অতিথি এবং জাহাজী জীবনের সহকর্মী সান্যালমশাই সকালবেলা চা খেতে-খেতে বললেন, "কালকের কথায় কথায় মনে পড়ে গেল—হরগোবিন্দর ছেলেটা তো এদিকেই থাকে। একবার দেখে যাব।"

আমি গোবিন্দ নামে একটি নাদুসনুদুস, ভালো-মানুষ, নেভির পুরুষ-নার্সকে জানতাম। তার কাছে সান্যালমশায়ের প্রশংসা অনেকবার শুনেছি। তাই খোঁজ করলাম, এখনো যোগাযোগ কী করে রয়েছে। উনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তুমি তাকে চিনতে নাকি?"

"চিনব না কেন?" আমি পালটা প্রশ্ন করলাম। "কালোমানিক গডসন গোবিন্দর পুরো কাহিনীটাই জানি।" সান্যালমশাই আর আমি দুজনেই হাসতে লাগলাম।

কাহিনীটা সংক্ষেপে এই :

ভালোমানুষ ছিল বলে কম বয়সে ওকে যে যা বলত বিশ্বাস করত। তাতেই হল ওর বিপদ। পাড়ার একজন ছেলে যখন খবর এনে দিলে যে ম্যাট্রিকের ফল বেরিয়েছে আর গোবিন্দ ফেল করেছে, তখন সে লজ্জায় দিশেহারা হয়ে গেল। বাবা জানতে পারলে যে পিঠের চামড়া তুলবেন, সেটা সে বুঝল। তার বন্ধু বুদ্ধি দিলে —এটা যুদ্ধের সময়, তুই যুদ্ধে চলে যা। গোবিন্দও পলটনে নাম লেখাতে রিক্রুটিং অফিসে হাজির হল। সেখানে জমাদার সাহেব বলল,. এ সপ্তাহে তো কিছু খালি নেই।

তারপর কান্নাকাটিতে নরম হয়ে কাগজপত্র ঘেঁটে জানাল, নেভিতে টোপাস-এর চাকরি একটা খালি আছে ; কিন্তু তার জন্য আজই যেতে হবে। গোবিন্দ তো তাই-ই চায়—বাড়িতে যাতে আর এখন না ঢুকতে হয়। জমাদারসাহেব ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে ফরমে সই করিয়ে কেমন ঝটপট সব করে দিলে। তারপর মিলিটারি লরিতে হাওড়া ইস্টিশানে পৌঁছে দিলে। সেখানে গোবিন্দ দেখলে, আরো প্রায় ত্রিশজন ওড়িয়া বাঙালি বেহারি সব চলেছে নৌভিতে যোগ দিতে। অন্য-দের সঙ্গে তবু বাক্স তোরঙ্গ কিছু আছে, গোবিন্দ ঝাড়াহাতপা।

বেচারির বেঁটে কালো চেহারার জন্য পথেই সঙ্গের বাঙালি ছেলেরা তার নাম দিয়েছিল 'কালোমানিক'।

গোবিন্দর ঘোর আপত্তি থাকলেও নামটা তার প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল।

বম্বে নিয়ে গিয়ে ওদের তুললে 'কালো ঘোড়া'র কাছে বম্বে ইউনিভারসিটির উলটোদিকে একটা বাড়ির দোতলায়। তার পরদিন থেকে রোজ সকালে উঠেই একসঙ্গে লাইন বেঁধে দৌড়ে ব্যারাকসে যেতে হত। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সব শেষ করে শোবার জন্য দৌড়ে ফিরে আসা। দু'দিনের মধ্যেই ওদের ইউনিফরম দেওয়া হল—আর শুরু হল গোবিন্দর বিপদ। সকাল-বেলা উঠে ইউনিফরম পরে—মাথায় গোল টুপি, তাতে লেখা 'এইচ. এম. আই. এস.'। তার আবার নাকবরাবর ঠিক এম- আর আই-এর ফাঁকটা থাকা চাই। গায়ে চৌকো গলা, নীল-বর্ডার-দেওয়া একটা জামা—ফতুয়া আর শার্টের মাঝামাঝি—নেভিতে যাকে বলে সিংলেট। পরনে হাফ প্যান্ট। হাঁটু পর্যন্ত নীল মোজা আর কালো বুট। তারপর ঐ সাজ পরে বাঁ হাতে এনামেলের থালা আর গেলাস নিয়ে দল বেঁধে দৌড়তে-দৌড়তে ব্যারাকসে গিয়ে খাওয়া। পান থেকে চুন খসলেই লিডিং সাহেবের গালাগাল, থাপ্পড়—হয়তো হাঁফিয়ে গিয়ে একটু দৌড়ানো ছেড়ে হাঁটতে গেছ, কি দৌড়বার সময় কোমরে লাগছে বলে বেল্টটাকে একটু ঢিলে করেছ—অমনি শুরু হয়ে গেল।

গোবিন্দর সবচেয়ে মুশকিল হল—বম্বেতে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল, কী করে স্যালুট করতে হয়, পা ফেলতে হয়, দাঁড় টানতে হয়, লকার সাফ করতে হয়, বিছানা সাজাতে হয়—সব জানল, কিন্তু টোপাসদের কী কাজ—তা কেউ বাতলাল না। ওর দলে আর কোনো ছেলেও দেখলে না যার হাতে ওর মতো 'টি' লেখা। অথচ সকলেই যেন একটু তাচ্ছিল্য করে—যেন গবেট না হলে টোপাস হয় না। হাতায় ঐ 'টি' মার্কা দু-একজনের নজরে পড়েছে, কিন্তু তাদের সকলেরই অন্য হাতায় হয় একটা নয়তো দুটো নোঙ্গর আঁকা—তাদের কাছে গিয়ে জিগেস করবার হিম্মত গোবিন্দ তো দূরের কথা, তখনকার কালে খুব কম 'আর্ডিনারি রেট' অর্থাৎ সদা-ঢোকা 'নাবিকের' ছিল।

দিন কয়েক বাদে রাতের খাবার খেয়ে দৌড়ে-দৌড়ে দল বেঁধে বাসায় ফিরছে, এমন সময় গোবিন্দ দেখলে ওরই মতন হাতে 'টি' লেখা, আর অন্য হাতা পরিষ্কার—একজন সেলর দাঁড়িয়ে আছে। জানবার উৎকণ্ঠায় ঘরে পৌঁছে জামাকাপড় না ছেড়ে, চুপিচুপি নীচে নেমে এসে একফাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখলে, লোকটা ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছে তখনও। কাছে যেতেই মদের গন্ধ পেল। গা ঘোলায় ঐ গন্ধে, তবু মরিয়া হয়ে গিয়ে জিগেস করলে, "নেভিতে টোপাসরা কী করে?" ভাসাভাসা চোখে লোকটা বললে, "তোপাস? তোপাস কিয়া করতা? তোপ চালাতা, ঔর কিয়া? মালুম নেহি?" তারপর হঠাৎ যেন প্রশ্নকারীর সাজের দিকে নজর পড়তে চোঁচিয়ে উঠল, "তুম্ কোন্ হো?" খবরটা শুনে গোবিন্দর মন তখন নেচে উঠেছে—যা-তা কাজ নয় কামান দাগা। এখন চট করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু কিছু ভাববার আগেই, একটা দৈত্যের মতো লোক, মাথায় পাঠান পাগড়ি, সাজ নাবিকের মতো—এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় দিলে। গোবিন্দর মনে হল যেন মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হয়ে গেল। জগৎটা পাক খাচ্ছে আর গাড়িবারান্দার থামগুলো নাচছে—খুব চেষ্টা করে মাটিতে পড়ে যাওয়া থেকে সামলে নিলে। সেই ঘোরের মধ্যেই মনে হল যেন ঐ দৈত্যটা বহুদূরে থেকে বলছে "অন্দর যাও।" কোনোরকমে ঘরে গিয়ে বেল্ট বুট খুলে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল।

সকালবেলা উঠে মনে হল ঘাড়টা নাড়াতে পারছে না। কোনোরকমে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যারাকসে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতেই পেটি অফিসার জিগেস করলে, গালে কী করে আঙুলের ছাপ পড়ল। বেচারি গোবিন্দ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে আগের সন্ধ্যার ঘটনা বললে। পেটি অফিসার খুব গম্ভীরভাবে বললে, "হুঁঃ, এল. পি. এম. খান বোধহয়।" তারপর দলের সকলের উদ্দেশেই বললে, "ওরা হল নেভির পুলিশ—সর্বদা ওদের কাছ থেকে দূরে থাকবে। একমাত্র বেসামরিক লোকদের সঙ্গে মারামারির সময় ওরা তোমাদের পক্ষে, নয়ত সর্বদাই ওরা কাছে এলেই বিপদ।" তারপর গোবিন্দের দিকে চেয়ে বললে, "টোপাস কী, তা তুমি জান না? তোমার ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে। টোপাস হল জাহাজের মেথর। সাহেবদের নেভিতে টোপাস বলে কিছু নেই—ওরা নিজেরাই পালা করে ঐসব কাজ সারে। এটা সম্ভবত আমাদের নেভিতে এসেছে পর্তুগীজ নেভি থেকে। কারণ, কথাটা এসেছে শুনেছি ওদের ভাষা থেকে।"

গোবিন্দর মাথা ঘুরতে লাগল—মেথর! বাকিটা আর শুনতে পেল না—পৃথিবী আবার ঘুরতে আরম্ভ করল।

জ্ঞান হতে গোবিন্দ দেখল, এক সাহেব ডাক্তার হিন্দি ইংরাজি মিশিয়ে বলছে, "ঠিক হ্যায়, ডোন্ট ওয়ারি, হী'ট স্ট্রোক।" বলে গলায় স্টেথোস্কোপ দোলাতে-দোলাতে চলে গেল। তারও পরনে ঐ সাদা হাফ প্যান্ট। তখন ভালো করে তাকিয়ে গোবিন্দ দেখলে, সে একটা লম্বা ঘরের এক কোণে খাটে শুয়ে আছে—পর পর অনেকগুলো খাট দুসারি করে পাতা। সব রুগীতে ভরতি।

গোবিন্দর মনে শান্তি নেই। শেষকালে মেথরগিরি করতে হবে! চোখ বুজে শুয়ে থাকে আর কাঁদে। বাবা নিষ্ঠাবান হিন্দু। জানলে কী বলবেন, কী করবেন তিনি! ইতিমধ্যে যে বাড়িতে জানিয়ে ফেলেছে সে নেভিতে যোগ দিয়ে বম্বে এসেছে। গোড়ায় ঠিক করে-ছিল কারুকে জানাবে না, কিন্তু বম্বেতে প্রথম দিন রাত্রে যখন ঘুম আসছিল না তখন কেবল মায়ের কথা মনে পড়ছিল—মা হয়তো খাওয়া-দাওয়াই ত্যাগ করেছে। তাই মাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য সে তার পর দিন বিনাপয়সার পলটনদের পোস্টকার্ডে লিখেছিল। কিন্তু এখন কী হবে। মা জানতে পারলে হয়তো গলায় দড়িই দেবে। এই বিদেশ-বিভূ'ইয়ে মুরুব্বি কেউ নেই যে উপদেশ দেয় বা পাড়ার দাদারা যাকে বলত 'আইডিয়া'—তাও দেবার কেউ নেই। ভেবে কূলকিনারা পায় না। তখন একমনে ঠাকুর-দেবতাদের স্মরণ করতে-করতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

এর পর যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘরে বাতি জ্বলছে। একজন লম্বা ফরসা লোক, হাতায় রেডক্রশ আঁকা, এসে ওষুধ খাইয়ে গেল। কয়েকটা খাট দূরে ও শুনলে লোকটা আরেকজন রোগীর সঙ্গে বাঙলায় কথা বলছে। কিছুক্ষণ বাদে লোকটা গোবিন্দর খাটের কাছে আসতেই গোবিন্দ তাকে ডেকে সব ব্যাপার বলে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেললে। বললে, "যে করেই হোক, আমায় রক্ষে করুন স্যার।"

সে বললে, "রক্ষে করা কি আমার হাতে? স্যারই বল আর লর্ডই বল। আমি হলুম ডাক্তারের ল্যাংবোট—চাটুজ্যে এস বি এ উয়ান। তবে দেখি বলে চীফ সাহেবকে!"

তার দুদিন পর থেকেই ওকে উঠে বাইরে উঠোনে বসতে দিচ্ছে। সেইখানে দেওয়ালে গাঁথা সূর্যঘড়িটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবে, ভবিষ্যতে কী হবে। এখন ওর মনে কেবলই ভয়—হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলেই তো গিয়ে মেথরের কাজ করতে হবে। কেবল ঝাড়ু-দেওয়া, সাফ-করা নয়। এখানে এসে শুনেছে, জাহাজে সকলে কীরকম বমি করে—সেই গু বমি পেচ্ছাপ—সব সাফ করা। ভাবলেই ওর শরীর এই গরমেও হিম হয়ে যায়। উদ্ধার কোথায়?

ইতিমধ্যে রোজ এক বুড়ো পাদরি আসে—সে প্রত্যেকটা রুগীর সঙ্গে কথা বলে। যারা বসতে পারে না বা হাতে চোট লেগেছে—তাদের হয়ে চিঠি লিখে দেয়। কাউকে কাউকে পড়তে ধর্মগ্রন্থ দিয়ে যায়। তার সঙ্গে গোবিন্দর ভাব হয়ে গেছে। পাদরি বলেছে, মার্টিন ডাক্তারকে বলে ওকে কয়েকদিন বেশি এখানে রাখবে, যদি তাতে ওর সুবিধা হয়। পাদরি ওকে বোঝায় যে, বরাবর তো তুমি এ কাজ এড়িয়ে যেতে পারবে না। তা ছাড়া, যদি একদিনও ও কাজ করতে বাধা হও তো তোমায় জাতে ঠেলবে, ঘরে ঠাঁই হবে না। তুমি খ্রীষ্টান হলে প্রভুর ঘরে সকলের ঠাঁই—অবশ্য যদি যীশুতে বিশ্বাস কর। তাহলে এবিষয়ে তোমাকে এখানে রেখে আরো কয়েকদিন তোমায় বোঝাব, উপদেশ দেব। গোড়ায় স্বীকার না হলেও, দিন দশেকের মাথায় যেদিন শুনল ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সেদিন মরিয়া হয়ে ঢোঁক গিলে পাদরিকে ধরল—উপদেশ দাও। আরো কয়েকদিন বাদে দোলগোবিন্দ খ্রীষ্টান হয়ে নাম নিলে ডেনিয়েল গডসন। পাদরি এসে এই নামবদলের দরখাস্তে সই করিয়ে আফিসে দিতে নিয়ে গেল।

পরদিন সিকবার্থ চীফ পেটি অফিসার লাল গোবিন্দকে ডেকে পাঠালেন—লম্বা রোগা তেলচুকচুকে চেহারা। সিগারেটটা রেখে জিগেস করলেন, "গড ব্লেস ইউ, চাইল্ড। তোমারই কি আগে নাম ছিল দোল-গোবিন্দ?" "হ্যাঁ।" বলাতে একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দিন দুই হল এসেছে। বুঝতে পার-ছিলাম না কার। ফাদারের দেওয়া ফরমটা দেখে আন্দাজ করলাম হতে পারে তোমার। কলকাতা থেকে পাঠানো

টেলিগ্রাম—গোবিন্দর হাত ভয়ে কাঁপছে, দুঃখে মা মরেই গেল নাকি! একটা অঘটন না ঘটলে তো কেউ তার করে না। খুলে জানলে, সে সেকেন্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে আর বাড়ি ফেরবার জন্য টাকা চাইলে বাবা পাঠাবেন।

আবার যেন জগৎটা ওর উলটে গেল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল—টেলিগ্রামটা হাত থেকে উড়ে গেল। চীফ লাল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে বললে, "আরে! তু ম্যাট্রিক পাশ কিয়া আউর টোপাসমে নাম লিখায়া! এস বি এ চ্যাটার্জি তো তব সচ বাতায়া থা।"

কয়েক ঘন্টার ভিতর সারা ব্যারাকে খবরটা রটে গেল—একজন টোপাস ইউ. টি. (আন্ডার ট্রেনিং বা শিক্ষানবীস) ম্যাট্রিক পাস করেছে।

সেদিন রাত্রে চাটুজ্যে গোবিন্দকে পরামর্শ দিলে, ম্যাট্রিক পাস করার টেলিগ্রাম দেখিয়ে টোপাস থেকে অন্য বিভাগে বদলির জন্য দরখাস্ত করতে। তখনকার দিনে ম্যাট্রিক-পাস-করা সেলর তো খুব বেশি ছিল না, তাই হয়ে যাবে নিশ্চয়ই—কিন্তু কোন্ বিভাগে চাইবে। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলে—জাহাজের নারস বা সিকবারথ অ্যাসিসটান্ট—আজকাল যাদের বলা হয় মেডিকেল অ্যাসিসটান্ট—তাই হবে।

পরদিন সকাল থেকেই গোবিন্দকে নিয়ে হৈ চৈ। এ তো আর সওদাগরি অফিসের কেরানির দরখাস্ত করা নয়। এ রীতিমত নেভির 'অনুরোধ'—তায়, যে অনুরোধ করছে সে আনকোরা নতুন—কায়দা-কানুন কিছু জানে না।

সকালবেলা চাটুজ্যে 'রিকোয়েস্ট ফরম' এনে ভরতি করে সঙ্গে করে চীফ লালের অফিসে নিয়ে গেল। তার সামনে গোবিন্দ সই করল। চীফ সাহেবও সেটার এক জায়গায় সই করে বললেন, আজই 'রিকুয়েস্টমেন' হবে। বলে কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সেটা কী ব্যাপার তা না বুঝলেও জব্বর কিছু একটা, তা গোবিন্দ আন্দাজ করতে পারলে। চাটুজ্যে দাঁড়িয়ে ওকে দিয়ে বুট পালিশ করিয়ে পাটভাঙা ইউনিফরম পরিয়ে কখন কী করতে হবে কয়েকবার বুঝিয়ে মহড়াও করিয়ে নিলে। আরো কয়েকজন ঐখানেই যাচ্ছিল। চাটুজ্যে বলে দিলে, তাদের দিকে নজর রেখে শিখে নিতে কী করতে হয়।

এবার বারান্দায় দাঁড় করিয়ে চীফ লাল প্রত্যেকের সাজ খুঁটিয়ে দেখলেন—এক জুতোর ফিতের দুটো অংশ ঠিক সমান হয় নি। ওর সিংলেটের পিছনে একটা সুতো বেরিয়ে আছে, আরেকজনের টুপির একটা দিক একটু বাঁকা। সেসব ঠিক করে চীফ সাহেব ডাক্তার মার্টিনকে ডাকলেন—তিনিও একবার চোখ বোলালেন। আজ মার্টিন সাহেব সাদা গলাবন্ধ কোট, লম্বা পাতলুন পরেছেন। দেখে বললেন, 'ক্যারি অন'। অমনি সকলে সেলাম করে ঘুরে চলতে আরম্ভ করল। মার্টিন সাহেব বললেন, গোবিন্দর ঘোরাটা ঠিক হয় নি। তাই ওকে আলাদা করে চীফ সাহেব 'ক্যারি অন' কী তালে "পিছে মুড়, দৌড়কে চল" করতে হবে সেটা কয়েকবার অভ্যাস করালেন।

তারপর চীফ লাল এই কজনকে লাইন বানিয়ে নিয়ে চললেন উঠোন পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তোপখানার পাশ দিয়ে বড় শানবাঁধানো উঠোনে—যেটাকে সকলে বলে কোয়ার্টার ডেক। সেখানে ঐরকমই আরো কয়েকটা দল নাবিক এসেছে। খাতা পেনসিল হাতে একজন পেটি অফিসার তাদের সকলকে চাকরির কতদিনের, সেই অনুসারে সাজিয়ে দাঁড় করাচ্ছে। লোকটাকে দেখে গোবিন্দর মনে হল যেন একটা ষাঁড়—কালো মাংসপেশীগুলো সাদা জামার তলায় ফুলে উঠছে—তারপর মনে হল কতকটা বিলাতি কুকুরের মতো লোকগুলোকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে ঠেলে-টেনে, পায়ে ঠোক্কর দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঠিক এক লাইনে সোজা করে দাঁড় করালে। এক প্রান্তে বুকসমান উঁচু এক টেবিলের ধারে এক সাহেব এল। সে নাকি এখানকার দুনম্বর কর্তা, ক্যাপটেনের পরেই। ঐ ষাঁড়ের মতো পেটি অফিসার এক-এক জনের নাম ডাকে, আর সে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে। পেটি অফিসার খাতা দেখে তার অনুরোধ পড়ে শোনায়, সাহেব কিছু বলেন, পেটি অফিসার আবার কী বলে যেন সেলাম করে, নাবিক দৌড়ে তার জায়গায় ফিরে আসে। এইভাবে চলে। গোবিন্দ নবতম হিসাবে লাইনের একদম শেষে। ওর পালা আসতে ও ঐরকমভাবে চলতে বলতে চেষ্টা করল। চীফ লাল টেলিগ্রামটা দেখাল। সাহেব বললে ক্যাপটেনের কাছে পেশ হবে। পেটি অফিসারও চেঁচাল, "ক্যাপটেনস, রিকুয়েস্ট, স্যালুট।" গোবিন্দ কোনোরকমে সেলাম করে স্বস্থানে ফিরে এল। সব শেষ হলে বলা হল, "তোমরা কেউ যেও না। আধঘন্টা বাদে ক্যাপটেনের কাছে পেশ হবে।" বুট পরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে গোবিন্দর যেন পা ব্যথা করছে, মনে সন্দেহ জাগছে হয়তো ডাক্তারি লাইন চেয়ে ভুল করলাম।

কিছুক্ষণ বাদে ক্যাপটেন এলেন—টুপির উপর জরির কাজ, দাড়িটা পঞ্চম জর্জের কায়দায় ছাঁটা। সেই এক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি, তবে এবার কিছু লোক কম। গোবিন্দ তখন ভাবছে ওর পাড়ার কি কেউ বিশ্বাস করবে যে সেই গোবিন্দ এইমাত্র একজন গোরা সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছে, আরেকজনের সঙ্গে এক্ষুনি বলবে। নাম ডাকতে হঠাৎ ওর যেন চমক ভাঙল। দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল। চীফ লাল স্যালুট করে টেলিগ্রাম দেখিয়ে ব্যাপারটা বললে। সাহেব চীফকে বললেন, "এত হাবাগোবা লোক মেডিকেল লাইনে সুবিধে করতে পারবে? আচ্ছা দ্যাখো।" তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পেটি অফিসারকে বললেন, "পেটি অফিসার স্যামুয়েল, ছেলেটা আনকোরা নতুন, ওকে ভুলের জন্য শাস্তি দিও না।" পেটি অফিসার কী একটা চেঁচাল, গোবিন্দ স্বস্থানে ফিরে এল। সাহেব চলে গেল। ওরা সকলে দল ভেঙে যার যার জায়গায় ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলে পেটি অফিসার স্যামুয়েল সামনে। সে গোবিন্দকে ঘাড় ধরে মাটি থেকে তুলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, "হতভাগা, শুয়োর, গর্ভস্রাব! নেহাত ক্যাপটেন শাস্তি দিতে না করেছে তাই বেঁচে গেলে, নয়তো বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম। নেভিতে ঢোকার এক মিনিটের ভেতর এসব শেখে আর তোর হপ্তা ঘুরে গেল। জানিস, যোগ দেবার চব্বিশ ঘন্টা বাদে এরকম অসভ্যতা করলে সেকালে থলে ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিত। দূর হ।" বলে মাটিতে নামিয়ে দিল। গোবিন্দর মনে হল যেন গোরিলার হাত থেকে ছাড়ান পেল। অপরাধটা কী তা জিগেস করবার সাহস হয় নি—অন্যেরা বললে, ক্যাপটেনের প্রশ্নের উত্তরে 'ইয়েস স্যার'-এর 'স্যার' বলতে ভুলে গিয়ে শুধু 'ইয়েস' বলেছিল।

আমি সান্যালমশাইকে বললাম, "আমি যখন গোবিন্দকে দেখি তখন সে বেশ ভুঁড়িবাগানো লিডিং। যে জাহাজেই কাজ করত, রান্নাঘরের উপর ওর ছিল কড়া নজর। ভালোমন্দ খাইয়ে ওকে খুশি না রাখলে সে রান্নাঘরের নোংরামির এমন কড়া রিপোর্ট দিত যে রাঁধুনিরা অস্থির। এক রাঁধুনি উত্ত্যক্ত হয়ে বলেছিল, "রান্নাঘর কি সাজিয়ে রাখবার জন্য? যেদিন ডাক্তারের অপারেশনে রক্ত বের হবে না, সেদিন জাহাজের রান্নাঘর চব্বিশ ঘন্টা সাফ থাকবে।"

সান্যালমশাই বললেন, "আমি কিন্তু হরগোবিন্দের কথা বলছিলাম। তাকে তুমি দ্যাখো নি। তুমি চাকরিতে ঢোকবার আগেই মরে গিয়েছে। বেচারির জীবনটা বেওয়াফা গেল। কতকটা কলেজে পড়তাম যে গ্রীক ট্র্যাজেডি, তার মতো। বেশি জোর করতে হল না, সান্যালমশাই বলে গেলেন।

তখন কালা-আদমি তো অফিসার হতে পারত না। নয়তো ওর মধ্যে অফিসার হবার মতো মাল ছিল—সুদর্শন, বলিয়ে-কইয়ে—ভাষার উপর দখল ভালোই ছিল—ইংরাজি কবিতা, উর্দু শায়ের ভালোই বলত। তোমরা যাকে বল রোম্যান্টিক হীরো—সেই রকম লোক। তবে দোষ ছিল—বড়ো মদ খেত। মেয়েঘটিত ব্যাপারও ছিল। বিয়ে ছিল দুটো, সেই ব্যাপারেই বড়ো অশান্তি হল—তা অবশ্য পরে জেনেছিলাম। মিউটিনির ঠিক আগে—আমরা তখন কিছু জানতাম না, তবে ওরা হয়তো দলের হার্ডকোর হিসাবে জানত—একটা মোটা বড়ো খাম আমায় ধরিয়ে দিয়ে বললে, "রাখুন, পরে নেবখন।" তার কদিন বাদেই অসমসাহসিকভাবে মরল। ঐ ব্যারাকসের র‍্যামপার্টে। নিশ্চিত মৃত্যুকে কেমন অনায়াসে ডেকে নিল। খামে দেখলাম কতগুলো চিঠি। পড়ে তখনই ওর জীবনের গোলমালগুলো জানতে পারলাম। আমি ঐ চিঠিগুলো সব ওর বৌকে পরে ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। সে বললে, লোকটাই যখন মরে গেল, তখন চিঠি নিয়ে কী করব? সেই থেকে আমার কাছেই রয়েছে গোঁজা কোথাও একটা। তোমায় বরং দিয়ে দেব—লেখার খোরাক পাবে।

তারপর 'আসি মা লক্ষ্মী' বলে আমার গৃহিণীর দিকে হাত নেড়ে, কাঁধে ঝোলাটা ঝুলিয়ে পিঠে পোঁটলাটা চড়িয়ে গটগট করে মোগলসরাই প্যাসেনজার ধরতে ইস্টিশানের দিকে রওনা হলেন।

অবসরপাওয়া জীবনের খুঁড়িয়ে-চলা দিনগুলোয় সান্যালমশাই হঠাৎ একটা নাড়া দিয়ে গেলেন। যে জীবনটার সঙ্গে সম্পর্ক ভেবেছিলাম চুকে গেছে, সেটার দিকে বহুদূর থেকে যেন নতুন চোখে ফিরে তাকাতে

লাগলাম। রোমন্থন বা স্মৃতিচারণ ঠিক নয়—স্থান এবং কাল—দুইয়ের দূরত্ব থেকে যেন নতুন রূপ নিয়ে, নতুন প্রশ্ন নিয়ে সেই দিনগুলো হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইল।

ঐ হরগোবিন্দর মৃত্যুর কথাটা মাথায় ঘুরছিল। আগেকার দিনের আদর্শ যোদ্ধা ছিল বীর—যার সাহস সহনশীলতা আর বাহুবলের সঙ্গে থাকত দয়া আর মানবতা। আজকালের যুদ্ধ অনেকটাই অমানুষিক বা বি-মানবিক। তাই কলিনস্কির কথা মনে এল। লোকটা কট্টর কমিউনিস্ট—গত মহাযুদ্ধের সময় উত্তরমেরুর কাছ বরাবর রুশ সাবমেরিন নিয়ে জার্মানদের আক্রমণ করত। একবার কথায় কথায় তাকে বলেছিলাম, বীরের মতো মরার চেয়ে কাম্য আমাদের শান্তে কিছু নেই। কথাটা শুনে সে হেসে বলেছিল, "ওটা তোমাদের ভাববিলাস।"

আলোচনাটা হচ্ছিল জাহাজের সিকবেতে বসে। ওটা হল জাহাজের হাসপাতাল। উৎকৃষ্ট নার্সিং হোমের মতো চকচকে তকতকে, যুদ্ধের জাহাজের প্রায় সবটাই—কিন্তু সেরা হল ক্যাপটেনের ঘর আর সিকবে। এই দুটো জায়গায় কুটোটি পড়তে পায় না। ক্যাপটেনের ক্যাবিন বা ঘর পরিষ্কার রাখা তবু সোজা—কারণ সেটা একটা লোকের দখলে।

সিকবেতে লোকজনের যাওয়া আসা, তবু মেডিকেল বিভাগের নাবিকদের (নেভির ভাষায় তখন তাদের বলা হত সিকবার্থ অ্যাসিসটান্ট বা সংক্ষেপে এস বি এ) চেষ্টায় একটু রক্তের দাগ কি নোংরা পট্টির টুকরো—কিছুই পড়ে থাকে না।

যেখানটায় বসে কথা বলছিলাম সেটা হল ডি এম ও অর্থাৎ ডিউটি মেডিকেল অফিসারের কাজ করবার জায়গা। ঘরটার বেশির-ভাগ জুড়ে তিনজোড়া ঘাট—একটা নীচে একটা উপরে করে ছটা। প্রত্যেকটা খাটেরই পাশের রেলিঙ ওঠানো যায়, যাতে রোগী পড়ে না যায়। খাটগুলোর প্রত্যেকটার মাথার কাছে একটা করে মিটমিটে পড়বার আলো আর রেডিও কানে লাগিয়ে শোনবার হেডফোনের প্লাগ—সঙ্গেই একটা আঙটায় হেডফোনটা টাঙানো—ইচ্ছে হলে অন্যদের অসুবিধা না করে রেডিও শোনা যায়।

একপাশের এই লোহার টেবিলটা জমির সঙ্গে আঁটা আর ঠিক টেবিলটুকুর উপর আলো পড়বে এমনভাবে দেয়ালে আটকানো গলা-বাড়ানো বকের মতো লম্বগ্রীব একটা আলো। টেবিলের পাশের লোকেরও মুখটা থাকে আধা-অন্ধকারে। তাই কেবল নজরে পড়ছিল টেবিলের উপর রাখা কলিনস্কির ফরসা হাতের নীল শিরাগুলো। তার কথার জবাব দিলাম না দেখে সে বলে চলে :

"তোমার দেশের লোকেরা আধপেটা খেয়ে, বহু স্বার্থত্যাগ করে এই যে সব দামি দামি যুদ্ধাস্ত্র তোমাদের হাতে দিচ্ছে, সেটা কি কেবল তোমরা বীরের মতো মরবে সেই আশায়, না বহুকষ্টার্জিত তোমাদের যে স্বাধীনতা—তাকে ভালোভাবে রক্ষা করবার জন্য?"

কথাটায় এইখানেই ছেদ পড়ল, কারণ জাহাজটা বেশ জোরে মোড় ঘুরতেই একটা দিক কাত হয়ে গেল। চেয়ার-সুদ্ধ যাতে গড়িয়ে না যায় সেইজন্য কলিনস্কি টেবিলটা চেপে ধরল—হাতের শিরাগুলো তার ফুলে উঠল মনে হল। আমি টেবিলের পায়াটায় পা বাড়িয়ে ঠেকা দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করলাম। জাহাজটা তখন আনকোরা—তৈরির পর পরীক্ষানিরীক্ষার পালা চলছে। রোজ ভোরে সমুদ্রে বের হয়ে কলকব্জা চালিয়ে দেখা হয়—সন্ধেবেলা বন্দরে ফিরে আসে। এই মোড় ঘোরা ফেরার প্রস্তুতি। কলিনস্ককে বললাম, চলো, উপরে যাই।

জাহাজের ভিতরটা আরামে থাকবার মতো গরম। দরজা খুলে জাহাজের খোলা ডেকে বেরুলেই ঠাণ্ডা হাওয়ার যেন একটা দেয়াল ধাক্কা দিয়ে থমকিয়ে দেয়। রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশে মেঘগুলো লম্বা-লম্বা ঢেউখেলানো—যেন কোনো দেবীর এলোচুল উড়ছে। ডাঙার দিক থেকে ধোঁয়ার একটা পাতলা ওড়নার মতো পড়ে আছে আর তার উপর দিয়ে পাহাড়ের চূড়োগুলো পড়ন্ত রোদে তখনো ঝলমল করছে। জলের দিকে লাল গোলার মতো সূর্য নামতে-নামতে দিকচক্রবালে ঠেকতেই কেমন যেন থেবড়ে গেল। এর পরেই এল একটা অবিস্মরণীয় মুহূর্ত—জাহাজের দুপাশের জল হয়ে গেল ছাইরঙের। তার মধ্যে ছোটো ছোটো ঢেউগুলো ভাঙবার ঠিক আগের মুহূর্তে মাথায় যেন একঝাঁক চুনি ঝকমক করে উঠল। তারপর পশ্চিম-দিকের জলে কে আবীর গুলে দিল, আকাশটাও লাল হয়ে উঠল, মেঘগুলোয় যেন আগুন লেগে গেল। তারপর মেঘের লাল রঙ আস্তে আস্তে পাকা সোনায় পরিণত হল। তারপর কে যেন পূর্বদিক থেকে নীলচে বেগুনি রঙের একটা চাদর আকাশের লাল আভার উপর টেনে দিল—তার পিছে-পিছে ছায়ান্ধকারের ঘোমটা। সেই সঙ্গেই ডাঙার দিকের কুয়াশার মধ্যে একটা দুটো করে আলো দেখা দিল। যত বন্দরের কাছে এগুচ্ছি বন্দরের আলোগুলো তত পরিষ্কার হতে থাকল।

বন্দরে ঢোকবার সময় যুদ্ধজাহাজের বাইরে অদরকারে দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ। এতক্ষণ দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এবার ভিতরে ঢুকে লোহার দরজার ক্লিপ এঁটে ওয়ার্ডরুমে নেমে এলাম।

[ক্রমশ

তিহারুলালের ঘর-গৃহস্থি

কানাই কুণ্ডু

প্রায় দু-হাত-উঁচু মাটির দেওয়াল। ওপরটা প্রায় গম্বুজাকৃতি। জংলি লতাপাতার ছাউনি। নিচু হয়ে ঢুকে ভেতরে দাঁড়ানো যায় টান-টান। গবাক্ষ বলতে ওই ঢোকার দরজা। দরজায় শালকাঠের পুরু ওজনদার পাল্লা। আসবাব বলতে জংলি লতায় বাঁধা দুটো খাটিয়া, এক কোণে পাতা। তার ওপর খেজুরপাতার চাটাই। অন্যদিকে দুটো হাঁড়ি, লাল মাটির রঙ। একটায় জল। অন্যটা প্রতিদিনের রান্নার কালিতে আচ্ছন্ন। মাটির দুটো ডেকচির অবস্থাও প্রায় তাই, তবে তৈলাক্ত। ওতেই ভাজাভুজি, সেদ্ধ, চচ্চড়ি—সব। একটা টিনের কৌটো, মুখটা গোল করে কাটা। অন্যদিকে এক কোনা থেকে অন্য কোনায় ঝোলানো পাড়। তাতে কয়েকটা রঙিন কাপড়, বিবর্ণ। সঠিক রঙ বোঝা যায় না। একটা তালপাতার পেটি। তার মধ্যে জংলি ফারে কাচা কিছু কাপড়-চোপড়, তিনটে দশ টাকার নোট, একটা প্লাস্টিকের চিরুনি, রঙিন কাঁচের চুড়ি এবং সাঁসা-দস্তা-রুপো-মেশানো ধাতুর বাজু, কানের ফুল ; যা ছত্তিশগড়ে ডালডার গহনা নামে প্রচলিত।

পাশাপাশি দুই গ্রাম—বরন্দালি আর শিলতোড়া। মাঝখানে ছোটো জঙ্গল, ফুলঝোরিয়া। ফুলঝোরিয়ায় ফুল নেই। শাল-সেগুন-গরানের ঘন ছায়া। পাতার ফাঁকে দুপুরের রোদ ঝিকমিক করে। পাখি গান গায়। খরগোশ, কাঠবেড়ালি লাফিয়ে বেড়ায়। দূরের অরণ্য থেকে পথভোলা হরিণের পাল থমকে দাঁড়ায়। ফুলঝোরিয়ার শালসেগুনের ফাঁক দিয়ে ওপার এপার ঘরবাড়ি দেখা যায়। এ গাঁয়ের বউড়ির মন আনচান করে। হাতের কাজ ভুলে বাপের ঘরের স্মৃতিচারণ করে।

তিহারুর গেরস্থালি বরন্দালি গ্রামে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে মসৃণ দাড়ি গোঁফ। স্বাস্থ্যবান যুবাপুরুষ। শরীরে বন্য পশুর তাগদ। মাঝে-মাঝে মাথার চুল সামলাতে কপালের ওপর লাল পাড়ের চওড়া ফেট্টি বাঁধে। সে এই গ্রামের ভৈঁসাচরাইয়া। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, তিহারুলাল। বরন্দালি গাঁওকে রহনেওয়ালা। দাদাকে (বাবার) নাম মোতিলাল। সে ফুলঝোরিয়ায়, দূরের পাহাড়তলিতে, জঙ্গলের মধ্যে বেড়ে-ওঠা ঘাসের বনে গোরু-ভৈঁসা চরায়। টিনের কৌটোয় বানানো ঘন্টি গোরু-ভৈঁসার গলায় বাঁধা থাকে। চলার ছন্দে, মাথানাড়ায় ঘন্টি বাজে টুং টাং। তিহারু কোনো গাছের ছায়ায় অথবা পাহাড়ের খাঁজে বসে থাকে। মাঝে মাঝে দূরগামী গোরু-ভৈঁসার উদ্দেশে চিৎকার করে, হো লালী...ই...ই, হো কালুয়া...আ...আ, ঠাহর যা। গোরু-ভৈঁসারা কখনো কথা শোনে, কখনো বা তিহারু ডান্ডা নিয়ে তেড়ে যায়। বেয়াড়া ভৈঁসাকে পিটিয়ে দলের মাঝে পাঠায়। বেলা বাড়ে। তিহারুর মনে নানা কথা ভিড় করে। হারিয়ে-যাওয়া ছেলেবেলা, বাপের উদ্দাম স্নেহ, অনেক দিনের পুরনো খেই-হারানো কথা। মুণ্ডলির কথা মনে পড়ে।

শিলতোড়া গ্রামের মুণ্ডালির ওপর তখন ছ বরষ। বরন্দালি থেকে বরাত এল। তিহারুলাল বর। তিহারুর বাপের মহা উৎসাহ। দু বোরা চাওল মুণ্ডালির বাপের ঘরে ফেলে সশব্দে হেসে উঠল, হামার একেচ টুরা হে, তিহারু। দিনভর খানাপিনা হোহি। তিহারুর ওমর তখন দশ। সব কথা তার ভালো মনে নেই। তবে খুব হৈ-হল্লা হয়েছিল। তার বাপ মহুয়া খেয়ে, মুণ্ডালিকে কোলে তুলে নেচেছিল। মুণ্ডালির তখন কী কান্না! থামানো যায় না। এগারো বছর পরে গাউনা হল। মুণ্ডালিকে তখন চেনাই যায় না। শাদির দিনেও তিহারু দেখেছে, মুণ্ডালির নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। এখন কদুর মতো গোরা-গোরা মুখ। ফুলে-ওঠা গাল। চোখ দুটো শুখা নালার গহের পানি। প্যাঁচানো শাড়িতে ঢাকা শরীরটায় পাহাড়ি ঢাল। মুগ্ধ বিস্ময়ে তিহারু মুণ্ডালিকে দেখছিল। তার যেন আর দেরি সইছিল না। সেদিন থেকেই তারা একত্রে বসবাস করবে, সারাটা জীবন। তিহারুর বুকের ভেতরে আনন্দের উথাল-পাথাল ঢেউ।

তিহারুলালের মা ছিল না। বাপ খেতমজুর। গাঁয়ের জোতদার পেয়ারীলালের জমিতে পেটভাতায় কাজ করে। ফসল উঠলে একবোরা ধান পায়। অভাবের সংসার। ঘর বলতে পাতায় ছাওয়া ছোটো ঝোপড়ি। সন্ধ্যা হতেই বাপ বলল, তুমন এতি নিদ যাহ। হাম মালিককে ঘরমে যাওথ'। অবসে হম ওতি রহে যাহ'।

রাত্রে কুপির আলোয় তিহারু মুণ্ডালিকে যেন আবিষ্কার করে। কখনো মনে হয়, থমকে-থাকা ঢেউ-খেলানো নদী। কখনো বা নীল আশমানের চাঁদনি। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে মুণ্ডালির শরীর দেখছিল। মুণ্ডালি লজ্জা পায়। বলে, বাত্তি বুতা দিহ। শরম লাগথে মোলা। তিহারু কুপিটা আরও কাছে আনে। মুণ্ডালির শরম দেখে। চোখের কোণে তৃপ্তির উজ্জ্বল আভাস দেখে। মুণ্ডালি ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দেয়। তখন ঝোপড়ি, আসবাব, দূরের অরণ্যে পাখির ডাক, পাহাড়ি ঝরনার শব্দ অদৃশ্য হয়ে যায়। কেবল মুণ্ডালি আর তিহারু। এক অনাস্বাদিত আনন্দে তারা আবিষ্ট রাত ভোর করে দেয়।

কত রাত্রি এই নিবিড় আচ্ছন্নতায় কেটে গেল। মাঝে-মাঝে বাপ এসে তিহারুকে তাড়া দিত, অব ডওকা (যুবক) বনে হস। ডওকী ভি ঘরমে আয়ি হে। কাজ কাম কর! একবোরা ধানসে ভুখ না মিটহি। কাপড়া লাত্তা চাহি। কাল হামার সঙ্গ চলিহ। মালিককে জমিনমে কাম লাগা দিহ'। ভাত মিলহি, একবোরা ধান ভি মিলহি। মড়কন ধান বেচকর কাপড়া, চুড়ি খরিদ লিহ।

তিহারু পালিয়ে বেড়াত। পাঁকের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিনরাত জমিনের কাম তার ভালো লাগত না। মালিকের ব্যবহারও তার একদম পসন্দ হয় না। দুনিয়ার সব মানুষকে নোকর মনে করে। ওর কাছে কাম করবে না তিহারু। বাপ গুস্সা করে। একদিন তো মুণ্ডালির সামনেই তাকে এক ঝাপড়া মেরেছিল। তিহারুর অভিমান হল। দিনভর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে মুণ্ডালির জন্য তার কষ্ট হল। আহা, বেচারি সবে নতুন শশুরালে এসেছে। যদি রাতে ডর লাগে, কেঁদে ওঠে! তাড়াতাড়ি ঝোপড়িতে ফিরে এল। দেখে বাপ বাইরে বসে আছে। বাপের জন্যও দিললৌয় দুখ লাগে। বাপের পায়ের কাছে বসে পড়ে। বাপ সস্নেহে তিহারুর মাথায় হাত বুলায়। বলে, কাম নেহি করনেসে, ই দুনিয়ামে মাগনি ভাত কোন দিহি টুরা! মুণ্ডালিকো ভি দুখ পঁহুছি। তু কাম কর। মুণ্ডালি ভি ধান উথাড়নে কা কাম করহি। তো তোহর দিন গুজর যাহি। হম তো অব যানে কা ওয়াস্তা মে হে। বুঢ়াপা আ গিয়ে। নজর ছোটা হো গিসে। হামার আশ ছোড় দিহ টুরা।

তিহারু কেঁদে ফেলে। কথা বলতে পারে না। বাপ তিহারুর দুঃখ বুঝতে পারে। একটা চুটি জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছড়ায়। উঠে বলে, ঝিন (না) শোঁচিহ টুরা। সব

ঠিক হো যাহি। যাও আব তুমন খানা খাকে নিদ যাহ। হাম যাওথ'।

অন্ধকারে অপস্রিয়মাণ বাপের শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা করে, কাল সকালেই মালিকের নোকরি নিয়ে নেবে। এই তার তকদির। তাদের মতো সব মানুষ গোলামির জন্যই জন্মায়। আশপাশের সবকটা ঝোপড়ির মানুষ তাই করে। সে একা এই নিয়ম ভেঙে দাঁড়াবার হিম্মত কোথায় পাবে। নিজেকে বাঁচতে হবে, মুঙ্গলিকে বাঁচাতে হবে। না, কাল বিহানেই সে কাম শুরু করবে।

পরের দিন সকালেই তিহারুর ব্যবস্থা হয়ে গেল। গাঁয়ের গোরু-ভৈঁসা চরানোর কাজ পেয়ে গেল। দিনভর ভৈঁসা চরায়। আপন মনে গানা গায়। নানা কথা ভাবে। পাখির ডাক শোনে। সুযোগ-সুবিধা পেলে বনমুরগির ডিম সংগ্রহ করে, খরগোস মারে, আমলি বিহি পাড়ে। সন্ধ্যায় গোরু-ভৈঁসা নিয়ে ফেরে। হপ্তা-শেষে গোরু-ভৈঁসা-পিছু একমুঠো চাল দেয়। এভাবেই গ্রামের অন্যান্য গোরু চরানোর কাজ জোটে। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে গোরু-ভৈঁসা রক্ষার প্রয়োজনে একজন চরোইয়া দরকার হয়ে পড়ে। মুঙ্গলিও কাজ খুঁজে নিয়েছে। রতনবাই অবস্থাপন্ন ঘরের গিন্নি। ধান ঝাড়াই-বাছাই, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজ। মুঙ্গলি বহাল হয়ে যায়। পারিশ্রমিক হিসেবে সেও কিছু ধান, গম, ডাল উপার্জন করে। উদ্বৃত্ত সংগ্রহ বিক্রি করে তেল, নিমক, চুড়ি, কাপড় কেনে। দিন ক্রমশ সুখের হয়।

নানা কথা ভাবতে-ভাবতে বেলা গড়িয়ে যায়। শিউয়া পাহাড়ের আড়ালে সূর্যটা ঢাকা পড়ে। জঙ্গলের ভেতরে অন্ধকার ঘন হয়। তিহারুর মন আনচান করে। ভৈঁসার পাল জমা দিতে-দিতে বাড়ি ফেরে। তখন সন্ধ্যা। গ্রামের মানুষ ঘরে ঘরে আশ্রয় নেয়। গ্রামের চৌতারায় শুকনো কাঠের আগুন জ্বলে। সারা রাত এই আগুন জ্বলতে থাকে। বন্য পশুর আক্রমণ থেকে গ্রামরক্ষার কারণে এই আগুন জ্বালা হয়। পালা করে কাঠ জমা দিতে হয়, আগুন জ্বালাতে হয়। অবস্থাপন্ন মানুষেরা এখনও জেগে। তাদের খামারে পেটভাতার মজুর দিনের এই সামান্য অবসরে বসে দুখসুখের গল্প করে। তিহারু আজ সেখানে দাঁড়ায় না। আজ তার একটু দেরি হয়ে গেছে। হনহন করে নিজের ঝোপড়ির দিকে হাঁটে। বাপ বেঁচে থাকতে তার চিন্তা ছিল না। দেরি দেখলে বাপ ঝোপড়ির বাইরে বসে চুটি টানত। খকখক কাশত। কিছুদিন হল বাপটা চলে গেল। মরার আগে বড়ো কষ্ট পেয়েছিল। পেটের বিমারি ছিল। সারাক্ষণ কাটা বোখরার মতো যন্ত্রণায় ছটফট করত। তিহারু কাছে গেলেই শান্ত হয়ে যেত। বলত, হাম ঠিক হে টুরা। তু দিল লাগাকে কাম করিহ। হামার যিকর ঝিন করিহ।

তিহারুর আঁসু আসত। দুঃখে বুকটা ভেঙে যেত। হঠাৎই এক আন্ধার রাতে বাপ ফৌত হয়ে গেল। বুকের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে তিহারু কেঁদেছিল। ঠিক তার চার রাত পরেই মুঙ্গলি দিলখুশ খবর দিল, টুরা আওথে। উল্লাসে, আনন্দে তিহারু মুঙ্গলিকে কোলে তুলে ঘরের বাইরে নাচ শুরু করল। তার উল্লাস দেখে প্রতিবেশী মানুষজন দৌড়ে এল, কা খবর হো তিহারু? ইতনি খুশিয়ালি কা বর?

তিহারু জবাব দিয়েছিল, হামার টুরা আওথে!

মুঙ্গলি তিহারুর কবল থেকে কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে লজ্জায় ঝোপড়িতে মু আড়াল করেছিল। গাঁয়ের ডওকীরা মুঙ্গলিকে ছেঁকে ধরেছিল। দুধেল জ্যোৎস্নায় গ্রামের আঙিনা নাচ-গান-আনন্দে মুখর হয়েছিল।

তিহারু জোর কদমে এগোয়। তার দায়িত্ব অনেক। সংসারে একটা নতুন মানুষ আসছে। বাপ চলে যাওয়ায় বছরে একবোরা ধানের সাহারা কমে গেল। তিহারুর মাপা রোজগার। ভৈঁসা-পিছু একমুঠা চাওল। দুজনের ভুখ মেটে না। মুঙ্গলির ধানভানাই, ঢেঁকিপাড়াইতে কিছু রোজগার হয়। কিন্তু মুঙ্গলিও তো আর কিছুদিন পরে বসে যাবে। এখনই ওর পেট ঢ্যাবঢ্যাব করে। জোর কদমে হাঁটলে চললে শ্বাস ওঠে। টুরা পয়দা হলে আরও একমাস মুঙ্গলি বসে যাবে। কাম ছেড়ে থাকলে চাওল ঘাটা হবে। তিহারু মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, এখন থেকে সে রোজ কিছু ভাত কম খাবে। একমুঠা চাওল রোজ বাঁচাবে।

ঝোপড়ির দরজায় টোকা দেয় তিহারু—এ মুঙ্গলি, কেওর খোল।

দরজাটা খুলেই মুঙ্গলি শুয়ে পড়ে। তিহারু অস্থির হয়। মাথার কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, তবিয়ত বুরা মালুম হওথে কা?

অ্যায়স্নেই।

ছকুলালের মার কথা তিহারুর মনে আছে। ছকুলালের মা গ্রামের ধাত্রী। তিহারু উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, ছকুলালকে দাইলা (মাকে) বোলা লাগহুঁ কা?

নেহি। অ্যায়স্নেই শোতে রহঁ। থড়কন থকাওট হে।

তু অব কামসে ঝিন যাহ।

তু ঝিন শোঁচিহ। অব হম ঠিক হে। কোই তকলিফ নেহি খে। অব হামনকে কামাই দুগুনা হোনা চাহি।

হম দুসর গাঁওকে আউর ভৈঁসা চরায়েবর লে লিহঁ। তো কুছ যাদা চাওল মিলহি।

নেহি। অ্যায়স্নেই তোলা ওয়পসিমে আন্ধার হো যাথে। হম আউর কুছ দিন কাম কর শেকিহঁ। চল অব খানা খালে।

শালপাতায় লাল চালের ভাত, বুনো আলুর ঝোল এবং শামুকচচ্চড়ি পরম তৃপ্তির সঙ্গে তিহারু খেয়ে ওঠে। মুঙ্গলির সব বিস্বাদ লাগে। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তিহারু শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মুঙ্গলি বলে, অব অ্যায়স্নৈচ হওথে। তু জঙ্গলসে থড়কন ইমলি লানিহ। ইমলি খানেকা বড়া শখ হওথে।

মুঙ্গলির পাশে শুয়ে তিহারু তার সারা শরীরে হাত বুলায়। তার কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করে। মুঙ্গলির পেটে কান পেতে শোনে। বাচ্চার নড়াচড়া টের পেয়ে আনন্দিত হয়। বলে, ই টুরা বহোত বদমাশ হোহি।

মুঙ্গলি প্রতিবাদ করে, টুরা নেহি, টুরি হোহি।

নেহি, টুরা হোহি। দৃঢ় প্রতিবাদ করে তিহারু।

নেহি, টুরি হোহি। হাম ওকার শাদি দিহঁ। শাদিমে পাঁচবোরা চাওল লিহঁ। কাপড়া আর চাঁদিকে জেবর লিহঁ।

তোহর বহুত লালচ হে মুঙ্গলি। টুরি নেহি, টুরা হোহি। হাম শুনে হে। ইয়ে দেখ। আবার পেটের ওপর কান পাতে তিহারু। বলে, জরুর টুরা হোহি।

মুঙ্গলি বিরক্তিতে তিহারুকে ছুঁড়ে দেয়। খাটিয়ার ওপর থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল তিহারু। সেও রেগে ওঠে। বলে, জরুর টুরা হোহি। বহুত কামিয়াব হোহি। হিম্মতদার ডওকা বনহি।

তু তোহর টুরা লেকে রহ। হাম তোর ঘর নেহিঁ রহেন। মুঙ্গলি অভিমান করে।

যা তু তোহর বাপঘর চল দে। তোহর সঙ্গ কোই সম্বন্ধ নেহি। টুরা হোনেপর ভেজ দিহ। অন্য খাটিয়ায় তিহারু পাশ ফিরে শোয়।

দুঃখে, অভিমানে মুঙ্গলির চোখে জল আসে। এত বড়ো কথাটা তাকে তিহারু বলতে পারল! বাপঘর চল দে। ঠিক আছে। কালই সে তার বাপের কাছে চলে যাবে। আর আসবে না। তিহারু ডাকলেও না।

সকালে আর কোনো কথা হয় না। দুজনেই গম্ভীর। মুঙ্গলি ভেবেছিল তিহারু বলবে, কাল রাতের কথা দিলে রাখিস না। তিহারু ভেবেছিল মুঙ্গলি বলবে, টুরা কি টুরি আমি কেমন করে জানব। যাই হোক, সে তো আমাদের। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলে না। তিহারু কাজে বেরিয়ে যায়।

তিহারুর মনটা আজ ভালো নেই। গোরু-ভৈঁসা জঙ্গলের মাঠে ছেড়ে, উদাস হয়ে থাকে। সবকিছু বিস্বাদ লাগে। অকারণেই ভৈঁসাকে পিটায়। ক্লান্ত হয়ে গাছের ছায়ায় বসে। মুঙ্গলির কথা ভাবে। আহা বেচারি! ওর যখন একটা টুরির শখ—হোক না। এটাই তো শেষ নয়। এর পরেরটা না হয় টুরি হবে! অকারণে ওর দিলে কষ্ট দিয়েছে তিহারু। বেচারি এক দিনের জন্যও তাকে ছেড়ে যায় নি। দুদিন বাপের ঘরে থাকব বলে গিয়েছে, তো সাঁঝের বেলা ঝোপড়িতে ফিরে তিহারু অবাক! খানা তৈয়ার! চলে আসার কারণ পুছলে বলে, তোলা ছোড়কর রহনে কা দিল নেহি হওথে। মোলা নিদ নেহি আওথে! তিহারু খুশি হয়ে তাকে আরও বুকের কাছে টেনেছে। আদর করেছে। দুজনে ওয়াদা করেছে, কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না! অথচ সব জেনেও তিহারু তাকে বলল, বাপ-ঘর চল দে। না, সে আজ মুঙ্গলির কাছে মাফি চেয়ে নেবে। তার বহুত কসুর হয়েছে।

তিহারুর মনে পড়ল, মুঙ্গলি তাকে ইমলি আনতে বলেছিল। মুঙ্গলি ভাত খেতে পারে না। ইমলির উদ্দেশে জঙ্গলের দিকে তিহারু হাঁটা দেয়। গোরু-ভৈঁসাদের একত্রিত করে বলে, তুমন এতি উতি ঝিন ভাগিহ। এতি চরত-ঘুমত রহ। হাম থড়কন ইমলি লেকর আওথ'। আতে সাথ তুমনলা ফিরা লে যাহ'। গোরু-ভৈঁসা নির্বিকার চিত্তে ঘাস ছিঁড়ে খায়।

সন্ধ্যা নামার আগেই তিহারু ঝোপড়িতে ফিরল। মাথার ওপর কাঁচা তেতুলের বোঝা, কোঁচার খুঁটে বাঁধা।

হুন্তমনে দরজায় ধাক্কা দিল। কোনো সাড়া না পেয়ে, বেশ কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে বলে, মুণ্ডালি কেওর খোল। মোলা গলতি হো গিসে। হাম মাফি মাগ্গ লেথ°। কিন্তু দরজা খোলার কোনো শব্দ না পেয়ে, আবিষ্কার করে—দরজাটা বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তিহারু দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। হাঁড়ি-কুড়ি উলটে দেখে। মুণ্ডালির উপস্থিতির কোনো চিহ্ন নেই। এমনকি সকালের জলে-ভেজা ভাতের অর্ধাংশ যা সে মুণ্ডালির জন্য রেখে গিয়েছিল, তেমনি পড়ে আছে। তার মুখের কথা মুণ্ডালির বুকে কী গভীর আঘাত করেছে অনুমান করে, ফুলঝোরিয়ার ভেতর দিয়ে তিহারু দৌড় দিল। কিন্তু শিলতোড়ায় মুণ্ডালির বাপের কাছে শুনল, মুণ্ডালি নেই আয়ে হে।

আর স্থির থাকতে পারে না তিহারু। ফুলঝোরিয়ার বন তোলপাড় করে। তীব্র চিৎকারে ডাক দেয়, মুণ্ডালি। সেই চিৎকার পাহাড় থেকে পাহাড়ে, গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে ধাক্কা দেয়। অন্যের বাড়িতে লুকিয়ে-থাকা মুণ্ডালি আর চুপ থাকতে পারে না। সেই ডাক তাকে বিহ্বল করে। বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। চোখের কোনা করকর করে। সেও ফুলঝোরিয়ার জঙ্গলে দৌড় দেয়। অনেকক্ষণ দৌড়াদৌড়ির পর দুজনে দুজনকে খুঁজে পায়। তিহারুর বুকে মুখ রেখে মুণ্ডালি কান্নায় ভেঙে পড়ে। তিহারু নিজেও মুণ্ডালিকে বুকে জড়িয়ে কান্নার আবেগ রুদ্ধ করে।

রাত্রে তেঁতুলবাটা চাটনি লঙ্কা মেখে, মুণ্ডালি জিভের আগায় ঠেকায়। তালুতে জিভ ঠেকিয়ে টকাস টকাস তারিফের শব্দ করে ভেজা ভাত আলু পুঁড়িয়ে খেয়ে ওঠে। সারা রাত তারা অনর্গল কথা বলে। মুণ্ডালি বলে, তিহারু শোনো। তিহারু বলে, মুণ্ডালি বালিকার মতো খিলখিল করে হাসে। শেষ রাত্রে মুণ্ডালি পেটে একটা ব্যথা অনুভব করে। মাঝে-মাঝে ককিয়ে ওঠে। তিহারুর ঘুম ভেঙে যায়। ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুণ্ডালি তাকে শান্ত করে। বলে, অভি কুছ নেহি হোয়। ইতনি দৌড়নেকা কারণ ধড়কন দরদ হওথে। উয়ো ঠিক হো যাহি।

সকালে বেরোনোর সময়ে তিহারু মুণ্ডালিকে বলে, আজ কাম পর ঝিন যাহ। ঘরমে শোতে রাহিহ।

মুণ্ডালি কিন্তু এখন সুস্থ বোধ করে। সে তিহারুর ব্যস্ততায় হাসে। সে জানে, এখনো সময় হয় নি। এত ব্যস্ততার কিছু নেই। তাকে মালকিনের কামে যেতে হবে। মালকিন বড় গৃহস্থী। তার খেতে হরেক ফসল। মালকিন তাকে আগের দিনই বলে দিয়েছে, ঢেঁকি পাড় দিয়ে দালের খোসা উখড়াতে হবে। কামে না গেলে অন্য রেজা ঠিক করে নেবে। মুণ্ডালির লোক-সান হবে। খোসা উখড়ালে দু-কুনা দাল পাবে। আর একমাস পরে সে তো কোনো কামই করতে পারবে না। তখন জুটবে কোথা থেকে! তিহারুর চালে তো ভুখ মিটে না! দালটা যদি পাওয়া যায় তিহারু খুশি হবে। দাল খেতে তিহারুর বড়ো পসন্দ। চুমুক দিয়েই থানিকটা খেয়ে নেয়। মুণ্ডালির রান্নার তারিফ করে। নাঃ, গদিয়ে-সদিয়ে বসে থাকলে দুখ মিটবে না। অভাবের গেরাস্থি। মুণ্ডালি উঠে পড়ে।

মুণ্ডালির দেরি দেখে মালকিন রতনবাই বিরক্ত হয়। দুটো কথা শোনায়। মুণ্ডালি তড়িঘড়ি নিজের কাজে লাগে। ঘরের ভেতর থেকে দুবোরা দাল ঢেঁকিশালে নিয়ে আসে। মাথায় তুলতে গেলে পেটে চাড় লাগে। তাই প্রায় হেঁচড়ে আনে। মালকিন হা হা করে ওঠে। অগত্যা সেই মাথায় তুলে আনতে হয়। মাটি পাথর বেছে কুলোয় টোকা দেয়। দুপুরে নাগাদ ঢেঁকির পাড় দেওয়া শুরু হয়। মালকিন হাত লাগায়, ঢেঁকির গর্তে দাল ঠেলে দেয়।

ঢেঁকি ওঠে নামে। ডালের খোসা ধীরে ধীরে আলগা হয়। সোনারঙের ডাল কালো খোসার মাঝে হাসতে থাকে। মালকিন একমুঠি ডাল হাতে নিয়ে ফুঁ দিয়ে খোসা ওড়ায়। ব্যাজার মুখে বলে, দিল মে তাগদ নেহি হো কা? মাগ্গনি দাল মিলহি? পুরা ছিলকা নেহি উখাড়ে হৈ। জেরা তাগদ লাগাও।

মুণ্ডালি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঢেঁকি পাড় দেয়। তখন চরাচরে সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহ। গোয়াল-ঘরের পাশে নিচু ঢেঁকিশাল অসহ্য গুমোট। শরীর জ্বলসে যায়। ঘামে সারা শরীর ভেজা। মুখের রঙ রাঙা সিঁদুর। পেটের ব্যথাটা আবার অনুভব করে মুণ্ডালি। দাঁতে দাঁত চেপে, ঢেঁকিতে শক্তি প্রয়োগ করে। ব্যথাটা চাটিয়ে ওঠে। ক্রমশ নিচের দিকে নামে। হঠাৎ যেন মনে হয়, জানু বেয়ে একটা তরল আগেয় স্রোত পায়ের পাতায় নামে। রক্ত দেখে মালকিন চমকে ওঠে। বলে, এ

মুণ্ডালি, জলদি উতার। তোহর খুন গিরথে। সব বরবাদ হো যাহি।

কিন্তু হাতের দড়িটা ছেড়ে মুণ্ডালি দাঁড়াতে পারে না। শরীরটা শক্তিহীন, বিষম ভার। ঢেঁকির গোড়াতেই সশব্দে টলে পড়ে। মুণ্ডালি জ্ঞান হারায়। জায়গাটা রক্তক্ষরণে ক্রমশ ভিজে ওঠে।

তিহারু পাহাড়তলিতে ভৈঁসা চরায়। দূরগামী ভৈঁসার ঘন্টা শুনে চিৎকার করে, এ কালি, এতি আ। পাহাড়ের ওপারে আশমান দেখে। আশমানে তখন অস্ত-গামী সূর্যের রঙফেরা। সেই রঙ শুখা নালার জলে গুলাল ছড়ায়। হড়িয়ালেরা স্নান সেরে পাহাড়ের পাথরে ডানা ছড়িয়ে শুকোয়। ডানায় বিচিত্র বর্ণালি। তিহারুর মনটাও যেন উড়ে যেতে চায়। পাহাড়, অরণ্য, ভৈঁসার ঘন্টার টুংটাং তার প্রসারিত দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। একটা ছোট কুটীরে দাওয়ায় কোলে একটি সবল সুন্দর শিশু নিয়ে মুণ্ডালিকে বসে থাকতে দেখে। মনটা খুশিতে ভরে যায়। তিহারু গান গায়।

ঠিক এই সময়েই পওন এসে খবর দেয়, এ তিহারু, জলদি আও। মুণ্ডালিলা বহুত বিমার হে। ওকার তবিয়ত ঠিক নেহি। রতনবাইকে ঘরমে গির পড়িসে।

উন্মাদ অধীরতায় তিহারু যখন রতনবাইর ঘরে এল, সেখানে এক বিরাট জটলা। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ প্রায় সবাই উপস্থিত। ঘরের ভেতরে রক্তাপ্লুত মুণ্ডালি। পাশে ছকুলালের দাই, দুখন ওঝা। শঙ্কিত, ভীত তিহারু, আস্তে ডাক দেয়, মুণ্ডালি।

দুখন ওঝা জবাব দেয়, মুণ্ডালি ঔর বাত না কহি। উয়ো শিউজিকে পাশ চল দিস।

তিহারু স্তম্ভিত হয়। মুণ্ডালি চলে গেল! বিন বাত-চিতেই চলে গেল! তাকে একটা কথা বলতেও দিল না। এমনি বেইমান! ওয়াদার খিলাপ করল! হঠাৎ খেয়াল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, হামার টুরা?

ওকর জনম নেহি হোয়। ওলা সাথ লেকর মুণ্ডালি চল দিস। ছকুলালের মা উত্তর দিল।

মুহূর্তে সব কেমন অর্থহীন শূন্যতায় ভরে যায়। তিহারু তাকিয়ে থাকে। কিছুই যেন দেখতে পায় না। মুণ্ডালির শরীরটাও ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে নেই। মুণ্ডালির মুখটা যেন এখনও সজীব। সে যেন এখনই কিছু বলবে তিহারুকে। কিন্তু দুঃখে, বেদনায়, অভিমানে সে দৃঢ় হয়ে থাকে। অথবা সে যেন এখানে নেই। তার সামনে শববাহনের ব্যবস্থা হয়। বাঁশ, কাঠ বাঁধা হয়। এতদিন যে মানুষটা তিহারুর হৃদয় জুড়ে ছিল, এখন সে মড়া। তার জন্য মানুষের আর কোনো দরদ নেই। আগুনের শিখায় সব শেষ হবে। মুণ্ডালির শরীর, স্মৃতি, স্পর্শ—সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে তবেই মানুষের নিস্তার। মুণ্ডালি নামে এই গাঁয়ে কেউ ছিল, ফুলঝোরিয়ার জঙ্গলে তার পায়ের ছাপ শিলতোড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, সব চৌপট হয়ে যাবে।

নীরব আচ্ছন্নতায় তিহারু সকলের সঙ্গে চলে। দু-চারজন তার পাশে হাঁটে, সান্ত্বনা দেয়। তিহারুর কানে পৌঁছোয় না। গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে শ্মশান। চিতা সাজানো হয়। গাঁয়ের মানুষের কথায় যন্ত্রচালিতের মতো চিতায় আগুন দেয়। কলসি ভরে জল আনে। ফুল ছড়ায়।

চিতাটা দাউদাউ জ্বলে ওঠে। তিহারুর চোখ ঘোলাটে হয়, দৃষ্টিতে ঘোর লাগে। মুণ্ডালি পুড়ছে, এ যেন সে ভাবতেই পারছে না। গতরাতে মুণ্ডালি তার বুকের যেখানে মুখ রেখেছিল, হাত বুলোয়। তাঁর জ্বালা অনুভব করে। ওই আগুন যেন তারই বুকে জ্বলছে। তার অস্তিত্ব যেন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আগুনের দাউদাউ শিখা তার সুখ, তার স্বপ্ন, তার জীবন, ভবিষ্যৎকে গ্রাস করছে। তিহারু অস্থির হয়। সে যেন দাঁড়াতে পারে না। জ্বলন্ত চিতার দিকে এগিয়ে যায়। উপস্থিত মানুষেরা হৈ হৈ করে ওঠে। কিন্তু তাদের কিছু বোঝার আগেই জ্বলন্ত একটা কাঠ নিয়ে তিহারু গ্রামের দিকে দৌড়ায়। নিজের ঝোপড়ির শুকনো পাতায় জ্বলন্ত কাঠটা গুঁজে দেয়। প্রজ্বলিত আগুনের সামনে উল্লাসে লাফায়। অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে মুণ্ডালির গড়া সংসারটা সে জ্বলে ছাই হতে দেখে।

গুরুজীর সঙ্গে চীনে

শ্যামাদাস চক্রবর্তী

বিমানটিকে হঙকঙের পথে ছেড়ে রেখে গিয়েছিলাম। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কক হয়ে সেটি হঙকঙের বিমান-বন্দরে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় এখন সাতটা বেজে দশ, যদিও ভারতীয় সময় রাত তিনটে-টিনটে হবে। হঙকঙে পৌঁছে প্রথমে আমাদের কাস্টমসের ঈষৎ তল্লাশি পোয়াতে হয়েছিল। কিছু কিছু মালপত্র খুলে দেখাতে হয়েছিল। গুরুজীই দেখাচ্ছিলেন। আমার হাতে সেতারটি থাকায় ওঁকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারছিলাম না বলে আমার খুব খারাপ লাগছিল। অবশ্য খানিক বাদেই পিপল সিং নামে এয়ার ইন্ডিয়ার একজন অফিসার এসে কাস্টমস অফিসারদের বুঝিয়ে বলে দিলেন যে গুরুজীর পরিচয় কী এবং উনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন। গুরুজীর সঙ্গে চীনা দূতাবাসের যে পত্রটি ছিল সেটিও তিনি দেখালেন। এরপর কাস্টমস থেকে আর কোনো মালপত্র খুলে দেখতে চায় নি, সঙ্গেসঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই একটি ক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া সমস্ত সফরে আমাদের কোথায়ও কাস্টমস চেকিংয়ের কড়াকড়ি পোয়াতে হয় নি। সর্বত্রই গুরুজী ভি আই পি-তুল্য সমাদর আর যত্ন পেয়েছেন। আর পিপল সিং তো কীভাবে গুরুজীর একটু সেবা করবে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে, তাই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফেরার পথে হঙকঙে সে আর অমিত চ্যাটার্জি নামে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এক অফিসার যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছে তা ভোলা যায় না।

হঙকঙে এয়ার ইন্ডিয়ার তরফ থেকে আমাদের সাময়িক বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয় মিরামার হোটেলে। এটি কাউলুন অঞ্চলের নাথান রোডে অবস্থিত একটি নামি বড়ো হোটেল। ফেরার পথেও আমরা এই হোটেলেই উঠেছিলাম। এখানে উঠে আমি অন্তত জীবনে এই প্রথমে একটা নতুন জিনিস দেখলাম—দরজার ইলেক্ট্রনিক চাবি। এই চাবিটি আসলে একটি গোলাপি রঙের শক্ত কার্ডবিশেষ। তার গায়ে গোটাকতক ফুটো পাঞ্চ করা রয়েছে, আর কিছু নেই। হোটেলের ঘরগুলিতে দরজার পাশে, মেশিনে পয়সা ফেলার যেমন স্লট থাকে তার চেয়ে খানিকটা বড়ো মাপের একটা করে থাপমতন আছে। তার মধ্যে ঐ কার্ডটি ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপরে ভেতরে 'কিরিক কিরিক কিরিক কট' করে কয়েকটা আওয়াজ হবে। ঐ কট আওয়াজটি হলে

দরজাটি ঠেলতেই খুলে যাবে। তখন আবার চাবিটা খুলে নিতে হবে। সবচেয়ে মজা হল, ইলেক্ট্রনিক চাবিটা ওরা প্রতি ক্ষেত্রে পালটায়। কারণ ঐ কার্ডের গায়ে লেখা আছে, মিরামার হোটেলের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কার্ডটি নিজের কাছে রেখে দিতে পার। আমার চাবিটা তো আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

অবশ্য প্রথমবার ঐ চাবি নিয়ে বেশ ঝনঝাটে পড়েছিলাম। তখন তো আর চাবির ব্যবহারপদ্ধতি ঠিক-মত বুঝে উঠতে পারি নি। দরজার গায়ে একটা হাতল ছিল। এখন আমাদের তো অভ্যেস দরজার হাতল ডান-দিকে ঘড়ির কাঁটার গতিপথ অনুসারে ঘুরিয়ে দরজা খোলা। তাই ওই কট আওয়াজটি শেষ হওয়ার পর দরজার হাতল দক্ষিণাবর্তে যতই ঘোরাবার চেষ্টা করি দরজা আর খোলে না। আসলে ঐ দরজার নিয়ম হল হাতল ঘোরালে কিছুতেই খুলবে না, এমনিই ঠেলতে হবে। আমি তো কট করার পরে বৃথাই হাতল মুচড়ে চলেছি। তখন এক বৃদ্ধা মহিলা এসে তাড়াতাড়ি আমাকে সাহায্য করলেন, দরজা খুলে দিলেন। এরপর যে ক-ঘন্টা হোটেলটিতে ছিলাম ভয়ে ভয়ে আর দরজা আদৌ লাগাই নি। কারণ গুরুজী ডাকছেন, কাজকর্ম আছে, আসছি যাচ্ছি। সবসময় দরজায় ঐ একটু ফাঁক রেখে যাচ্ছি, কী জানি আবার আটকে যায় কি না। অবশ্য চাবিটা রেখে দিয়েছি পকেটে। কেননা দরজার গায়ের ফোকরে চাবি লাগিয়ে রাখলে তো বিপদ, যদি ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য দ্বিতীয় বারে অর্থাৎ ফেরার পথে এই চাবির ব্যবহারটি বেশ রপ্ত হয়ে গেছিল।

সাতাশে অগস্ট সকালবেলা ঘন্টাছয়েক হঙকঙে কাটিয়ে আবার আমরা প্লেনে চাপলাম স্থানীয় সময় বেলা দেড়টায়। সি এ এ সি অর্থাৎ চাইনীজ এয়ার-ওয়েজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কর্পোরেশন নামক সংস্থার এই ফ্লাইট আমাদের পৌঁছিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। সেখানে চীনসরকারের প্রতি-নিধিবৃন্দ এবং পি টি আইয়ের শ্রীসুনীল রায় আমাদের অভ্যর্থনা জানান। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনার জন্য সম-বেত হয়েছিলেন বেশ কিছু ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে হল বেশ পদস্থ ব্যক্তি।

প্লেন থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই মধ্যবয়স্কা এক মহিলা এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেতারটা কাড়বার জন্য যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। আমি বেশ বিরক্ত হলাম। ভাবলাম, সেতারটা বোধহয় উনি বইতে চাইছেন, ভারলাঘব করে আমায় সাহায্য করতে চাইছেন। কিন্তু তার তো কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা আমার হাতে সেতার ছাড়া অন্য কোনো মালপত্র নেই। তা ছাড়া সেতারটি বহন করার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অব-লম্বনের প্রয়োজনও আছে, সুতরাং অতিথির প্রতি ওঁদের সৌজন্য করতে সুযোগ করে দেওয়ার খাতিরেও ওটি হাতছাড়া করতে আমি নারাজ। তাই বললাম, এটা কী হচ্ছে? তখন মহিলাটি মিনতির সুরে বললেন, আমি এসেছি তোমাদের অভ্যর্থনা করতে, আমাকে একটু সেতারটা ছুঁতে দাও। আমি তবুও চুপ করে আছি দেখে আবার করুণভাবে আবেদন করলেন, তুমি আমাকে দিতে পার। দিয়ে দেখো না। উনি এমন করে বললেন যে আমি মুখের উপর 'না' বলতে পারলাম না। গুরুজীর দিকে তাকাতে উনি একটু হাসলেন। ভাবলাম তাহলে বোধ-হয় ওঁরও আপত্তি নেই। আর শিবা না করে ভদ্রমহিলার হাতে সেতারটি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে দেখলাম উনি সেতারটিকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন। ওঁর সেই ভঙ্গির মধ্যে এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর অনুরাগ ফুটে উঠেছিল যে মনে হল উনি যেন বহুদিনের সাধ মেটাতে পেরেছেন। যেন বহুদিন থেকে এই সুযোগটির জন্যই উনি অপেক্ষা করছিলেন, এখন এই পবিত্র যন্ত্রটি স্পর্শ করতে পেরে ধন্য হয়ে গেছেন। গুরুজী প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। খানিক পরে আমায় অনুযোগ করে বললেন, ওঁকে দিয়ে সেতারটা বওয়াচ্ছ কেন? আমি বললাম, গুরুজী, ও একটু নিতে চায়, তাই ধরতে দিয়েছি। তখন আর উনি কিছু বললেন না।

পরে জানলাম, এই মহিলা হলেন মিসেস লাও, আমাদের দোভাষিণী। গোটা সফরেই ইনি আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এঁর শালীন, সংযত আচরণ, গুরুজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর সেবাপরায়ণতা, সকলের সঙ্গে ওঁর প্রীতিপূর্ণ, সখ্যমধুর আচরণ, অমায়িকতা, নম্রতা আমার মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে।

পেইচিঙ বিমানবন্দরে মালপত্র খালাস করা বা কাস্টমসের ঝামেলা পোয়ানো প্রভৃতি কিছুই করতে হয় নি আমাদের। যাঁরা নিতে এসেছিলেন আমাদের, সব-কিছুর দায়িত্ব তাঁরাই নিলেন। ওঁরা নিজেরাই আমাদের

পাসপোর্টগুলি নিয়ে নিলেন এবং চারপাশ থেকে আমাদের ঘিরে নিয়ে এগিয়ে চললেন ওরা। এই সময়েই সেই ঘটনাটি ঘটল যার উল্লেখ দিয়ে এই কাহিনী শুরু করেছিলুম।

টুকরো-টুকরো কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে গুরুজীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, স্বাগত রবি, তিনদিন হল সূর্যের মুখ দেখি নি আমরা। আমি পাশেই ছিলাম। কথাটা উনি খুব আস্তে বললেও আমি ঠিক শুনতে পেলাম। উক্তিটি বড়ো সুন্দর আর অর্থবহ মনে হল। জানি না, ঐ কোলাহল আর জনজনার মধ্যে গুরুজী কথাগুলি ঠিক লক্ষ করলেন কিনা। হয়তো উনি শুনে থাকবেন। গুরুজী একটু হাসলেন, এইটা আমার মনে আছে। পরে মনে হয়েছিল গুরুজীর প্রতি শ্রদ্ধা, আগ্রহ আর প্রীতির এর থেকে সুন্দরতর অভিব্যক্তি আর কী হতে পারে?

পেইচিঙ বিমানবন্দর থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে ফ্রেন্ডশিপ হোটেলে। এটি বেশ বড়ো হোটেল, বিদেশী অতিথিদের জন্যই নির্দিষ্ট। সবরকমের সুবিধা আর বন্দোবস্ত রয়েছে এখানে। আমাদের তিনজনকে আলাদা আলাদা ঘরেই রাখল। গুরুজীর ঘরের নম্বর ২৬৩২, আমার ২৬৬৬, লালুর ২৬৬৭, অর্থাৎ লালুর আর আমার ঘর পাশাপাশি। দোভাষী দুজনও ঐ একই হোটেলে ছিলেন, কাজের সুবিধার খাতিরে প্রচলিত নিয়ম খানিকটা শিথিল করেই ওঁদের বিদেশীদের জন্য সংরক্ষিত হোটেলে থাকতে দিয়েছিল। এই দুজন, অর্থাৎ মিসেস লাও ও মিস্টার হুয়া ছিলেন যথাক্রমে ২৬০৪ আর ২৬০৫ নম্বর ঘরে, পাশাপাশি।

সাতাশ তারিখে সন্ধ্যায় আমাদের অন্য কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। তাই হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। প্রথম আহার থেকেই আমরা প্রথম প্রথাত চপস্টিকের ব্যবহার আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি। চীনারা দুটি পাতলা চতুষ্কোণ কাঠের কাঠির সাহায্যে যে কী সাবলীল দক্ষতায় ভাত পর্যন্ত তুলে নিয়ে খায়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ওদের দেখাদেখি আমাদেরও ইচ্ছে হল—চপস্টিক দিয়েই পাত থেকে খাবার তুলে নিয়ে খাব। প্রথম দিন এ নিয়ে সে এক বিশ্রী ব্যাপার হল। আমরা চপস্টিক নিয়ে অনেক কাণ্ড-মাণ্ড করছি, ঘোরাচ্ছি, ধরছি, এটা তুলতে যাচ্ছি, ওটা হড়কে যাচ্ছে, কাঠি দুটো সমান্তরাল থাকার কথা কিন্তু আড়াআড়ি হয়ে যাচ্ছে—সব মিলিয়ে সে এক ল্যাজেগোবরে অবস্থা। কিন্তু গুরুজী, আমি আর ঈশ্বরলাল—তিনজনেরই জিদ চেপে গেল, বিশেষ করে চাপল গুরুজীরই—না, এটা শিখতেই হবে। উনি বললেন, দেখো, বিদেশে এসেছ, একটা জিনিস শিখে নাও। চেষ্টা করো।

তো চেষ্টা করতে গিয়ে তারপরে হয়তো আমরা ভাত তুলছি চামচের কায়দায়। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। ভাত তুলতে হবে খাড়াখাড়ি—চামচের মতো করে আনুভূমিকভাবে তুললে তো হবে না। কারণ চীনারা যেভাবে ধরে খায়, তাতে দুটো স্টিকের মাঝে ভাতটা থাকবে। আর আমরা তুলছি দুটো স্টিকের উপরে ভাত রেখে। যাই হোক, এইসব করে-টরে আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি শিখে ফেলেছি। পরে দেখি, না, শিখি নি। তখন চিন্তা যে কী করা যায়—পাকাভাবে ধরাটা কীভাবে শেখা যায়? ওরা সব দেখিয়ে-টেখিয়ে দিল। আমরাও দেখলাম। কিন্তু ওরা যেভাবে দেখাল, সেভাবে না করে আমরা যেমন কায়দায় ধরলাম দেখা গেল তাতেই আমাদের সুবিধা হচ্ছে বেশি। অবশ্য এক হাতেই দুটো কাঠি ধরেছি, কিন্তু ঠিক ওদের কায়দায় নয়। এখন এটা রপ্ত করতে গিয়ে গুরুজী লেগেছেন, আমিও বললাম, আচ্ছা, দেখা যাক না, একটা চীনাবাদাম চপস্টিক দিয়ে তুলতে পারি কিনা। বাদাম বলতে অবশ্য খোসাছাড়ানো বাদাম। এই নিয়ে খুব মজা হল। বাদামটা যতই ধরতে যাচ্ছি সেটা ততই হড়কে যাচ্ছে। চপস্টিকটা সোজা থাকার কথা, রসদ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, এই করতে-করতে প্রথম দিনটা তো ঐরকম গেল। তারপরের দিন লানচের সময় মনে হল একটু-একটু যেন পারছি। ডিনারের সময় মনে হল, আমরা খুব এক্সপার্ট হয়ে গেছি। কিন্তু পরের দিন আবার খেতে বসে দেখি, ফের ফেঁসে গেছি, ঐ এক্সপার্টাইজে আর কুলোচ্ছে না।

এই করে দিনকয়েক আমাদের একটু ভুগতে হয়েছে, শেষে মোটামুটি চলনসই দক্ষতা রপ্ত হয়ে গেল। অবশ্য খাবার সময় চামচ দিয়েও কিছু কিছু জিনিস তুলেছি—যেমন, ভাত। ভাতটা চপস্টিক দিয়ে তুলে-তুলে খেতে সত্যি করে মন ভরত না। কেননা তরকারি মুখে দিয়ে বহু চেষ্টায় কোনোমতে তিনটে ভাত তুললাম, সেটা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। তা ওরা চামচ দিত, চাইলে চামচ কাটা সবই মিলত। কিন্তু গুরুজীও আমাদের বললেন, আর আমরাও দেখলাম যে, এটা শিখব না কেন? এতে অবশ্যই খেতে একটু সময় লাগত। শেষের দিকে কিন্তু আগের তুলনায় বেশ পোক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

এই ফাঁকে চীনের হোটেল সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুয়েকটি কথা বলে নিই। প্রত্যেক হোটেলে প্রয়োজনীয় তথ্যসংবলিত একটি কাগজ ঘরে ঘরে টাঙানো থাকে। সেটি পড়ে দেখি তাতে স্পষ্ট করে লেখা আছে, কোনো মদ্যপ ব্যক্তিকে থাকতে দেওয়া হবে না, হোটেলের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি চলতে দেওয়া হবে না এবং কেউ যদি তা করে তবে সেটা এক দন্ডনীয় অপরাধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে ভাবলাম, এ ধরনের দুরাচার নিশ্চয়ই একসময়ে চলত, নতুবা এই সাবধানবাণী লিখে দিতে হবে কেন?

তবে একটা জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ওদেশের হোটেলে টিপস বা বকশিশের কোনো ব্যবস্থা নেই। টিপস দিয়ে বিশেষভাবে সেবা বা সুবিধা আদায় করার বৈষম্যমূলক চেষ্টা ওখানে অসভ্যতার পর্যায়ে পড়ে, এমনকি তা আইনবিরুদ্ধও বটে। হোটেল ছাড়ার আগে ওরা প্রত্যেক আবাসিকের হাতে একটা করে কাগজ ধরিয়ে দেয় যার নাম 'গেস্টস ওপিনিয়ন'। এই কাগজে বিভিন্ন বিষয়ে হোটেলের সেবাব্যবস্থা এবং পরিচারকবৃন্দ সম্পর্কে আবাসিকদের অভিমত খোলাখুলি প্রকাশের ব্যবস্থা রয়েছে। কাগজটির বাঁদিকে চারটি বিষয়ের নাম উপর থেকে নীচে পরপর লম্বালম্বিভাবে লেখা রয়েছে, যথা হোটেলের সংশ্লিষ্ট ফ্লোরে সাধারণ সার্ভিস কেমন, ঐ ফ্লোরে নিযুক্ত পরিচারকদের সার্ভিস কেমন, রেস্তোরাঁ সার্ভিস কেমন এবং যে খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে তা কীরকম। এর পাশে-পাশে ডানদিকে স্তম্ভের মাথায় ভেরি গুড, গুড, অ্যাভারেজ, পুওর—এই চারটি শিরোনাম যথাক্রমে লেখা আছে। হোটেলের অতিথি চলে যাবার সময়ে একেকটি বিষয়ে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন মানবিষয়ক ঐ চারটি শ্রেণীর মধ্যে যেটি প্রযোজ্য সেইটিতে টিক-চিহ্ন দিয়ে। এ ছাড়া, এর তলায় আলাদাভাবে জানানোর জন্য একটা জায়গা রয়েছে—হোটেলের পরিচারকদের মধ্যে কোন্ জন অতিথিকে সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দিয়েছে। অতিথিদের পক্ষে হোটেলবাসকে রমণীয়তর করে তুলতে হোটেল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে পারে এমন কোনো পরামর্শ যদি কোনো অতিথি দিতে চান তবে তার জন্যও সবশেষে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, এই অভিমতপত্রটিকে নিছক নিয়মরক্ষার ব্যাপার বলে ধরা হয় না, এটিকে যথাযোগ্য মর্যাদাও দেওয়া হয়। এমনকি এর ভিত্তিতে পরিচারকদের কাজের মূল্যায়ন করা হয়, তাদের উন্নতি বা অবনতিও এর উপর অনেকটা নির্ভর করে। ভাবি আমাদের দেশে সরকারি অফিস-টফিসে, কি অন্তত দোকানে বা অতিথিশালাতে যদি এই ধাঁচে সরকারি কর্মচারীদের কাজকর্ম সম্পর্কে বা সাধারণভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মতামত নেবার এবং তার উপরে ভিত্তি করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার প্রথা চালু করা যেত। কিন্তু হায়, আমাদের দেশে বোঝা মুশকিল যে সরকারি কর্মকর্তা তথা চাকুরিয়ারা জনগণের সেবক না প্রভু। তাঁদের তিরস্কৃত বা পুরস্কৃত করবার ক্ষমতা দূরে থাক, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা কর্তব্যকর্ম কতটুকু করলেন অথবা করতে ব্যর্থ হলেন, সে সম্পর্কে জবাবদিহি চাইবার কোনো অধিকারও আমজনতা কোনো দিন পাবে—এ আশা বুঝি এদেশে দুরাশা মাত্র।

সাতাশে অগস্টের সন্ধ্যাটা তো বিশ্রাম আর সান্ধ্য-ভোজনেই অতিবাহিত হল। ঐ দিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে চপস্টিকের কৌশল আয়ত্ত করার কৌতুকজনক প্রয়াস। পরের দিন সকালে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। তবে বাইরে নয়, আমাদের সঙ্গে আনা মালপত্রের মধ্যেই এবং তা আমার বিস্ময়ের উদ্রেক করল। বস্তুটি হল তিনটি কাগজের বড়ো-বড়ো প্যাকেট। উচ্চতায় ফিট দুয়েক, চওড়ায় ফুটখানেক। প্যাকেটগুলি দিল্লী থেকেই সঙ্গে এসেছে। প্যাকেটের মধ্যে কী আছে আমি তার বিন্দুবিসর্গ জানি না। হঙকঙে এগুলি খোলার কোনো প্রয়োজন হয় নি। পেইচিঙ পৌঁছনোর পরেও সেদিনটা আর গুরুজী এগুলি সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। পরের দিন সকালে আমাকে ডেকে বললেন, এই প্যাকেটগুলো খোলো।

খুলে দেখি—ওব্বাবা, অত বড়ো-বড়ো তিনটি প্যাকেট একেবারে যেন গুপ্তধনে ঠাসা। অর্থাৎ 'মাই

মিউজিক মাই লাইফ' নামে গুরুজীর লেখা বইটির একটি প্যাকেট, সেটিই সবচেয়ে ভারি। আর-একটি প্যাকেট এল পি রেকর্ডে বোঝাই। তাতে ছিল গুরুজীর নিজের একক বাজনা, আলি আকবর খাঁ সাহেব আর ইয়েহুদি মেনুহিনের সঙ্গে স্বৈতবাদন। তা ছাড়া, কণ্ঠসংগীতে কুমার গন্ধর্ব, ভীমসেন যোশী প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের রেকর্ড। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এগুলো এনেছেন কেন? উনি বললেন, এগুলো উপহারের জন্য। উপহার দিতে হবে তো!

কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছিল তা হল তৃতীয় প্যাকেটটি। এর মধ্যে ছিল ওঁর নিজের বাজনা আর নির্দেশসংবলিত ক্যাসেট সেট এবং তার সহগামী পুস্তিকা। চীনে দেখেছি ওঁর উপহারের তালিকায় ওই আত্মজীবনী আর রেকর্ড ছাড়াও থাকত একসেট ক্যাসেট আর একটি করে পুস্তিকা। ক্যাসেটের সেট বলতে তিনটি করে ক্যাসেট, প্রত্যেকটির মেয়াদ ঘণ্টাখানেক করে। আর সঙ্গে একটি ছাপা ইংরেজি পুস্তিকা। পুস্তিকাতে আছে প্রথম সেতার-শিক্ষার্থীর উপযোগী লেসন—অর্থাৎ, বেসিক তালিম কী হবে না হবে তার নির্দেশাবলী। শুনলাম যে ক্যাসেটেও সেই জিনিসই আছে, গুরুজী ভাষ্যসহকারে বাজিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমি অবশ্য নিজে ক্যাসেটটি বাজিয়ে শুনি নি, সুযোগও হয় নি। লালুই আমাকে বলল যে এতে কী আছে।

এই ক্যাসেটের সেটটি উপহার দেওয়ার সময় একটি আয়তাকার প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যে ভরে দেওয়া হত। বাক্সের ঢাকনাটি ভারতীয় কারুকার্যে খচিত। মনে হয়, বাক্সগুলি এই উপহারের আধার হিসাবে বিশেষভাবে বানানো। প্রত্যেক বাক্সে তিনটে করে ক্যাসেট পরপর সাজানো থাকত। তাতে থাকত তিন পর্যায়ের লেসনস। এগুলির উপরে বসানো থাকত ঐ ছাপানো বই, আর তার উপরে বাক্সের সুদৃশ্য ঢাকনা। উপহারগুলি বিলি করার সময় আমাকে হাত লাগাতে হত। তখন বইয়ের এক-আধটা পাতা খুলে ঐ ফাঁকেই এক-আধবার যা চোখ বুলিয়ে নিতে পেরেছি তাতে দেখলাম লালু যা বলল সেইভাবেই ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া হয়েছে।

এই ক্যাসেট সেটটি যে বিদেশীদের জন্যই তৈরি, তা বুঝতে দেরি হয় নি। কিন্তু এ ব্যাপারে এদেশেও তো অনেকের অবশ্য বিদেশীদের মতো। তা ছাড়া, স্বয়ং গুরুজীর তৈরি করা লেসনস আর ইনস্ট্রাকশনস পেলে বোধহয় তাঁর পুরনো ছাত্রদেরও নতুন করে তালিম নিতে ইচ্ছে করবে। অন্ততপক্ষে আমার মতো যাদের অন্যকে শেখানোর ব্যাপারও রয়েছে তাদের কাছে এই বস্তুর মূল্য কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বলতে লজ্জা নেই, এই সেটটি দেখে আমার এত লোভ হল যে কী বলব। প্রচণ্ড লোভ চেপে রইলাম কয়েক দিন ধরে। এই জিনিস যে গুরুজী বানিয়ে রেখেছেন তা তো জানতেই পারি নি এতদিন। যাই হোক, দেখছি উনি যেখানে যাচ্ছেন অকাতরে এই সেট উপহার দিচ্ছেন গণমান্য ব্যক্তিদের। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রিবর্গ, রেডিও স্টেশনের লোকজন, মিউজিক কনজার্ভেটরি স্কুলের ডিরেক্টর ইত্যাদি। সেখানে আমার পক্ষে চাওয়া তো ঠিক নয়। এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম বটে, কিন্তু মন আমার আঁকুপাঁকু করছে তখন। বিলিবণ্টন তো গুরুজী প্রায় আমার হাত দিয়েই করাচ্ছেন। ভাবছি—আর সবাইকে দেওয়া শেষ হোক। দু-একখানা তো পড়ে থাকবে। একখানা চেয়ে নেব।

শেষে খান তিনেক ক্যাসেট সেট থেকে গেল। তারপর গুরুজীকে একটা নিবেদন করেছিলাম—গুরুজী, এই জিনিস তো আমি দেখি নি কোনোদিন। আমার বড়ো ইচ্ছে যে যদি একটা দেন। উনি বললেন, দেখো, ওটা আমায় দিতে হবে। তোমরা তো আছই, ঘরের ছেলে। তোমায় পরে দিয়ে দেব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ ক্যাসেট আর আমার কপালে জুটে ওঠে নি। তাই দারুণ একটা ক্ষুধা এখনো আছে। আসলে পুস্তকটিও তো ভালো করে উলটে দেখতে পারি নি। কারণ তখন এত ব্যস্ত যে বইটা পড়ার অবসরও ছিল না। আর ক্যাসেট না কাটলে বই বেরবে না তো। তাই উনি যখন কাউকে ক্যাসেট দিতে গেলে কাটতে বলতেন তখন একটা ছুরি বা ব্লেড দিয়ে বা তাড়াহুড়ো করে কোনোমতে নখ দিয়ে আমি সেলোফেন পেপারটি ছিঁড়ে কেসটা যাতে খোলা যায় সেটুকু ব্যবস্থা করে দিতাম। ঐ খুলতে গিয়েই যা দেখেছি বইটা। আর তলায় তিনটে ক্যাসেট পরপর সাজানো।

বিতরণের উদ্দেশ্যে অন্যান্য যেসব উপহারদ্রব্য গুরুজী সঙ্গে করে এনেছিলেন তার কথাও এই প্রসঙ্গে

বলি। এর মধ্যে ছিল চন্দনকাঠের নানান রকমের জিনিস, ধূপকাঠি, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি। আমার কাছে গুরুজীর নিজের হাতে লেখা একটি তালিকা আছে। তা থেকে দেখতে পাচ্ছি উনি সুটকেসে নিয়ে গেছিলেন আগরবাতি বারো প্যাকেট, চন্দনকাঠের তৈরি গণেশমূর্তি বড়ো দুটি, ছোটো চারটি, চন্দনকাঠের কলম, চাবির রিঙ, কারুকার্যময় হ্যান্ডলুমের সুদৃশ্য বটুয়া ইত্যাদি। রোজ সকালে উনি একটু চিন্তা করতেন কাকে কী কী উপহার দেবেন। সেইমতো আমাকে নির্দেশ দিতেন ফর্দ করে জিনিস বের করে রাখতে। যেখানেই উনি গেছেন এসব জিনিস প্রচুর পরিমাণে উপহার দিয়েছেন। শেষে ফেরার পথে হঙকঙে যখন দেবার মতো অন্য কিছুই আর নেই, তখন যারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছিল সেই পিপল সিং আর অমিত চ্যাটার্জিকে গুরুজী কিছু রেকর্ড উপহার দিয়েছিলেন। ওরা অবশ্য এয়ারপোর্টে এই জিনিস পেয়ে একেবারে অভিভূত।

আঠাশে আগস্টের সকালটা তো এইরকম নানান গোছগাছে কাটল। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর বেলা এগারোটা নাগাদ দুটো গাড়ি করে আমরা বেরলাম পেইচিঙ দেখবার উদ্দেশ্যে। একটা গাড়িতে গুরুজী উঠলেন, অন্যটাতে লালু আর আমি। দুই গাড়িতে দুই দোভাষিণী—মিসেস লাও আর মিস লিচেন। লাওয়ের উল্লেখ আগেই করেছি। লি চেন সাধারণত থাকত আমাদের গাড়িতে। ওর কথায় পরে আসব। পেইচিঙ বিশাল শহর, এর আয়তন প্রায় চারশ বর্গ-মিটার। বেশির ভাগ দ্রষ্টব্য স্থানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় চার-পাঁচ দিন পরে। এই দিন অল্প সময়ের জন্য শহরের নানা এলাকায় ঘুরে ঘুরে দেখাল। এর মধ্যে ছিল প্রশস্ততম পথ ছা আন অ্যাভিনিউ, সবচেয়ে জনাকীর্ণ রাস্তা ওয়াং চৌ চেন এবং বিখ্যাত চেয়ারম্যান স্কোয়ার। এই প্রাঙ্গণটির আয়তন অতীব বিশাল, আশি হেক্টেয়ার পরিমাণ। এখানে পাঁচলক্ষ লোকের সমাবেশের মতো জায়গা আছে। মাও এখানে ভাষণ দিতেন, তাঁর একটা ছবিও টাঙানো ছিল।

তারপর আমরা গেলাম পেইচিঙ এগজিবিশন হল নামে এক বিশাল প্রদর্শনী তথা বিপণনকেন্দ্রে। এটি অনেকটা আমাদের খাদি গ্রামোদ্যোগ গোছের কেন্দ্র। এখানে রয়েছে কুটিরশিল্পের নানা সুন্দর সুন্দর নিদর্শন, সুকুমারশিল্পের নমুনা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদি। প্রবেশদ্বারের মুখেই আমাদের হাতে একটা করে হাতপাখা ধরিয়ে দিল। বেশির-ভাগ কর্মীই মহিলা। একেকটা ঘরে ঢুকছি আর মহিলা-কর্মীরা একখানা করে সুন্দর হাতপাখা মেলে ধরে উপহার দিচ্ছে। আমি ভাবছি ব্যাপারটা কী? ভেতরে ঢুকে বুঝলাম, কেন ঐ হাতপাখা ধরিয়ে দিল। সেখানে প্রচণ্ড গরম, পাখা নেড়ে হাওয়া খেয়ে কোনোমতে সামলাই। পাখাগুলি সঙ্গে করে এনেছি। ওগুলি নাকি স্বাগত জানানোর জন্য উপহার, ফেরত দিতে নেই।

আটাশ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় পেইচিঙের বিখ্যাত গ্রেট হল অব পিপল নামক সরকারি হলঘরে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভোজে আপ্যায়ন করা হল। এই সভাকক্ষ থেকে প্রশস্ত যে এখানে দশ হাজার লোকের সমাবেশ হতে পারে। আদর-অভ্যর্থনাসমেত সবরকম সরকারি কাজেই হলঘরটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গুরুজী তাঁর পক্ষ থেকে চীনের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আর অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপহারস্বরূপ দিলেন ওঁর নিজের গ্রন্থ 'মাই মিউজিক মাই লাইফ', এল পি রেকর্ড, ক্যাসেট সেট ইত্যাদি। অপরপক্ষে, চীন সরকারের তরফ থেকে আমাদের তিনজনকেই বহুমূল্য সব উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল।

এই ভোজসভাটির আয়োজন করেছিলেন চীনের সংস্কৃতি দপ্তরের উপমন্ত্রী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সেনট্রাল কনজারভেটরি অব মিউজিকের লেকচারার জে আই লু, সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্ট ব্যুরোর ডিরেক্টর লি গ্যাং, চাইনীজ পারফর্মিং আর্ট এজেন্সির ম্যানেজার সেং চ্যাং জিউ, সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সদস্যা শ্রীমতী ঝাং ইহুআ, ও জু চ্যাং লামে জনৈক স্কুল শিক্ষক ইত্যাদি। সংস্কৃতি দপ্তরের উপমন্ত্রী মহোদয় এই ভোজসভায় যে ভাষণটি দেন তার একটি ইংরেজি অনুবাদ আমার কাছে আছে। সেটি বাঙলায় তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায়—

বিশিষ্ট শ্রীযুক্ত রবিশঙ্কর, মহামান্য রাষ্ট্রদূত এবং শ্রীমতী ভেঙ্কটেশ্বরণ, ভারতবর্ষ হতে আগত বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ, বন্ধুগণ ও কমরেডগণ,

বিখ্যাত ভারতীয় সংগীতনায়ক রবিশঙ্কর আর

অন্যান্য ভারতীয় কলাকারদের সঙ্গে আজ রাত্রে এখানে একত্রিত হতে পেরে আমরা অত্যন্ত সুখী এবং সম্মানিত হয়েছি। আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে চীনের কলামহল বিশেষ করে সংগীতমহলের বন্ধুরা এবং উপস্থিত সকল চীনা বন্ধুরা আমার এই অনুভূতির শামিল হবেন। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংস্কৃতিমন্ত্রকের হুয়ে এবং পেইচিঙের সংগীতমহলের হয়ে আমাদের আন্তরিক স্বাগতসম্ভাষণ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চীন এবং ভারতবর্ষ—উভয় দেশেরই রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস আর সভ্যতা। দু হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সংস্কৃতির দূতেরা দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছেন। বহু যুগ ধরে চীন এবং ভারতের জনগণ পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে সাহিত্য আর কলার ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, আর এই উভয় ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল কীর্তির পরিচয় মেলে। সংগীতের কথাই ধরা যাক না কেন। আমরা অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে সেই সুপ্রাচীন জিন বংশের আমলেও দেখা গেছে যে ভারতীয় সংগীত তখনই চীনে পৌঁছে গেছে। সপ্তম শতাব্দী নাগাদ সুই এবং তাঙ যুগে রাজসভা থেকে নিয়ম জারি করা হয়েছিল যে সাতপ্রস্থ, নয়প্রস্থ ও দশপ্রস্থ সংগীতে ভারতীয় সংগীতকে মুখ্যস্থান দিতে হবে। এই সব-কিছু থেকে একথা পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীনকালে ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে নিজের করে নেওয়ার প্রতি চীন কতটা গুরুত্ব আরোপ করত। চীনা ভিক্ষু হুয়ান ঝুয়াঙ যখন সতেরো বছর যাবৎ ভারতে বিদ্যার্জন করছিলেন তখন সেখানে তিনি চৈনিক সংস্কৃতি প্রচার করেন। যে 'রেনবো স্কার্ট' নামক মেলডি ও 'রেনবো স্কার্ট অ্যান্ড ফেদার রোব' নামক নৃত্য অদ্যাবধি প্রদর্শিত হয় তা ভারতীয় সংগীত 'ব্রাহ্মণ' হতেই চীনা সংগীতকারেরা প্রাচীন যুগে পুনর্বিন্যস্ত করেন। ইতিহাসের লেখা অনুযায়ী 'শত্রুবিধ্বংসী সম্রাট কিন' নামক সংগীতালেখ্য ভারত এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে সমাদৃত হয়েছিল। একথা বেশ বলা চলে যে প্রাচীন কাল থেকেই চীন এবং ভারতীয় জনগণ পরস্পরকে আন্তরিক সুহৃদরূপে পেয়েছে এবং একে অন্যের সংগীত বুঝেছে, সমাদর করেছে।

তাঁর বর্তমান চীনসফরের মধ্য দিয়ে শ্রীযুক্ত শঙ্কর চীন-ভারত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাসে একটি নতুন পাতা সংযোজিত করলেন। চীনে তাঁর এই প্রথম পদার্পণ হতে পারে বটে, কিন্তু চীনের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতির সঙ্গে আমরা বেশ পরিচিত। তাই তাঁকে এবং তাঁর দলের অন্যান্যদের আমরা পুরনো বন্ধু বলেই স্বাগত জানাচ্ছি। শ্রীশঙ্কর পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিও নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর বহুমুখিনতা, আত্মোৎসর্গ এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। সেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং ইয়েহুদি মেনুহিনের সঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনশীর্ষক যুগলবন্দীসমেত তাঁর বিভিন্ন কৃতি বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। ভারতীয় সংগীতের প্রতি শ্রীশঙ্করের অনুরাগ আর ভক্তি, প্রাচ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন সাধনে এবং বিশ্বের সংগীতের রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে তাঁর দান কলাকার হিসাবে তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে।

শ্রীশঙ্কর এবং অন্যান্য ভারতীয় কলাকাররা যে সংগীত পরিবেশন করতে এবং বক্তৃতা দিতে এখানে এসেছেন তার জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। চীনের সংগীতজ্ঞ আর শ্রোতারা অনেক দিন ধরে এর জন্য আশা করে বসে আছেন। চীনে অবস্থানকালে চীনের পরম্পরাগত এবং লোকায়ত সংগীত যাতে আপনি আরো উত্তমরূপে বুঝতে পারেন সে ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন আপনার এদেশীয় বন্ধুরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হবে। আপনার এই সফর যে আমাদের দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নতি ঘটিয়ে সৌহার্দ্যবৃদ্ধি করবে এবং একটি চমৎকার স্মৃতির উপহারে আমাদের নন্দিত করে যাবে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। আমাদের দুদেশের জনগণের সংগীতমহল যেন চিরকাল পরস্পরের বন্ধু হয়ে থাকতে পারে।

বন্ধুগণ ও কমরেডগণ, আমি এখন আপনাদের পানপাত্র তুলে ধরতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি—

চীন-ভারত সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিকাশ এবং দুদেশের জনগণের সৌহার্দ্যবৃদ্ধির কামনায়, শ্রীশঙ্কর এবং তাঁর দলের সফরের সাফল্যের কামনায়, মাননীয় রাষ্ট্রদূত ও শ্রীমতী ভেঙ্কটেশ্বরণের স্বাস্থ্য কামনায়, উপস্থিত সকল বন্ধুগণের স্বাস্থ্য কামনায়, ক্যাম্বে!

এই রাষ্ট্রীয় ভোজে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তার বর্ণনায় আসছি পরে। কিন্তু মন্ত্রিমহোদয়ের ভাষণের শেষাংশ থেকেই পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে পানীয়েরও ব্যবস্থা ছিল। নানারকম মাপের পানপাত্রে সাজিয়ে বিভিন্ন রকমের পানীয় পরিবেশিত হচ্ছিল। তার একেকটির বর্ণ আর পরিমাপ একেক রকম। আনুষ্ঠানিক রীতিরক্ষার্থে আমাদেরও পান করা বিধেয় ছিল। আমি যে এর পূর্বে কখনও সুরা স্পর্শ করি নি, এমন নয়। পরিবেশন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো-সখনো খেয়েছি বইকি। কিন্তু গুরুজীর সামনে সুরাগ্রহণে আমার অনীহা ছিল। অথচ গুরুজী বলে বসলেন, এটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, সৌজন্যের খাতিরে একটা কিছু নাও। মুখের কাছে নিও বা সামান্য একটু নিতেও পার। এতে দোষ নেই।

বললেন বটে, কিন্তু নিজে একটি পাত্র নিয়ে ঐ সৌজন্যমূলকভাবে মুখের কাছে এগিয়ে আনলেন মাত্র, একবিন্দুও পান করলেন না।

[ক্রমশ

দেশে বিদেশে

রাসায়নিক ও জীবাণুঘটিত অস্ত্র

১৯৭৬ থেকে এই আট বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া রাসায়নিক অস্ত্র এবং জীবাণু-ঘটিত অস্ত্র-নিষেধ নিয়ে একটা কার্যকর চুক্তিতে পৌঁছবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অস্ত্রবর্জন সভায় ওই দুই প্রধান রাষ্ট্রের আলোচনা এত দিনেও তেমন কোনো চুক্তির ধারে-কাছেও আসতে পারল না, অথচ রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত অস্ত্র মানুষের যে কী ভয়ের এবং বিপদের কারণ, সে বিষয়ে সবাই একমত। অনেকদিন আগেই রুজভেল্ট বলেছিলেন—বিশ্বজনমত ঘোষণা করেছে, রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার আইন-বিরুদ্ধ।

দুঃখের বিষয়, বিশ্বজনমতের হাতে এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে, বে-আইনি কার্যকলাপ সে বন্ধ করতে পারে। বিশেষ করে, অপরাধী যদি হয় বিশ্বের কোনো প্রধান রাষ্ট্র, তাকে সাজা দেওয়া তো দূরের কথা— আদালতের সামনে হাজির করাও বিশ্বজনমতের ক্ষমতার বাইরে। আইন তো আছে, কিন্তু সে আইন খাটাবে কে?

১৯২৫ সালের জেনেভা প্রোটোকল যুদ্ধে রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত অস্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে বিষাক্ত গ্যাসের প্রয়োগ এবং তার মারাত্মক ফল দেখে মানুষ বুঝেছিল—একে নিষিদ্ধ না করলে নিস্তার নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত অস্ত্রের দিকে কোনো পক্ষই বিশেষ হাত বাড়ায় নি। তার কারণ অবশ্য বিশ্বজনমতের ভয় ততটা নয়, যতটা ইটের বদলে পাটকেল খাবার ভয়। কেননা, এইজাতীয় অস্ত্রের নির্মাণ এবং প্রয়োগ যে-কোনো শিল্পোন্নত দেশের পক্ষেই সহজ।

এইসব অস্ত্র নিয়ে মানুষের আসল বিপদটা ওইখানেই। দেশে দেশে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপক প্রসার রোধ করা সে তুলনায় অনেক সহজ ; কেননা, তার যে দুটি অপরিহার্য উপকরণ—প্লুটোনিয়ম এবং বহুলপরিমাণে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ম—মোটেই সহজলভ্য নয় ; তার সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। কিন্তু রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত অস্ত্র বহু দেশের নাগালের মধ্যে ; কেননা, মাসটার্ড গ্যাস উৎপন্ন করে খোলের মধ্যে পোরা, কিংবা ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া—এজন্যে খুব উন্নত মানের প্রযুক্তি-বিদ্যার দরকার হয় না।

তা ছাড়া, এইসব অস্ত্রের যা উপকরণ, নানা রকমের নির্দোষ শিল্প-উৎপাদনেও তার ব্যবহার অতি ব্যাপক। যেমন, পটাসিয়ম ফ্লোরাইড। গত মার্চ মাসে মারকিন সরকার ইরাকে ওই রাসায়নিক পদার্থটির রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। কারণ, ওই পদার্থটি থেকে এমন গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে যা মানুষের স্নায়ুকে বিকল করে দেয়। ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরাক যে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে, সে বিষয়ে এখন আর বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই মারকিন সরকারের ওই ব্যবস্থা। কিন্তু এদিকে আবার শান্তিপূর্ণ শিল্প-উৎপাদনের কাজেও ওই রাসায়নিক পদার্থটি লাগে। কাজেই, তার সরবরাহ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব বললেই চলে।

একটা দুটো নয়, রাসায়নিক যুদ্ধের অস্ত্রশালায় অস্ত্র বহু প্রকারের। কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন? চাষের কাজে যে কীটাণুনাশক না হলেই আজকাল চলে না, রাসায়নিক দিক থেকে তার সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভেদ অল্প। প্রয়োজনে যখন তখন কীটাণুনাশকের কারখানাকে বিষাক্ত গ্যাসের কারখানায় রূপান্তরিত করা চলে। ঢাকঢোল না পিটিয়ে গোপনে যদি কোনো দেশ এ কাজ করতে চায়, তাকে আটকানো খুবই কঠিন।

রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত অস্ত্র নিষেধের কোনো চুক্তি যে সম্পাদিত হতে পারছে না, তারও প্রধান কারণ এইসব অসুবিধা। অস্ত্রনিষেধের কিংবা অস্ত্রবর্জনের যে-কোনো চুক্তিরই একটি প্রধান শর্ত—চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা সেটি যাচাইয়ের সন্তোষজনক ব্যবস্থা। এই যাচাইয়ের ব্যবস্থাটা পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে যতটা না হোক, রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত অস্ত্রের বেলায় তার চেয়ে অনেকগুণ দুঃসাধ্য। এর উৎপাদনই বলুন আর সংরক্ষণই বলুন, অন্যের চোখ এড়িয়ে জোরকদমে চালিয়ে যাওয়া তেমন কোনো একটা সমস্যাই নয়।

তবু এই বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করা আশু প্রয়োজন—কিছুই করবার নেই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার দিন চলে গেছে। ইরান-ইরাকের লড়াই আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—রাসায়নিক যুদ্ধের খাঁড়া মানুষের মাথার ওপর সর্বদাই ঝুলছে। এবং, এই প্রথম নয়। ভিয়েতনামে আমেরিকা যে গ্যাসের প্রয়োগ করেছিল, যার ক্রিয়ায় অরণ্যানী নিষ্পত্র

হয়েছিল, সেই এজেন্ট অরেঞ্জ-এর দীর্ঘমেয়াদি ক্রিয়ার পরিচয় এত দিনে পাওয়া যাচ্ছে—এবং তাও কম মারাত্মক নয় ; তা ছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার মিত্ররা যে আফগানিস্তান, লাওস এবং কামপুচিয়াতে রাসায়নিক এবং বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার করেছে, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম।

অথচ, জেনেভা প্রোটোকল ছাড়াও, রাশিয়া এবং আমেরিকা ১৯৭২-এর বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড টকসিন ওয়েপনস কনভেনশন-এ নিজেদের আবদ্ধ করেছে। এই কনভেনশন নিষিদ্ধ করেছে জীবাণুঘটিত অস্ত্রের উপকরণ এবং টকসিন (অর্থাৎ, এমন বস্তু যা জৈব-প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এবং যার ক্রিয়া রাসায়নিক পদার্থের মতো)। নিষিদ্ধ করেছে তার উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ। তবু এ বিষয়ে কার্যকর কোনো চুক্তি এই দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত হল না আজ পর্যন্ত।

প্রধান বাধা, আগেই বলেছি, যাচাইয়ের প্রশ্ন। এ বিষয়ে রাশিয়ার আপত্তিই প্রবলতর। তার কারণ, গোপনীয়তা রুশ রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তরের ধর্ম, রাষ্ট্রপরিচালকদের অপরিহার্য রক্ষাকবচ। সেই গোপনীয়তার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবারই কথা। এদিকে আমেরিকার অবস্থা দিন দিন যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে সন্দেহ হয়, হাটে ভাঙবার মতো কটা হাঁড়ি আর শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। কাজেই, আমেরিকা অস্ত্র-চুক্তি পালনে তার সাধুতা এবং নিষ্ঠার ব্যাপারটা বিদেশী পরিদর্শকদের দিয়ে যাচাই করিয়ে নিতে রাজি হলে তাতে অবাক হবার কিছু থাকে না। অবশ্য, বলা বাহুল্য, এই পরিদর্শনের ব্যবস্থা দুপক্ষেই বলবৎ হওয়া দরকার।

এই চরাতেই চুক্তির আলোচনা বারে বারে ঠেকে যাচ্ছে। ১৯৭৯-এর এপ্রিলে রাশিয়ার স্বের্দলোভস্ক শহরের কাছে মারাত্মক অ্যানথ্রাক্স রোগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সন্দেহ করবার কারণ আছে—জীবাণু-যুদ্ধের এক কারখানায় বিস্ফোরণ থেকেই এই রোগের উৎপত্তি হয়েছিল। সোভিয়েত সরকার দাবি করে, খারাপ মাংস খাওয়ার ফলেই এই রোগ দেখা দিয়েছিল। এরকম ঘটনা আমেরিকায় ঘটলে এ বিষয়ে সরকারি বক্তব্যের ওপরই বিশ্বের লোককে নির্ভর করতে হত না, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কাজেই রাসায়নিক এবং জীবাণু-ঘটিত অস্ত্র নিষেধ-সম্পর্কিত চুক্তি কোন্ দেশ কতটা মানছে বা না মানছে—তা নির্ধারণ করার কোনো সন্তোষজনক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গ্রহণ করার পথে অনেক বাধা। সম্প্রতি জেনেভাতে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র রাসায়নিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে, এবং সেজন্য খোলাখুলি যাচাইয়ের এক প্রস্তাব পেশ করেছে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, আমেরিকা অন্য দেশের সঙ্গে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত, যার ফলে সব দেশই পরস্পরের কাছে বাধ্য থাকবে অতি স্বল্প-কালের নোটিসে নিজেদের অস্ত্র উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের পর্যবেক্ষণের জন্যে খুলে দিতে।

অবশ্য সোভিয়েত রাশিয়াও ব্যক্ত করেছে যে তারা, যেখানে যেখানে রাসায়নিক এবং জীবাণুঘটিত অস্ত্র ধ্বংস করে ফেলা হবে বলে তারা ঘোষণা করবে, সেসব জায়গায় আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদলের মোতায়েন থাকাতে স্বীকৃত হতে পারে। জেনেভাতে মারকিন প্রতিনিধি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট বুশ এই অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, অঘোষিত ওইজাতীয় অস্ত্র যাতে না থাকে এবং তার উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে কী করে—সেইটেই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

যাই হোক, রাসায়নিক এবং জীবাণু-ঘটিত অস্ত্রনিষেধ সম্পর্কে এমন কোনো ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে যাতে কোনো ছিদ্র থাকবে না, যা পুরোপুরি কার্যকর করা যাবে। তবু, সে বিষয়ে অবহিত থেকেও, এই লক্ষ্যের দিকে যতটা অগ্রসর হওয়া যায় ততটাই ভালো। সবচেয়ে বড়ো কথা, রুজভেল্ট যাকে বলেছিলেন বিশ্ব-জনমত, তা এইজাতীয় অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে যেন সদাজাগ্রত থাকে।

ঠাঁই নাই

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দৃষ্টিতে পৃথিবী যেমন ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে, দেশে দেশে দূরত্ব কমে আসছে। তেমনি আরেক দিকে আবার দুস্তর বাধাও গড়ে উঠছে এক দেশের মানুষের অন্য দেশে বসতি স্থাপনের পথে। কোথায় নতুন নতুন সেতু রচিত হবে, তা না নতুন নতুন প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সান্নিধ্য বাড়ছে বলেই কি অসহিষ্ণুতা বাড়ছে? বিদেশে প্রবাসী ভারতীয়রাই যে শুধু এর ফলে বিপন্ন বোধ করছেন তাই নয়, এই অসহিষ্ণুতার বহিরাগত-বিদ্বেষের আঁচ গায়ে লাগছে নানা দেশের মানুষের, যাঁরা কোনো না কোনো কারণে, বাধ্য হয়ে, কিংবা স্বেচ্ছায়, নিরাপত্তার সন্ধানে কিংবা ভাগ্যান্বেষণে দেশান্তরে বসবাস করছেন।

একদা নানা শ্রেণীর বহিরাগতের এক প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল ব্রিটেন। বিশেষ করে যাঁরা রাজনৈতিক কারণে নিজের দেশে নির্যাতন ভোগ করেছেন, তাঁরা জানতেন ওই দেশে গেলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। এই আশ্রয়দান আশ্রয়প্রার্থীর নিজের দেশের ক্ষমতাসীন সরকার যতই অপছন্দ করুক, এর পেছনে একটা উদার মহৎ আশ্বাস ছিল যে মানুষমাত্রেরই একটা নিজস্ব স্বাধীনতার অধিকার আছে, সে অধিকার তার নিজের দেশের সরকার যদি

কেড়ে নেয়, তবু পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তার দাঁড়াবার ঠাঁই থাকবে।

সে ঠাঁইও কি এবার তাকে হারাতে হল? শরণাগতকে আশ্রয়দানের উদার ব্রিটিশ নীতি কত দিন বজায় থাকবে তা নিয়ে এখন রীতিমত সন্দেহ দেখা দিয়েছে। দাবি উঠেছে, কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিক আশ্রয়দানের আগে, তার নিজের দেশের সরকারের অনুমতি নিতে হবে। এই নিয়ম জারি করা, আর প্রকৃতই যার আশ্রয়ের প্রয়োজন তার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া একই কথা। কেননা, যে রাষ্ট্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করে না সে এই অনুমতি দেবে না।

অবাঞ্ছিত, বিপন্ন বহিরাগতদের মধ্যে রাজনৈতিক কারণে আশ্রয়প্রার্থী-দের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশি নয়। এঁদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক কারণে দেশান্তরী। এই শেষোক্তদের অবস্থাও ক্রমশ করুণ হয়ে উঠছে। ব্রিটেনে এঁদের অভিজ্ঞতা বোধ হয় এখন আর সংবাদের পর্যায়েও পড়ে না—তা এমনই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভরসার কথা—শিক্ষিত, সভ্য এবং সংস্কৃতিমান ব্রিটিশদের মধ্যেও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে, প্রতিরোধ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আপামর জনসাধারণের মধ্যে বহিরাগত অশ্বেত-কায়ের প্রতি বিদ্বেষ যদি ছড়িয়ে পড়ে অল্পসংখ্যকের প্রতিরোধ কত দিন, কোন্ ভূমির ওপর দাঁড়াবে?

সম্প্রতি খবর এসেছে, প্যারিসেও অশ্বেতকায়রা বর্ণবিদ্বেষজাত নিগ্রহ ভোগ করতে আরম্ভ করেছেন। ফ্রান্স-কে আমরা আগে সাধারণভাবে রক্তকানা বলে জানতাম, গাত্র-বর্ণ সে দেশে মানুষে মানুষে খুব বেশি বিভেদ সৃষ্টি করতে আগে পারত না। এখন সভ্যতা তথা সংস্কৃতির সেই পীঠ-স্থানেও যদি আদিম সংকীর্ণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তা হলে আশা করা-বার আর কী থাকে? সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা, বয়স্কদের তুলনায় তরুণদের মধ্যেই নাকি এই বর্ণগত অসহিষ্ণুতা প্রবলতর আকার ধারণ করছে। তার মানে, ভবিষ্যৎ কি বর্ত-মানের চেয়ে আরও কলঙ্কিত হবে?

সবশেষে, আরেক শ্রেণীর বহিরাগত সমস্যার তো কূল-কিনারাই দেখা যায় না। এঁরা অবশ্য-দুর্বিপাকে দেশ-ত্যাগে বাধ্য হন, যেমন ভিয়েতনামের সেই অধিবাসীরা যাঁরা নৌকাযানে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন, কিংবা বাংলাদেশের সেই পাকিস্তানীরা যাঁরা চোরাগোপ্তা পথে ভারতে প্রবেশ করেছেন। শেষোক্তদের মধ্যে খিদিরপুর অঞ্চলে যাঁরা চোরা-চালান এবং অন্যবিধ বে-আইনি কার্যকলাপে লিপ্ত তাঁদের জন্যে অশ্রুবিসর্জন অসংগত, কিন্তু অনেক নিরীহ মানুষও আছেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। তাঁদের মাথা গোঁজ-বার ঠাঁই, দু'মুঠো অন্নের সংস্থান—এসবের দায় বহন করতে কলকাতা, কিংবা ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই বাধ্য নয়। কিন্তু এঁরা যাবেন কোথায়?

এজাতীয় লোকের দায় কোনো বিশেষ দেশের নয় ঠিকই, কিন্তু সমগ্রভাবে মানবজাতির তো বটেই। স্বদেশচেতনার ঊর্ধ্বে উঠে যাঁরা মানবচেতনার দায় স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছেন, তাঁরা এঁদের বিষয়ে উদাসীন থাকবেন কী করে?

'নেকড়ে বাঁচাও'

পরিশেষে একটি সংবাদ।

ইটালির অ্যাপেনাইন পর্বতমালার মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলের নির্জন শিখরে আর সানুদেশে নেকড়ের দল আবার বিচরণ করছে। নেকড়ে বাঘ ইউরোপ থেকে লোপ পেতে বসেছিল। বিশ্ব বন্য-প্রাণী ভাণ্ডার অনেক চেষ্টায়, বারো-বছর-ব্যাপী 'নেকড়ে বাঁচাও' সংগ্রাম পরিচালনা করে, আবার মানুষের কাছে দীর্ঘকালের বিভীষিকা এই বন্য জন্তুটিকে ধরাধামে টিকে থাকার অধিকার ফিরে দিতে পেরেছে। এর জন্যে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেক সন্দেহ, অনেক অবিশ্বাস, অনেক ভয় এই সংগ্রামের সৈনিকদের জয় করতে হয়েছে।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত

লোকসংগীতের আধুনিকীকরণ ও তার ভবিষ্যৎ

প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির একটি নিজস্ব ট্রাডিশনাল, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ থাকে, যার উৎস শহর নয়—গ্রাম। তাই সেই সংস্কৃতি গ্রামের জনজীবনের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। এই সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। আর এই লোকসংস্কৃতির একটি শাখা লোকসংগীত, যা কিনা গ্রামীণ সমা-জের সর্বাপেক্ষা আত্মিক সংস্কৃতি। যদিও গ্রামের মানুষই এই সংগীতের স্রষ্টা, তবুও এইসব গান আঞ্চলিকতা-ভেদে ভিন্ন। অঞ্চলবিশেষের ভৌগো-লিক পার্থক্যের কারণে বা জীবনযাত্রার ভিন্ন ধরনধারনের জন্য বা শ্রম তথা কৃষির স্বরূপের জন্য অথবা সেইসব জাতির ওপর বিশেষ বিশেষ সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে লোকসংগীতের কথায় আর সুরে আঞ্চলিকতাভেদে ভিন্নতা দেখা যায়। আমাদের দেশে এক অঞ্চলের লোকসংগীতের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকসংগীতের কথায় সুরে পার্থক্য দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ নদী-মাতৃক দেশ হওয়ার জন্য সেখানে জল-পথের সংগীত বা ভাটিয়ালি আর সারিগানের প্রাধান্য। ভাটিয়ালি মাঝির গান, আর সারিগান 'বাইচ' বা নৌকা-দৌড় খেলার সময় গাওয়া হয়। প্রকৃতি-গত কারণেই উত্তরবঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে ভাওয়াইয়া আর চটকা। ভাওয়াইয়া মূলত গোচারণভূমির গান। উত্তরবঙ্গের-মধ্যে আবার আঞ্চলিকতাভেদে গাওয়া হয় গম্ভীরা, গাজনের গান, জাগ গান প্রভৃতি। আর পশ্চিমবঙ্গের মূল গীতি-রীতি হল বাউলগান, যা আধ্যাত্মিক-চেতনা-সমন্বিত। এ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের লোক-সংগীতের সন্ধান মেলে। যেমন নীলের গান, ভাদু, টুসু, করম, ঝুমুর, আল-কাপ, রাইবেঁশে, ঘেঁটুগান, হাপুগান, লেটোর গান, ছো নাচের গান, সাঁওতাল-দের সহরাই পরবের গান ইত্যাদি।

আঞ্চলিকতা ছাড়াও এইসব গানের অন্যতম প্রধান লক্ষণ এর ভাবপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা। গ্রামের কৃষিজীবী, মাঝি ইত্যাদি মানুষের প্রাণের আবেগ, কামনা, বাসনা, দুঃখ, অভিমান, অভাব, বেদনা ইত্যাদি ভাবগুলি সহজ-সরল কথায় সুরের "অমার্জিত অথচ শিল্প-রূপ" নিয়ে ফুটে উঠত।

Henry Edward Krehbiel বলেছেন, "folksongs are the echoes of the heartbeats of the vast folk, and in them are pre-served feelings, beliefs and habits of antiquity.

তাই ঐ-সমস্ত গানের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে একটা ঐতিহ্য, একটা জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। যে-কোনো দেশের লোকসংগীত সম্পর্কে এই একই কথা বলা যায়। লাতিন আমেরিকা, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ভিয়েতনাম, চীন—সব দেশের লোকসংগীতেই আছে আঞ্চলিকতা, জাতিগত ঐতিহ্য, ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং আপন জাতির বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু মানুষের জীবনের প্রবাহ সর্বদা মসৃণ নয়। তাই মাঝে-মাঝেই প্রত্যেক জাতির জীবনেই আসে একটা বাঁক, একটা মোড়। জীবনটা তখন বইতে শুরু করে অন্য খাতে। সমস্ত ঐতিহ্য, সংস্কার, মূল্যবোধ নতুন জীবনের ধ্যানধারণার কাছে বাধা পায়, এবং সেখানে জেগে ওঠে একটা সংঘাত। সেই সংঘাতে পুরনো হারিয়ে যায় নতুন মূল্যবোধ আর সংস্কৃতির রূপে।

আমাদের দেশে সেই সংঘাত এল স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আর ইংরেজদের কাল-চারের প্রতি মোহ ভেঙে ফেলল শহরে মানুষের পুরনো ধ্যানধারণা, সংস্কার, মূল্যবোধ। ইংরেজরা এদেশ ত্যাগ করে গেল বটে, কিন্তু রেখে গেল তাদের কালচারের কিছু উচ্ছিষ্ট। সেই ঔপ-নিবেশিক সংস্কৃতি একটা পার্থক্য সৃষ্টি করল গ্রামের মানুষ এবং শহরের মানুষের মধ্যে। শহর এবং গ্রাম ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। একই সঙ্গে ঘটতে লাগল গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙন, গ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি, দুর্বলের প্রতি সবলের পীড়ন তথা শোষণের মাত্রার বৃদ্ধি। শহরে ঘটতে লাগল যন্ত্রসভ্যতার প্রসার। 'কৃষি-কেন্দ্রিক উৎপাদনব্যবস্থা থেকে সমাজের ঝোঁক শিল্পায়নের' দিকে গেল। এই সমস্ত বিষয় নাড়া দিল গ্রামীণ সংস্কৃতিকে। শহরে শিল্পের প্রসারের ফলে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হয়ে উঠল, বাঁচার তাগিদে এদের সঙ্গে আসা লোকশিল্পীর দলও হয়ে পড়ল নাগরিক জীবনের অঙ্গীভূত। গ্রামে যাঁরা এক সময় লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁদেরও শহরমুখীনতার ফলে আজ আর গ্রামে বসে না লোকসংস্কৃতির আসর—যাত্রা, ঢপ, আখড়াই, বাউল-গান, কবির লড়াই ইত্যাদি। কেননা গ্রামে এইসব সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করবার লোকের অভাব। পালাপার্বণে আজ যে সংস্কৃতির আসর বসে তার চরিত্রই আলাদা। আজ যে যাত্রার আসর সেখানে বসে তা নাগরিক শিল্প।

গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙনের ফলে ঘরে ঘরে হারিয়ে গেল সুখ, সমৃদ্ধি, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, 'গোয়ালভরা গোরু, গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ ছিল'—এই 'ভরা' জীবনের ক্রমাবনতি ঘটতে লাগল।

এইরকম জীবনের প্রভাব পড়ল লোকসংগীতের ক্ষেত্রে। গানের অনু-শীলন ক্রমে কমে আসতে লাগল। লোকসংগীতের লিখিত রূপ ছিল না, তা থাকেও না। তা মুখের গান, মুখে মুখেই তা চলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

তাই লোকসংগীতের ভাণ্ডার অনু-শীলনের অভাবে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হতে লাগল।

ঠিক একই সঙ্গে শহরে সৃষ্টি হতে লাগল একটি মিশ্র সংস্কৃতি। তার মধ্যেই শহরে মানুষ বাঁধতে লাগল লোকসংগীত। শহর হয়ে উঠল শহরে লোক-সংস্কৃতি সৃষ্টির উৎস। এ-সবের স্রষ্টা কিন্তু গ্রামের মানুষ যারা নানা কারণে আজ শহরবাসী। তারাও আজ মিশ্র সংস্কৃতির কৃষ্ণিগত। লোক-সংগীত তার প্রকৃত স্বরূপ হারিয়ে পর্যবসিত হল কৃত্রিমতায়। এর পর শহরে মানুষগুলোর হাতে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলো থাকার ফলে শহরে গায়কেরা নানা গ্রামীণ ম্যানারিজম আর কৃত্রিম অ্যাকসেন্টে গেয়ে গানগুলি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার করতে লাগলেন। ফলে দেখা গেল মাটির বুকে জন্ম যে লোকসংগীতের, তা ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে আর শহরে তৈরি লোক-সংগীত গ্রামের মানুষের মুখে-মুখে ফিরছে।

শহরের গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক—এঁদের হস্তক্ষেপে লোক-সংগীতের আধুনিকীকরণ ঘটল। যে আধুনিকীকরণের কারণ নানাবিধ। তবে প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায়—(১) আঞ্চলিকতা সম্পর্কে অসম্যক জ্ঞান, (২) শহরে সংস্কৃতির মানদণ্ডে তার পরিমার্জন, (৩) ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য।

শহর থেকে পাঠানো এইসব কৃত্রিম লোকসংগীত ছাড়াও গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ছাপ ফেলল আরো কয়েকটি ব্যাপার। শহর-সংস্কৃতির প্রতি অতিরিক্ত মোহ-

প্রস্তুতার কারণে এখন গ্রামের ঘরে ঘরে বাজে 'বিবিধ ভারতী', সেখানে চটকদার হিন্দি ছবির রমরমা, গ্রামীন সংস্কৃতির নিজস্বতাকে এগুলি ভেঙে ফেলল টুকরো টুকরো করে।

এক সময় গ্রামের যে মানুষ লোকসংগীত গাইত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আর ভাষায়, এবং তাতে প্রকাশ পেত আঞ্চলিকতা, আজ তারই গলায় বাজে শহরের তৈরি গান। শহরের গায়কের গলার এবং উচ্চারণের সফিস্টিকেশনকেও সে নকল করার চেষ্টা করে। সুতরাং লোকসংগীত আর খাঁটি রইল না, কী কথায়, কী সুরে, কী গায়কি ঢঙে!

এরই সঙ্গে এল আর-এক ধরনের লোকসংগীত যা কিন্তু গ্রামের সৃষ্টি নয়। লোকসংগীতের সুর নিয়ে মানুষ সৃষ্টি করল নতুন বস্তুর। লোকসংগীতের হারিয়ে যাওয়ার আর-একটি কারণ এই সংগীতের প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান আসক্তি এবং তার প্রসার। তা হল গণসংগীত। এই গণসংগীত প্রতিবাদের গান, শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদের সংগ্রামের গান। এই গণসংগীত অবশ্য আমাদের দেশে স্বদেশী গানের পথ ধরে আসে নি। মুকুন্দদাস, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের স্বদেশী গানের উত্তরসূরী কিন্তু এই গণসংগীত নয়। এই গণসংগীত এসেছে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা, বিশ্বের শোষিত, সংগ্রামী মানুষের প্রতি ভালোবাসা তথা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রসার থেকে। শহরের মানুষের কাছে এইসব গণসংগীতের আবেদন বাড়ার ফলে লোকসংগীতশিল্পীও গণসংগীত গাইতে লাগলেন এবং লোকসংগীত এবং গণসংগীত মিলে মিশে একটা খিচুড়ি পাকিয়ে গেল।

এ ছাড়াও, কিছু কিছু লোকসংগীত উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলচ্চিত্রে ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল হয়ে উঠল। 'জিসকি বিবি মোটি' ধরনের গানগুলি লোকসংগীত হওয়া সত্ত্বেও চলচ্চিত্রে এগুলি এমনভাবে ব্যবহৃত যার ফলে এগুলির মধ্যে একটা অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া যায়। এ ছাড়া চলচ্চিত্রের গানের কথায়, আধুনিক গানে লোকসংগীতের সুরকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা আধুনিক সুর ছাড়া আর কিছু নয়। এইভাবে নানা দিক থেকে লোকসংগীতের ওপর আধুনিকীকরণের একটা প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।

তবে কিছু কিছু শিল্পী লোকসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখার একটা তাগিদ এক সময় অনুভব করেছেন। এ ব্যাপারে ছিল তাঁদের অক্লান্ত সাধনা। এদের মধ্যে অনেকে আজও জীবিত, তবে তাঁদের ইচ্ছাশক্তি আজ অনেক শিথিল, মনের আপসহীন ভাবটা আজ অনেকটাই মরে গেছে। তাঁরা চেয়েছিলেন লোকসংগীত জনপ্রিয় হোক, কিন্তু যেন তার চারিত্রিক বিচ্যুতি না ঘটে। গ্রামের মানুষের লোকসংগীত উপহার দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা শহরের মানুষকে। গানের রসহানি না ঘটিয়ে তাঁরা কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দকে পরিমার্জিত করেছেন আঞ্চলিকতাকে যতখানি সম্ভব রক্ষা করে। এঁদের মধ্যে অনেকেই চেষ্টা করেছেন লোকসংগীতের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের। কিন্তু তবুও আজ লোকসংগীত আর বিশ্বস্ত থাকছে না। শুদ্ধমাত্র আমাদের দেশেই নয়, কোনোদেশেই তা থাকছে না। তাই অন্যান্য দেশেও লোকসংগীতের পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। ইংল্যান্ডের সেসিল শার্প, আমেরিকার পিট সিগার, জার্মানির হার্ডার, হাঙ্গেরির বেলা বারটক ও জোলটন কোদালি, চেকোশ্লোভাকিয়ার আন্তনিন ভোরাক প্রভৃতি ব্যক্তিদের লোকসংগীতের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম লক্ষ্য করার মতো।

কিন্তু লোকসংগীতের সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা যাচ্ছে তা হল অসংখ্য লোকসংগীতের বাণী সংগৃহীত হচ্ছে বটে কিন্তু তার মূল সুরকে আজ আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই এই সংগ্রহের 'সাহিত্যিক মূল্য থাকলেও, সংগীতিক মূল্য' বিশেষ নেই।

আমরা আজ তবে কী করব! নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হওয়া ছাড়া কি আমাদের আর কোনো পথ নেই? আছে। সেই পথেই লোকসংগীতের যথাযথ মূল্যায়নের সাহায্যে একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তবে কখনোই আমরা সেইসব পুরানো দিনের ঐতিহ্যে ফিরে যেতে পারব না। কেননা আজ আর তা সম্ভব নয়, সমাজতাত্ত্বিক কারণেই সম্ভব নয়। গ্রামীণ অর্থনীতি, সংস্কার, মূল্যবোধ বদলেছে, তাকে আজ আর অতীতের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আজ সেইসব দিনের মতো ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে লোকসংগীতের সৃষ্টি অথবা অনুশীলনও সম্ভব নয়, আবার শিল্পোন্নত সমাজব্যবস্থায় যেহেতু প্রাচীন সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির অবিকৃত চরিত্র আশা করাও যায় না, তাই আমরা আধুনিক লোকসংগীতই গাইব, তবে তারও কতকগুলি নিয়মকানুন প্রয়োজন। যেমন, আজ প্রয়োজন লোকসংগীতকে গ্রামে ফিরিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে সম্পদ আহরণ। যে মানুষটা আজও বৈঠা বেয়ে চলে, চাষ করে—তার গলার গান, তার স্বরগত ও বাগ্‌ভঙ্গিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতিকে অনুশীলনের সাহায্যে গলায় তুলে নিতে হবে। সেই লোকসংগীতের প্রচার তথা প্রসারের দিকে জোর দিতে হবে। গ্রামের লোকসংগীতশিল্পীদের এই গান গাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি চাই অনুশীলন, লোকসংগীতের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, উদার মনোভাব, সৎ উদ্দেশ্য এবং সংযম। তবেই লোকসংগীতকে অনেকটা বাঁচানো সম্ভব। এ ছাড়াও চাই "সূক্ষ্ম বুদ্ধিজ্ঞান এবং অধিকার-অনধিকার-চেতনার পরিচয়।" একজন শিল্পী সব-ধরনের নয়—কেবলমাত্র এক বিশেষ অঞ্চলের গান নিয়েই অনুশীলন করবেন। যেমন কেউ হয়তো গাইবেন বাউল, কেউ শুধু ভাটিয়ালি, আবার কেউবা শুধুমাত্র ভাওয়াইয়া। এইভাবে অনেকটা রক্ষিত হতে পারে আঞ্চলিকতা।

এ ছাড়া কোনো ভাবেই গ্রামীণ লোকসংগীতের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ভবিষ্যতে তা অযোগ্য লোকের হাতে গিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছাবে যখন "দুধের স্বাদ পিটুলি গোলা" দিয়ে পূরণ করতে হবে। আজ সমস্ত সুস্থ রুচিবোধ, শিল্প প্রভৃতিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিকৃত করে দিতে চাইছে ধনিক শ্রেণীগুলি। তাদেরকে এইসব সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া লোকসংস্কৃতির স্বার্থেই আশু প্রয়োজন।

গ্রামের লোকসংগীতশিল্পীকে তার হারানো সম্মান ফিরিয়ে দিতে হবে, তাদের প্রেরণা দিতে হবে সংগীত সৃষ্টির। এইভাবেই সম্ভব লোকসংগীতের পুনরুজ্জীবন।

আর সবশেষে মনে রাখতে হবে সেসিল শার্প-কথিত তিনটি মূলনীতির কথা যা আমাদের বিশ্লেষণের পথপ্রদর্শক। কনটিনিউয়িটি-ভেরিয়েশান-সিলেকশান। ঐতিহ্য-উদ্ভাবন-নির্বাচন। এই তিনের সম্পর্ক সম্বন্ধে যদি আমাদের সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে তবেই আমরা মূল লোকসংগীতের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ঘটতে সক্ষম হব।

সন্দীপন বিশ্বাস

নাটক

নাট্যকারের রচনা-নৈপুণ্য বা নির্দেশকের আজ্ঞাপালন

ভালো নাটক লেখা হচ্ছে না—এইরকম একটি অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরেই শহর কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে গুনগুন করছে। হয়তো খানিকটা সত্যতাও রয়েছে এই অভিযোগের মধ্যে। কিন্তু একেবারেই নিরাশ হবার যে কোনোই কারণ নেই, অন্তত হাতের কাছেই যে রয়ে গেছে ইদানীংকালের গ্রহণযোগ্য উদাহরণ—দু-দুবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই শহরেই, অতান্ত কম সময়ের মধ্যে। বাংলাদেশের নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের 'নূরলদীনের সারা জীবন', যার রচয়িতা সইদ সামসুল হক এবং 'ভূমিকা'র প্রযোজনায় বিজয় তেন্দুলকর-এর 'কমলা' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই শহর আবার প্রমাণিত করল—আমাদের আশপাশের প্রতিবেশীদের ভিতর রচিত হয়ে চলেছে নিখুঁত কিছু, অক্ষভিত্তিক নাটক। লক্ষণীয়, এই দুটি নাটকের রচনাকারই পশ্চিমবাঙলার লোক না হলেও আমাদের থেকে বহু-দূরের কোনো বাসিন্দাও নন। হাত বাড়ালেই এঁদের ছোঁয়া যায়, অভিনয়ও করা যায় এঁদের নাটকগুলি। আর এই-সমস্ত সাবলীল নাটকগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতেই হয়তো পশ্চিমবাঙলাতেও দেখা দেবে অনন্য কিছু ফসল। এ আশা ব্যাভাবিক।

'নূরলদীনের সারা জীবন' এই প্রথম শহর কলকাতায় অভিনীত হল। 'কমলা' কিন্তু আগে বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়ে গেছে। একেবারে দুই ভিন্ন মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে এই দুই নাটক। রচনাভঙ্গিতে সম্পূর্ণ পৃথক। 'নূরলদীনের সারা জীবন' একটি কাব্যনাটক, রঙপুরের আঞ্চলিক ভাষায় তার বুনোট। 'কমলা'র ভাষায় মার্জিত গদ্য, কখনো-সখনো সেখানে দানা বেঁধেছে বিহারের আঞ্চলিক কিছু শব্দ। খুব মোটা দাগে বললে—'নূরলদীনের সারা জীবন'-এ রয়েছে খাঁটি মাটি-মাখানো স্বাদ আর গন্ধ, 'কমলা'য় বিচ্ছুরিত হচ্ছে আধুনিক শহুরে নির্যাস। অথচ দুটিরই নিটোল নাট্য-রচনা-বিন্যাসে দক্ষ কারিগরের ছাপ। আর তাই প্রমাণিত হয়েছিল এপ্রিল মাসের নয় তারিখে বিদ্যামন্দির হলে নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের অভিনয়ের গুণে বা মে মাসের কৃড়ি তারিখে ভূমিকার প্রযোজনায় অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে 'কমলা' অভিনয়ের সুবাদে। আরও একটি লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায় এই দুই নাটকে। 'নূরলদীনের সারা জীবন'-এ নূরলদীনেরই সারাক্ষণ আধিপত্য মঞ্চে অথচ 'কমলা'র কমলার মঞ্চ-উপস্থিতি নামমাত্র, যদিও এই চরিত্রটিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে নাটকটির আদ্যন্ত বিন্যাস।

'কমলা'র কাহিনীটি নিয়েই প্রথম ভাবা যাক। নাটকের শুরু এক সাংবাদিক-পত্নী (শরিতা) এবং তাঁর কাকা-সাহেবের মধ্যে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে। বোঝা যায়, দিল্লীর নীতিবাগ-অঞ্চলের বাসিন্দা এই সাংবাদিক যশদেব ভ্যানক ব্যস্তবাগীশ মানুষ। দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে তাঁর নিত্য ছোটাছুটি। স্ত্রীর কাছ এই সময়ে যশদেবের অনুপস্থিতিতে আসা সমস্ত টেলিফোন-কলগুলি নামধাম-সমেত খাতায় টুকে রাখা। কাকাসাহেবও একজন পুরনো-দিনের সাংবাদিক। ইংরেজ আমলে জেলও খেটেছেন। বর্তমানে তাঁর নিজস্ব একটি কাগজ আছে। সেই কাগজের নিউজপ্রিন্ট যোগাড় করার তাগিদেই তিনি দিল্লী এসেছেন।

এরপরে যশদেবের মঞ্চে আগমন ঘটে। ছটফটে, কওনে-বলনে চোস্ত এই তরুণ সাংবাদিকটির পেছনে ঘোমটা-ঢাকা আদিবাসী এক মেয়ে। পরে জানা যাবে—এ-ই কমলা। মঞ্চের এককোণেই তার স্থান। ফাঁকায় স্টীকে জানায় যশদেব, বিহারের লালডেঙ্গা অঞ্চল থেকে

আড়াইশ টাকায় এই মেয়েটিকে কিনে এনেছে। সে চায় এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটিকে কাগজে ফাঁস ক'রে দিতে যে, এই ভারতবর্ষে উনিশশো তিরাশি সালেও চলছে নিলামে মেয়ে কেনাবেচার হাট। পুলিশ, উপরতলার কর্তৃপক্ষ—সবাই সবকিছু জেনেও চুপচাপ বসে আছেন। আর এই নির্মম সত্যটিই দেশের মানুষের কাছে জ্বলজ্যান্ত প্রকাশ ক'রে দিতে চায় যশদেব। তাই সাক্ষ্য-প্রমাণের তাগিদে, সবদিকে আট-ঘাট বেঁধে নিয়েই যশদেব এই কাজে নেমেছে। সেইদিনের, তাদের কাগজের পক্ষ থেকে ডাকা প্রেস-কনফারেন্সে সবচেয়ে বড়ো তুরুপের তাস হচ্ছে, ঐ আদিবাসী মেয়েটি। কমলা। মঞ্চের এককোণে ঘোমটা ঢেকে, এনামেলের গ্লাসে চা নিয়ে যে চুপচাপ বসে আছে, আর আড়চোখে চাইছে।

এই কমলা-সমস্যাটি নিয়েই এরপর নাটক এগিয়ে চলে। কাকাসাহেবের অভিযোগ, হাল-আমলের সাংবাদিকরা যশদেবের মতন শুধু স্কুপ-নিউজের তাগিদেই দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘেঁটে বেড়াচ্ছে। কোথায় গেল তাঁদের আমলের সেই তথ্যভিত্তিক সৎ সাংবাদিকতার যুগ? আর, এই-সমস্ত রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ শুধুমাত্র কতিপয় ইংরেজি-জানা মানুষজনদের জন্য। দেশের স্বার্থের চেয়েও বড়ো হচ্ছে এখন সাংবাদিকদের নিজেদের আখের গুছোবার তাগিদ। যশদেব মেনে নিতে পারে না। তার ধারণা, তার এ-সমস্ত কাজই নৈতিক দায়িত্বের তাগিদে, দেশের মানুষকে আরও পরিষ্কার করে দেওয়া দেশটা সম্বন্ধে।

ক্রমে, যশদেবের স্ত্রী শরিতা কমলার কাছাকাছি এসে, কথা বলে জানতে পারে—আসলে সে নিজেও একজন ক্রীতদাসী। যাকে কেনা হয়েছিল সাত বছর আগে। রাজবাড়ির ঘোড়ায়-চড়া, অভিজাত পরিবারের মেয়ে এই শরিতা এখন শুধুই যশদেবের হুকুম-তামিল-করা একটি দাসী বই আর কিছু তো নয়! যে পার্টিতে যেতে বললে যায়, হাসবার হুকুম হলে হাসে বা রাত্রে শয্যাসঙ্গিনী হবার আদেশ এলে হুকুম তামিল করে।

কমলা-ঘটনা বেশ ফলাও করে ছাপা হয় পরদিনের খবরের কাগজে। নানান দিক থেকে আসে যশদেবের উদ্দেশে অভিনন্দন। আর কমলা? তার স্থান হয় এক অনাথ-আশ্রমে, কেননা তার কাজ মিটে গিয়েছে। শরিতার কাছেও তার নিজের ক্রীতদাসী-অস্তিত্ব ক্রমে প্রকাশ পেতে থাকে, সে জানায় তার নিজস্ব বিবেদ্রাহ। আর, এরই ফাঁকে খবর আসে—এক গোপন আস্তানায় হানা দিতে গিয়েছিল যশদেব, যেখানকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের মাথাওয়ালা সব চাঁই, পুলিশ-কর্তৃপক্ষ আর সংবাদপত্রের মালিকেরা। তাই যশদেবের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার দুঃসংবাদে নাটক শেষ হয়। সমস্ত কিছু ঘটনার নীরব সাক্ষী থাকেন কাকাসাহেব। স্ত্রী শরিতা তাঁর নিজস্ব বিদ্রোহ বুকে নিয়ে, হুইস্কির ঝোঁকে ঘুমন্ত স্বামীর পাশে বসে থাকে।

এই হল মোটামুটি আখ্যানভাগ। হয়তো সেই অর্থে এই ধরনের কাহিনীতে অভিনবত্ব কিছু না থাকলেও, ধীরে-সুস্থে সংলাপের পর সংলাপে, বলিষ্ঠ বক্তব্যের জোরদার উচ্চারণে নাট্য-ঘটনা-বিন্যাস এই সময়ের একটি অনন্য রচনা হিসেবে আমাদের সামনে আদর্শ হয়ে থাকে। যেমন কাহিনীতে, তেমনি অভিনয়েও অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে কেউ মোটেই ঝোঁকেন নি—না অভিনেতা, না কাহিনীকার। মঞ্চসজ্জাও ভয়ানক বাস্তবানুগ। আর অভিনেতারা তো সবাই চেয়েছেন কতটা নিখুঁত বাস্তবের চেহারা তাঁরা ধরে দিতে পারেন দর্শকদের তাঁদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ফলে, রঙচঙে এই জৌলুস-মার্কা মঞ্চে, অভিনেতাদের সেলুলয়েড-ধাঁচের অভিনয় দেখতে-দেখতে, মাঝে-মাঝেই বিভ্রম জাগে—এ তো কোন সিনেমা দেখছি না বসে? তফাত এই যে, আমাদের সামনে ঘোরাফেরা করছেন জীবন্ত মানুষেরা, যদিও তাঁদের উপস্থিতি বড়োই ফটোগ্রাফিক!

শহুরে-গাথার সঙ্গে অভিনয়ের মাধ্যমে একবার পরিচিত করে দিয়েছিলেন ইয়োশি ওইদা। পিটার ব্রুক-এর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করেছেন এই জাপানি অভিনেতাটি। তাঁর খ্যাতকীর্তির সঙ্গে পরিচিত অনেকেই। রোম শহরে থিয়েটার ত্রাস্তেভেরে-তে কিছু নব্য যুবক-যুবতীদের নিয়ে একবারে তাঁকে পরিচালকের ভূমিকায় নামতে হয়েছিল। নামতে হয়েছিল না বলে বলা উচিত—নেমেছিলেন। তাই লোভ হয়েছিল ভয়ানক, পরিচালকের ভূমিকায় তাঁর ক্রিয়াকলাপ দেখতে।

ইয়োশি ওইদাও বেছেছিলেন এক শহুরে গাথা। পোশাকে, মঞ্চে, অভিনেতাদের কেতাদুরস্ত অভিনয়ে তিনিও এনেছিলেন বাহারি আভিজাত্য। আর এই-সমস্ত রিয়লিস্টিক সম্পদের মধ্যে তিনি মজা করে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাবস্ট্রাকশনের অদ্ভুত মহিমা। কিছুই না, অভিনেতাদের প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন একটি করে বিশেষ বস্তু (অবজেক্ট)। কারুর হাতে ছল্লা, কারুর হাতে বা খেলনার সাপ অথবা মোমদান। রিয়লিটির প্রখর প্রাচুর্যে ওই-সমস্ত অবজেক্টগুলি নিয়ে এসেছিল ভিন্ন আর-এক মাত্রা। এমনকি, আপাতদৃষ্টিতে ওই অবজেক্টগুলিও খুব দুর্লভ দর্শনযোগ্য নয়। সাদামাটা দৈনন্দিন সেই-সমস্ত বস্তু, অথচ সমস্ত সময় ধরে নাটকে তারাই যোগ ক'রে গেছে অভিনেতাদের প্রায়-নিখুঁত-বাস্তবসম্মত অভিনয়ে, অতিরিক্ত অন্য কিছু। শেষমেষ তাই ইয়োশি ওইদার নাটক দেখতে বসে গুলিয়ে ফেলি না—কোনো নাটকের সেলুলয়েডীয় মঞ্চরূপ এ নয়। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া—সিনেমা নয়, এ এক অন্য মাধ্যম, আমাদের সামনে উপস্থিত জ্বলজ্যান্ত কিছু লোক। হয়তো সেই অবজেক্টগুলি আর কিছুই নয়, প্রবেশদ্বার মাত্র। জীবন্ত-উপস্থিত অভিনেতাদের দিকে আরও মনোযোগী হবার জন্য। তাঁদের শরীরী উপস্থিতি আরও বেশি হাতছানি দেয় আমাদের।

'কমলা'য় অভিনেতার সংখ্যা বেশ কম। ছয়জন সাকল্যে। তার মধ্যে কমলা এবং পরিচারিকার (কমলারই) মঞ্চে উপস্থিতি বেশ গৌণ। বাকি চারজন অভিনেতা সারাক্ষণ বেশ দাপটেই অভিনয় করে গেছেন। তবে ওই—বড়ো বেশি সিনেম্যাটিক। তাই 'কমলা'কেই সবচেয়ে বেশি বিসদৃশ লাগছিল। একজন আদিবাসী মেয়ে—যে গায়ে-গতরে খেটে অভ্যস্ত, ছেঁড়া-ফাটা শাড়ির আড়ালে লাবণ্যময় শরীরে, ছন্দের হিল্লোল তুলে নড়াচড়া ভয়ানক চোখে লাগে। উচ্চারণেও আধো-আধো সাংগীতিক বোল। আর হয়তো শেষ পর্যন্ত যে মারাত্মক সমস্যা হাজির করতে চেয়েছিলেন বিজয় তেন্দুলকর—পুরুষশাসিত এ সমাজে নারী-মর্যাদার অবশিষ্টটুকুও নেই—সেটি যথাযোগ্যভাবে প্রকাশিত হয় না। হয় না, কারণ 'কমলা' যে শুধুমাত্র একজন আদিবাসী রমণীমাত্রই নয়, একটি জ্বলন্ত অভিযোগের নাম, তার নামমাত্র উপস্থিত-মুহূর্তগুলি ঠিকমতো পেশ করতে পারেন নি পরিচালক। আড়ালে থাকলেও এই নাটকের মূল কেন্দ্রশক্তি ওই কমলাই। অভিজাত ওই বিন্যাসে সে ছুঁড়ে দিতে পারত রূঢ়, কঠিন সত্যগুলি। পরিবর্তে ললিতলবঙ্গলতার মতো উপস্থিতি দর্শকদের মধ্যে খানিক সমবেদনা আনলেও, এই কাহিনীর মূল সত্য থেকে অনেকদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এদেশের পরিচালকেরা হয়তো এখনও কোনো অভিনেত্রীকে কতটা মোহন-মেদুর করে তোলা যায়, তাই নিয়েই মাথা ঘামান অনেক বেশি, এমনকি 'কমলা'র মতো নাটক নিয়ে অভিনয়ের কথা চিন্তা করলেও।

শুধু 'কমলা'তেই নয়, ঐ একই প্রয়োচনার ছাপ দেখা গেল 'নূরলদীনের সারা জীবন'-এ। যদিও নাটকে প্রধান পাত্র একজন গ্রাম্যপুরুষ, নূরলদীন। কুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধে সে সংগঠিত করছে দেশের মানুষদের। তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংগঠনের প্রস্তুতি, ক্ষমতার সিংহাসন থেকে নিজেকে দূরে রাখবার বাঞ্ছা নাটকটিতে আগাগোড়া প্রতিফলিত হয়েছে। দুইজন নারী-চরিত্র আছে এই কাব্যনাটকটিতে। কোম্পানি ফ্যাক্টর থমসনের স্ত্রী লিসবেথ (এলিজাবেথ) আর নূরলদীনের স্ত্রী আমরিয়া।

কঠোর সংগ্রামী ঐ নূরলদীনের স্ত্রী আমরিয়া কিন্তু সেই একই মোহন-মেদুর নারী। যদিও লিসবেথ খানিকটা জোরগলায় জানিয়েছে ইংরেজ সরকারের বড়ো সাহেবদের আদত রূপটি। মশা-মাছি-সাপ-খোপের এই দুর্গম বাঙলাদেশে তারা পাঠায় নানান অভিজাত পুরুষদের, কোম্পানির দায়িত্ব দিয়ে। সরকারের সাম্রাজ্য-বিস্তারের লালসায়, ওইসমস্ত কোম্পানির নব্য-পরিচালকরা নিজেদের বিদ্যে-বুদ্ধি খাটিয়ে ক্রমশ আগ্রাস করে নেয় অঞ্চলের পর অঞ্চল। আর তাদের স্ত্রীরা লনডনের বিলাস-বহুল জীবন ছেড়ে এই দূর-দুর্গম দেশে পাড়ি দিয়েছেন, সাহচর্য দিচ্ছেন পরিশ্রমী স্বামীদের। কিন্তু তাঁদের এই আত্মত্যাগের কথা কি ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে?

অথচ আমরিয়া? নয়ন-লোভন নাচে বা গানে দর্শকদের আকৃষ্ট করতেই তার মঞ্চে আবির্ভাব। অন্য সময়ে সে এক বিহ্বল অজানা-আশঙ্কায় কেঁপে ওঠা নারী! তারও ভঙ্গিতে ললিত-লবঙ্গলতার ছাপ; অথচ 'নূরলদীনের সারা জীবন' নাটকটির মধ্যে সর্বক্ষণই রয়েছে এক পৌরুষদীপ্ত মেজাজ, যেহেতু এই নাটকটি সেই বিদ্রোহী চরিত্রটিকে নিয়েই, যার নাম নূরলদীন।

'কমলা'র তুলনায় 'নূরলদীনের সারা জীবন'-এ অভিনেতার সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি। তাই সংলাপে 'অ্যাক্টর টু অ্যাক্টর' বা স্বগত কথনের চেয়ে পরিচালকের 'কোরাল এফেক্ট' আনার ঝোঁকই বেশি। সময়ে সময়ে এই 'কোরাল এফেক্ট'-এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের ছড়ার ছন্দে মজা আনতে চেয়েছেন পরিচালক।

এই দুই নাটকের রচনাগুণের উল্লেখ করে এই লেখা শুরু করেছিলাম। সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক এবার। বলাই বাহুল্য, শুধুমাত্র রচনাবিন্যাসের কথা ভাবলে ঐ দুই নাট্যকারকে অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে হয়। কিন্তু আমরা তো আর বাড়িতে বসে দুইটি নাটক পড়ছি না, দেখতে গেছি তার অভিনয়। সুতরাং প্রশ্ন আসবেই নির্দেশক-অভিনেতাদের উপরও, কতখানি দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁরা?

আর সেখানেই একটু হোঁচট খেতে হয় আমাদের। আবহ-সংগীত, আলো, মঞ্চ ইত্যাদির সমাহারে নাটক যে শুধুমাত্র একটি 'প্লাস্টিক আর্ট'-মিডিয়াই নয়, অন্তত এই মুহূর্তে সেই সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সময় এসেছে আমাদের। নাটকের প্রাণপ্রতিমা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের 'কাঠের-পুতুল-মাফিক' উপস্থিতি আর কতকাল মঞ্চে দেখতে হবে আমাদের? স্টেজ-দাপিয়ে অভিনয় করার প্রবণতাটিও চলে যাচ্ছে আজকাল, শিল্পিত সংযমের ছদ্ম-আড়ালে। আর তাই, বাহারি পোশাকের আড়ালে, ত্বকের জীবন্ত আলোড়ন কখনো-কখনো ঝলক দিয়ে দেখা দিলেও, তা মুহূর্তমাত্র। 'কমলা' বা 'নূরলদীনের সারা জীবন' দুটিতেই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম 'চরিত্র' কিভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে অভিনেতাদের। নির্দেশকের তালিমে সেটিই আস্তে আস্তে স্বীকার ক'রে নিচ্ছেন অভিনেতারা। শেষমেষ তাই হল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের খেয়ালে থাকে বিজয় তেন্দুলকর বা সৈয়দ সামসুল হকের নাম ও কৃতিত্ব-নৈপুণ্য, অন্যান্যদের তাঁদেরই আজ্ঞাবাহী দূত ছাড়া বিশেষ কোনো বিশেষণ মনে পড়ে না।

দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

সিনেমা

বাঙলা সিনেমার সংকট : আজকের তরুণ পরিচালকদের চিন্তাভাবনা

গত দশ বছরে বাঙলা সিনেমার কৌলীন্য বেড়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। কিছু প্রবীণ পরিচালকের কয়েকটি ছবির আর্থিক সাফল্য, আর সেইসঙ্গে কিছু তরুণ পরিচালকের ছবির রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্তিতে অনেকের মনেই এ ধারণা জন্মেছে যে, বাঙলা চলচ্চিত্রের মৃতপ্রায় শরীরে নতুন জোয়ার এসেছে। কেউ কেউ আবার এই ব্যাপারটাকে বাঙলা সিনেমায় 'থার্ড ওয়েভ' বা 'তৃতীয় তরঙ্গ' বলে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন। একটু মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক।

আসলে, বাঙলা সিনেমা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। কথাটা শুনলে বেশির-ভাগ মানুষই উষ্মা প্রকাশ করবেন, হয়তো কিছুটা বিরক্ত হবেন। কিন্তু কথাটা সত্যি। এখনকার বাঙলা সিনেমার উন্নতি বলতে সাধারণত যেটা বলা হচ্ছে তা হল এর বাইরের সাময়িক একটা চাকচিক্য; এটি কোনোভাবেই স্থায়িত্বের স্বাস্থ্য নিয়ে আসে নি। প্রায় গত দু দশক ধরে বাঙলা সিনেমার সংকট নিয়ে নানা আলাপ-আলোচনা, বহু তর্ক-বিতর্ক হয়েছে; সেমিনারে সংবাদপত্রে সাময়িকপত্রে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, পক্ষে বিপক্ষে বহু মতামত আমরা শুনেছি। কিন্তু কার্যত সমস্যার সমাধান বা সংকট-উত্তরণের কোনো সদর্থক সূত্র বেরিয়ে আসে নি। তার কারণ, সংকটের উৎস সম্পর্কেই অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত। সিনেমা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষ আজ অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। অনেকেই হতাশ। এ কথা নির্দ্বিধায় সত্য যে একজন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক বা একজন মৃণাল সেনকে দিয়ে বিরাট বাঙলা সিনেমাকে বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখা যায় না।

টালিগঞ্জের স্টুডিও-পাড়ায় যাঁদের মোটামুটি যাতায়াত আছে, কলাকুশলীদের সঙ্গে যাঁদের কিঞ্চিৎ যোগাযোগ আছে, খুব ভালো করেই তাঁরা জানেন যে সিনেমার সঙ্গে জড়িত শিল্পকর্মীদের কেউই বাঙলা সিনেমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব একটা আশাবাদী নন। অথচ গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটা বাঙলা ছবি সর্বভারতীয় আসরে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘরে এনেছে। বেশ কিছু তরুণ পরিচালকের বাঙলা ছবি পুরস্কার পেয়ে বাঙলা সিনেমার সম্মান বাড়িয়েছে। কিন্তু আদতে তার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী, এ কথা কেউ ভেবেছেন কি? সারা বছরের সামগ্রিক প্রযোজনার অনুপাতে এইরকম এক-আধটা সরকারি পুরস্কার মুমূর্ষু বাঙলা সিনেমাকে কিভাবে আর কতটা নবজীবন দান করবে সে ব্যাপারে কেউ কিন্তু কোনো আলোকপাত করেন নি।

সংকটের কথা সকলেই বলেন, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক, সেই সঙ্গে পরিচালকরাও সমস্যার ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তিত। অনেক সময় অভিনেতারাও নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে সমস্যার জন্য দর্শক এবং অপরপক্ষকে দায়ী করেন। তা ছাড়া, চলচ্চিত্রনির্মাণের নেপথ্য-কর্মীদের জীবন তথা জীবিকার প্রাত্যহিক সমস্যার কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু গত এক দশকের বেশি বাঙলা সিনেমার নানা সমস্যা নিয়ে জটিল এবং ভারি-ভারি আলাপ-আলোচনার শেষফল শূন্য। আসলে, প্রত্যেক পক্ষই বিপরীত গোষ্ঠীর অনীহা, বুদ্ধিহীনতা আর সস্তা ব্যবসায়িক মনোভাবকেই দায়ী করছেন। মূল ত্রুটির প্রতি কেউই ইঙ্গিত করছেন না।

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন তরুণ চলচ্চিত্রকার তাঁদের উন্নত মানের ছবি তৈরির চেষ্টা করেছেন। এটা অন্তত তাঁদের দাবি। উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, সৈকত ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বিপ্লব রায়চৌধুরী—এঁদের প্রত্যেকের ছবিই চলতি বাঙলা সিনেমার গোত্র থেকে ভিন্ন।

উৎপলেন্দুর প্রথম কাহিনীচিত্র 'ময়না তদন্ত' 'রজতকমল' পুরস্কার পেয়েছে। ছবিটি আর্থিক সাফল্য কিন্তু পায় নি। তুলনায় তাঁর দ্বিতীয় কাহিনীচিত্র 'চোখ' অনেক বেশি আর্থিক সফলতা পেয়েছে। 'চোখ' ছবিটি রঙিন বলেই যে এটা ঘটেছে, তা কিন্তু নয়। আসলে, চোখের শিল্পগত সুষমা এবং সামগ্রিক আবেদনের মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা, যে সংহতি আছে, দর্শকদের সেটি আকৃষ্ট করেছে—সেটি 'ময়না তদন্তে' ছিল না।

দেশী বিদেশী পুরস্কার-প্রাপ্ত বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের দ্বিতীয় কাহিনীচিত্র 'নিমঅন্নপূর্ণা' আর্থিক দিক থেকে খুব ব্যর্থ। তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র 'দূরত্ব' তবু কিছুটা চলেছে। বুদ্ধদেবের প্রিয় সৃষ্টি তাঁর তৃতীয় ছবি 'গৃহযুদ্ধ'—এর ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে তিনি বেশ কিছুটা আশাবাদী। এটিও রঙিন ছবি। আমরাও মনে করি, ছবিটি তাঁর আগের দুটো কাজের তুলনায় বেশি জনপ্রিয় হবে। এর কারণ, এ ছবিতে বুদ্ধদেব আজকের রাজনীতি-চেতন আধুনিক যুবমানসের অস্থিরতা, তাদের হতাশা আর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যবোধটিকে সুন্দরভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি, ছবিটির নির্মাণপদ্ধতির মধ্যে একধরনের সুগ্রথিত বিন্যাস আছে যা— আমাদের বিশ্বাস—সংখ্যাধিক দর্শকের ভালো লাগবে, কেননা ছবির বিষয়টিও তাঁর সিনেমায় ঠিক এইভাবে আসে নি।

বিপ্লব রায়চৌধুরী তাঁর 'শোধ' নামে হিন্দি ছবি করে পুরস্কার পেয়েছেন এবং পরিচালক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর প্রথম বাঙলা ছবি 'বর্ণ বিবর্ণ' এখনো মুক্তি পায় নি। 'শোধ' তাঁর তৃতীয় ছবি। মাঝে 'চিলকাতীরে' নামে একটা ওড়িয়া ছবি করেন। এর পর আবার বাঙলা ছবি নির্মাণ করেন 'মহাপৃথিবী'। মধ্যে আর-একটি হিন্দি ছবি শেষ করেছেন 'অজন্মা' নামে। এর কাহিনী তিনি নিয়েছেন কল্যাণ মজুমদারের 'ঝুলঝাম্পি' থেকে। তাঁর তৃতীয় বাঙলা ছবি 'রাধাকৃষ্ণ'-র কাজ শেষ হয়ে এসেছে। বিপ্লববাবু মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে ছবি করতে আগ্রহী। কিন্তু তাই বলে দুঃখ ব্যাপারটা খুব বেশি পরিমাণে ছবিতে রাখার পক্ষপাতী নন তিনি।

'দখল' করার পর গৌতম ঘোষ সমরেশ বসুর 'পাড়ি' গল্প নিয়ে একটা হিন্দি ছবির কাজ দ্রুত শেষ করেছেন। তাঁর প্রথম কাহিনীচিত্র কৃষাণ চন্দরের 'যব খেত জ্বলে' গল্প অবলম্বনে তৈরি তেলুগু ছবি 'মাভূমি।' তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পটভূমিতে তৈরি এ ছবিতে কাজ করে গৌতম নিজে খুব আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা আর সুনাম হয় দ্বিতীয় কাহিনীচিত্র রঙিন ছবি 'দখল' দিয়ে। বাঙালি দর্শকদের প্রতি গৌতম কিন্তু আস্থাবান। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে তাঁর ছবিতে যদি দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করার মতো সত্যি কোনো গুণ থাকে তবে তা গ্রহণ করার মতো দর্শকের অভাব হবে না। তবে তাঁর 'দখল' ছবি এখনো মুক্তি পায় নি। শুধু 'দখল'ই নয়, বিপ্লব রায়চৌধুরীর 'মহাপৃথিবী', 'বর্ণ বিবর্ণ', সৈকত ভট্টাচার্যের 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', জোছন দস্তিদারের 'প্রাগৈতিহাসিক', গৌতম গুপ্তের 'বন্দুকবাজ', নীতিশ মুখার্জীর 'রবিবার' ইত্যাদি অনেকগুলো ছবি এখনো মুক্তির আলো দেখে নি।

এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ছবিই সরকারের আর্থিক সাহায্যে প্রস্তুত। কোনো-কোনোটির প্রযোজনার পুরো দায়িত্বটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করেছেন। কিন্তু এখনো পশ্চিমবঙ্গে পুরোপুরি সরকারি তত্ত্বাবধানে কোনো হল না থাকায় ছবিগুলো মুক্তি পাচ্ছে না। ফলে দর্শকরা এই ছবিগুলিকে কিভাবে গ্রহণ করবেন তা বোঝা যাচ্ছে না। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রসঙ্গত এমন মন্তব্যও করেছেন যে, এ রাজ্যে বাম রাজনীতি কেবল পার্টি-ব্যানার আর এক ধরনের ভোট-মানসিকতার জন্ম দিয়েছে, প্রকৃত সাংস্কৃতিক চেতনা উন্মেষের প্রতি তার ততটা নজর নেই। তাই ভালো বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করেও দর্শকমহলে তা চলবে কি না, তা নিয়ে তরুণ পরিচালকদের দ্বিধাগ্রস্ত থাকতে হয়। এটা সুস্থতার লক্ষণ নয়।

কিন্তু প্রসঙ্গত একটা বিষয় কেউ উল্লেখ করছেন না। তা হল বাঙলা সিনেমার ন্যূনতম একটা পরিচ্ছন্নতা। সব তরুণ পরিচালকদেরই অভিযোগ যে কুরুচিপূর্ণ, নীতিহীন, অশ্লীল হিন্দি ছবিতে এ রাজ্য ছেয়ে গেছে। এবং তা রমরমিয়ে বাণিজ্য করছে। তাঁদের মতে, উড়িষ্যায় যেমন বাধ্যতামূলকভাবে ওড়িয়া ছবি দেখাতে হবে বলে মালিকদের ওপর সরকারি নোটিস দেওয়া হয়েছে, এ রাজ্যেও সেটা চালু করা দরকার। একবার এ ব্যাপারে একটা আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু কার্যত কিছুই হয় নি। তা ছাড়া, সরকারি ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারেও কিছু সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপার আছে। গুজরাতে, দক্ষিণভারতে ছবির মুক্তির পর ছ মাস সরকার কোনো ট্যাক্স নেন না। এটাও এখানে চেষ্টা করা যেতে পারে। তা ছাড়া, আগে হলের মালিকরা পরিবেশকদের 'গ্যারান্টি মানি' হিসেবে কিছু টাকা দিতেন। এখন সেটা উলটে গেছে। এখন হলের মালিকরাই পরিবেশকদের কাছ থেকে ছবি চালানোর জন্য 'প্রোটেকশন মানি' বাবদ টাকা আদায় করে নেন। অর্থাৎ কোনো ছবি না চললে হল-মালিকদের কিছু আসে যায় না। ক্ষতিগ্রস্ত হন পরিবেশকরা।

আমাদের বাঙালি চিত্রপরিচালকেরা একটা কথা ভুলে যান—বাঙলা সিনেমা বিশেষ অর্থেই 'আঞ্চলিক সিনেমা'। হিন্দি সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার পরিকল্পনা তাকে ত্যাগ করতে হবে। হিন্দি সর্বভারতীয় স্তরের ভাষা। সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে তার পাশে স্বকীয় মর্যাদায় এবং বলিষ্ঠতায় ব্যাবসা করতে হলে বাঙলা সিনেমাকে আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সুস্থ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ছবি করতে হলে যে ন্যূনতম বুদ্ধিমত্তা, সমাজসচেতনতা এবং বাস্তববোধ থাকা প্রয়োজন, সবচেয়ে আগে সেটার প্রতি নজর দিতে হবে। এমন অনেক নবীন পরিচালক ছবি করতে যাচ্ছেন যাঁরা কিছু বিদেশী ছবি দেখে তার পরিপূর্ণ রসগ্রহণ করতে না পেরে এক ধরনের কিম্ভূত-মার্কা ছবি তৈরি করছেন। প্রসঙ্গত, অঞ্জন দাসের 'সৈনিক' ছবির কথা মনে পড়ে। ছবিটি এক বিশেষ প্রদর্শনীতে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। মুক্তি পাবার পর ছবিটি কজন দেখেছেন হাতে গুনে বলা যায়। পরিচালক এক্ষেত্রে দর্শকদের দোষ দেবেন। কিন্তু খাঁটি চলচ্চিত্রের গুণ বলতে যা বোঝায় তার কোনোটিই কি ছবিতে ছিল? পরিচালক নিশ্চয়ই সে কথা ভেবে দেখেন নি।

সুপ্রযোজকের অভাব, পরিবেশক আর প্রদর্শকদের মুনাফার লোভ, নতুন হলের অভাব, সস্তা হিন্দি ছবির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ইত্যাদি নানা সমস্যা তো আছেই। কিন্তু বাঙলা সিনেমার ক্রম-অবনতির কারণ সম্পর্কে কেউ কিন্তু কোনো মৌলিক প্রসঙ্গের কথা বলছেন না। গোটা পঞ্চাশের দশক ধরে এবং ষাটের দশকের প্রথমেও বেশ কিছু বাঙলা ছবি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তার সব কটিতেই যে উত্তমকুমার-সুচিত্রাসেনের মতো জনপ্রিয় শিল্পীরা ছিলেন, এমন নয়। আসলে, মোটামুটিভাবে ছবিতে গুছিয়ে গল্প বলার ব্যাপার ছিল। ইদানীং অনেক নবীন চিত্রপরিচালক ছবি করতে এসে টালি-

গঞ্জের স্টুডিও-পাড়ার সেকেলে যন্ত্রপাতি, অকেজো সরঞ্জামের দোহাই পাড়েন। কিন্তু এই নড়বড়ে যন্ত্রপাতি দিয়েই সত্যজিৎ-ঋত্বিক তাঁদের সব-কটি ছবি করেছেন। অনেক তরুণ পরিচালক প্রথম ছবিতেই পরীক্ষানিরীক্ষার অভিলাষী। সেটা আনন্দের কথা। কিছুটা দুঃসাহসেরও পরিচয় দেয়। কিন্তু চলচ্চিত্র এমনই এক শিল্প-মাধ্যম যে সেটা কেবল নিজের জন্য করা যায় না। এর সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের ভালোলাগা-মন্দলাগা, অসংখ্য টাকার লগ্নি আর অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে আছে। সে-ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা কতটা সিনেমাধর্মী এবং কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, সেটা পরিচালককে কিছুটা অনুমান করতেই হয়। দর্শককে একেবারে নির্বোধ ভাবাও যেমন ঠিক নয়, তেমনি যে-কোনো এক্সপেরিমেন্টই দর্শক বুঝে নেবেন, এমন আশা করাটাও সমীচীন নয়।

সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালকও একবার মন্তব্য করেছিলেন যে ছবিতে একটা কিছু কমিউনিকেট করা চাই। এবং সেটা গল্পের কাঠামোয় সিনেমার স্বকীয় ভাষাতেই করতে হবে। সিনেমার গল্প বলার স্টাইলটা জানতে হবে। তার ওপর ভিত্তি করেই পরিচালককে নতুন নতুন আঙ্গিক ভাবতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য ভালো এবং ব্যাবসা-সফল ছবিতেও কাহিনী-বিন্যাসের একটা সুন্দর টেকনিক আমরা বারবার লক্ষ করছি। তথাকথিত জোলো বাঙলা ছবির সাদামাটা চিত্রনাট্য আমরা কখনোই চাই না। আদতে ছবির জন্য একটা সুবিন্যস্ত চিত্রনাট্য চাই যার মধ্যে সিনেমার দৃশ্যসংহতি, ঘটনাগ্রন্থি এবং বিষয়বস্তুটা চলচ্চিত্রের নিজস্ব ভাষায় আর ব্যাকরণে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারে এবং সেইসঙ্গে তা মোটামুটি বোধগম্য হয়। দুর্বোধ্য ছবির জটিল টেকনিকে লোককে বোকা বানিয়ে সিনেমায় সফল হওয়া যায় না। অন্তত আমাদের দেশের বিখ্যাত পরিচালকদের কেউই সে চেষ্টা করেন নি।

প্রাথমিক শর্তেই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে নতুন একটা কিছু করতে হবে, বা প্রচলিত রীতি থেকে সরে এসে স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর চেষ্টা—এগুলোই যদি নবীন পরিচালকদের একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে বম্বের আজকের অনেক ঝকঝকে হিন্দি ছবিও উচ্চ উন্নত শিল্পমানের দাবি করতে পারে। কেননা, শুনতে খারাপ লাগলেও একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বাঙলা সিনেমার তুলনায় ভারতীয় আঞ্চলিক চলচ্চিত্রে যে রীতিবিরুদ্ধতা এবং নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে সেটা সংখ্যায় অনেক বেশি। তর্কটা কিন্তু সেখানে নয়। আসলে দেখতে হবে পরিচালক যে বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করছেন তা আমাদের এখনকার সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে কতটা জরুরি, কতটাই বা তা বস্তুসত্য-আশ্রিত। কী বলছি, কেন বলছি, এবং কেমনভাবে বলছি—এটা আজকের আধুনিক সিনেমার পক্ষে একান্তভাবে ভেবে দেখার কথা।

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী অপর্ণা সেন তাঁর প্রথম ছবি 'থার্টিসিক্স চৌরঙ্গী লেন' নির্মাণ করে প্রমাণ করেছেন যে কেবল অভিনয়ই নয়, আধুনিক সিনেমার মাধ্যমটিও যথেষ্ট পরিমাণে তাঁর দখলে। ছবিটি সত্যিই সুনির্মিত। কিন্তু ছবির বিষয়বস্তু ঠিক আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের আজকের সাধারণ চেহারাটা তুলে ধরে না। কারণ অপর্ণার বিষয়বস্তুটাই একেবারে ভিন্ন এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই বিষয়ে আগে ছবি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। বাঙালি সমাজ-জীবনের চিত্র না থাকলেও নির্মাণগুণে তাঁর এই ইংরেজি ছবিটা দারুণভাবে সফল হয়েছে। এরপর অপর্ণা কমলকুমার মজুমদারের 'মোতিলাল পাদরি' গল্পটি নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন। সেটা ফলপ্রসূ হয় নি। এখন তিনি 'পরমা' নামে একটি বাঙলা ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। অপর্ণার কাছে আমাদের অনেক আশা আছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, অপর্ণা মর্মে মর্মে বিশ্বাস করেন যে আমরা শিল্পের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থার যে বদলটা চাইছি সেটা নিতান্তই আমাদের বাইরের ব্যাপার। আসলে আমাদের ভেতরকার পরিবর্তনটা এখনো সাধিত হয় নি। স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল, অথচ আমাদের মানসিক অবস্থা তথা তাবৎ মানবিক চিন্তাচেতনার বিশেষ কোনো পালাবদল ঘটে নি। মূল্যবোধ এখনো সেই চল্লিশ বছর আগের যুগেই আটকে আছে। অপর্ণার এই ধরনের প্রবণতার প্রতি আমরা খুব কৌতূহলী। যদি তিনি তাঁর এই স্বকীয় বোধ এবং চেতনাকে ছবির মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারেন তবে আশা করা যায় বাঙলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কোনো একটা নতুন ইঙ্গিত বেরিয়ে আসবে।

নানা প্রসঙ্গের শেষে যে কথাটা বলা বিশেষ প্রয়োজন তা হল, আজকের তরুণ পরিচালকদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী কয়েকটি সূত্র মনে রেখে কাজে নামলে, আমাদের মনে হয়, বাঙলা সিনেমার পাঁচমিশেলি সমস্যার অনেকটা সুরাহা হবে। প্রথমত, অল্প বাজেটের বুদ্ধিসম্পন্ন বাঙলা ছবি তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ ছবিতে সমাজ-জীবনের বস্তুসত্য থাকবে। দ্বিতীয়ত, সিনেমার আঙ্গিক সম্পর্কে পরিচালকের যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। কোন্ বিষয়বস্তু কোন্ শিল্পশৈলীর অনুষঙ্গী, সেটা প্রথমেই স্থির করতে হবে। তৃতীয়ত, অকারণ দুঃখবোধ, হতাশা আর সামাজিক সংকটের বাড়াবাড়ি তুলে ধরে ছবিকে ভারাক্রান্ত করে দর্শক-সহানুভূতি আদায় করার চলতি প্রবণতা ত্যাগ করা দরকার।

আসলে আজকের বাঙালি সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনীতির পালাবদল ইত্যাদির জটিলতা গত তিরিশ বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। তাই তরুণ পরিচালকদের দায়িত্বও সেক্ষেত্রে অসীম। কেননা সিনেমা-মাধ্যমের বিরাট জটিলতার জন্যই দর্শকের প্রতি, বিষয়ের প্রতি, মাধ্যমের প্রতি এবং সেইসঙ্গে নিজের প্রতি দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেছে। ধারকরা অনুভূতি বা 'সেকেন্ডহ্যান্ড এক্সপীয়রিয়েন্স' নিয়ে, আর যাই হোক শিল্প হয় না। সিনেমা তো নয়ই। মনে রাখা দরকার, বাঙলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট গল্পের অভাব নেই। বাঙলার সামাজিক জীবন-ইতিহাসের ব্যাপ্তিতেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এই সমস্ত-কিছু চিন্তা-চেতনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নিটোল ছবি করতে পারলে দর্শকসাধারণ তা গ্রহণ করতে বাধ্য। বাঙলা সিনেমায় এর প্রমাণও আমরা একাধিকবার পেয়েছি।

এ কথা আমরা বিশ্বাস করি যে, চিত্রপরিচালকের ভূমিকা সমাজ-সংস্কারের নয়। তিনি রাজনৈতিক নেতার মতো ছবির মধ্য দিয়ে কোনো প্রত্যক্ষ সমাধান দেবেন না। কোনো পোলিটিক্যাল সলিউশনের জন্য তিনি কোনো পথ বাতলে দেবেন না। কিন্তু কমপক্ষে তাঁর ছবি থেকে যেন সাধারণ দর্শকসমাজ তাঁদের নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনজীবিকার টানাপোড়েন, তাঁদের বহুবিধ সমস্যা, তাঁদের মূল্যবোধের পরিবর্তনটা চিনে নিতে পারেন। পরিচালকের বোধবুদ্ধি, মানসিকতা আর শিল্পঅভিজ্ঞান যেন আমাদের মানবিক চেতনার উত্তরণ ঘটায়। এটাই কাম্য। যিনি একাজে সফল হবেন তিনি বাঙলা সিনেমার ব্যাবসাজগতেও লক্ষ্মীর কৃপা-লাভ করবেন।

সোমেন ঘোষ

চিত্রকলা

রবীন মণ্ডলের মহাপৃথিবী

রবীন মণ্ডল তাঁর তুলি কালি কলম আর মননের সাহায্যে ক্যানভাসে এমন এক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেন—তার নাগাল পেতে গেলে হৃদয়-মন-চোখকে একটু টান-টান করতে হয়। কেননা

বিষয়বস্তুর নির্বাচন, রঙের এবং বক্তব্যের পরিমিত যোগসাধন তাঁর ছবিতে ভিন্ন মাত্রার, ভিন্ন খাতের সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিন তিনি এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। স্বভাবতই, পরিণত থেকে আরো পরিণত তিনি। তা সত্ত্বেও, চেনা পরিচিত আঙ্গিকের আবর্তে শিল্পী যেন ঘুরপাক খাচ্ছেন। আমার মনে হয় এবার তাঁর বের হয়ে আসা প্রয়োজন। জল কেটে যেমন বেরিয়ে আসে তিমি।

১৯৬২-১৯৮৩ পর্যন্ত তাঁর চিত্রকলার পূর্বপর প্রদর্শনীতে (বিড়লা আকাডেমী/২-১৩ মে ১৯৮৪) অবশ্য সব ছবি ছিল না। সম্ভবও নয়। যেসব ছবি ছিল তা দিয়েই কক্ষ ছিল একান্তই রবীন মণ্ডলের পূর্ণ প্রাণের মহাপৃথিবী। তিনি এমন এক আশ্চর্য বোধের শিল্পী যিনি সমানভাবে চিন্তিত মানুষ-জন, রাজারানী, সুখ-অসুখ, তথা অন্যান্য পার্থিব-অপার্থিবতা নিয়ে। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু পটে প্রথমে গড়ে ওঠে স্কেচ বা ড্রয়িং হয়ে। তারপর ব্রাশ আর রঙের ঘাতপ্রতিঘাতে ছবির পরিপূর্ণতা, কখনো আসল চেহারাকে ছাপিয়ে ওঠে না। এই ড্রয়িং-নির্ভরতাই তাঁকে আজ বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। শিল্পীর কিছু

তালিকাবহির্ভূত সাদা-কালো ড্রয়িং আর স্কেচ ছিল প্রদর্শনীর মহার্ঘ সংযোজন।

'ক্রশিং দ্য বর্ডার' সিরিজে অনুভূতির তীব্রতা ফুটে ওঠে। পলায়নপর ভয়ার্ত মানুষ-জনের সীমান্ত পার হয়ে আসার কাহিনী পরিবেশিত হয় বৃত্তাকার রেখায়। মোটা ব্রাশের সজোরে-আছড়ে-পড়া টানে যন্ত্রণাঘন আবেশের সৃষ্টি হয় মুহূর্তের মধ্যে।

শিল্পীর প্রিয় বিষয়ের অন্তর্গত 'রাজা'। এই রাজা উলঙ্গ। কখনো আদিম পোশাকে। সরু লিকপিকে হাত। রাজার মুখে পরিস্ফুট হয় বেদনা, চোখ নিরাসক্ত। সে কি শুধুই যন্ত্রণা! এই রাজা যেন পুরাতন রাজ-কাহিনীর রাজা। মত্ত সিংহাসন দখলে। আবার শত্রুভয়ে পাণ্ডুর। এই রাজা হারেমে আসক্ত। কিন্তু শূন্য খাটের সামনে দাঁড়িয়ে রাজা দাঁত চেপে আছে ট্রাজিক উল্লাসে। কখনো যন্ত্রণাক্লিষ্ট আদলে ফুটে ওঠে—যীশু। যেভাবে তাঁর 'রাজা' বেঁচে থাকে তা দর্শক-মাত্রকে বিদ্ধ করে।

শিল্পী যখন সাধারণ মানুষ-জন নিয়ে হাতড়ান, তখন মানুষের মুখে খেলে যায় অতৃপ্তির ছায়া। ব্যর্থ মানুষের সংগীত। দুঃখের ঐকতান। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে—'এক-দিনকা বাদশা'। চাপা-পড়া মুখ, ভারাক্রান্ত চেহারা, রেখায় ধরা পড়ে শরীরের বাহ্যিক আবরণ। ক্লেশ আর বেদনার পোশাকে মোড়া আপাদমস্তক। 'হোমেজ টু পিকাশো' ছবিটি পিকাশোর 'উওমেন্স হেড' (১৯৩৯)-এর প্রভাবে দুই নারীর মুখের সংযোজনে একটি মুখের পরিস্ফুটন, শিল্পীর গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। ছবিটি অবশ্যই পিকাশোর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'রাজা-রানী', একাকী 'রাজা' অথবা একাকী 'রানী'—পটুয়াসুলভ ড্রয়িং-এর সংমিশ্রণে আমরা সম্মোহিত হই।

এসবের মুখ চোখ দেহ অঙ্গসৌষ্ঠব ছেলেবেলায় যেসব দারু-পুতুল কিনতাম সেগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। শিল্পীর আঁকা 'রাজা-রানী' আর 'নর-নারী'র মধ্যে ফারাক চিহ্নিত হয় রঙের বিষম ব্যবহারে। কোথাও আতিশয্যে, কোথাও নিষ্প্রভ আঙ্গিকে। 'কম্পোজিশন' (৩০নং) তুলনাহীন। উজ্জ্বল রঙে, বিমূর্ত ছোঁয়ায় মানুষ-জন, রমণীর আধশোয়া ভঙ্গির উপস্থাপনা—তারা যেন উঠে আসে পাতাল থেকে।

প্রাণী। প্রাণিজগৎ একান্তভাবে বশীভূত শিল্পীর। রেখাঘন পট ভরে যায় রঙের মসৃণ চাকচিক্যে (লাল-নীল) লম্বা-লম্বা তুলির সবেগ টানে গুহা-চিত্রের পরিবেশে তৈরি হয় প্রাণীদের দেহ। এইসব প্রাণীদের দুর্ধর্ষতা তিনি বন্দী করেছেন অনেক লড়াই করে। খেলতে-খেলতে, চকিতে।

কিউবিস্টিক স্টাইলে আঁকা 'ব্রথেল' সিরিজ বাস্তবের অনুকরণ মনে হয় না, অনুরণন। 'ট্রাইবালে' চিত্রায়ন নানা রঙে নানা ছন্দে প্রকাশিত। জলরঙে ওয়াশে পরিব্যাপ্ত মুখের ছড়ানো ছিটোনো ভাবের পরিবেশন, যেন-বা রম্যসাধন।

প্রদর্শনীর প্রবেশ-দুয়ারে যে 'রাজা'কে দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন শিল্পী, সেই রাজামশাই স্বভাবগম্ভীর। মুকুটে তাঁর আদিমতার ছাঁদ। ব্রাশ আর রঙের আঘাতে পরিণত টেক্সচার। ছবিমনস্কতাকে উশকে দেয়। লাল, চাপা ধূসর, মেটে আবছা রঙের প্রেক্ষাপটের আঙ্গিকে 'রাজা' আমাদের সম্ভ্রম-মাখানো সেলাম আদায় করে নেন—রবীনও।

উপাসক কর্মকার

সাহিত্য : সঙ্গ-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ কি আজও প্রাসঙ্গিক

রবীন্দ্রনাথ যদি গান আর গীতিনাট্য না লিখতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথকে কেউ কি মনে রাখত? সাম্প্রতিক পশ্চিম বাঙলার দিকে তাকিয়ে এ প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। 'বাবার জন্যে রবীন্দ্ররচনাবলী কিনতে হল মশাই',—কিছুদিন আগে ইংরেজি-সাহিত্যরসিক এক সাংবাদিক বন্ধু বললেন। 'কেন, মানসী, বলাকা, পুনশ্চ পড়তে ভালো লাগে না?' আমার প্রশ্নের দ্বিধাহীন জবাব আসে—'অসম্ভব!' 'গোরা, চতুরঙ্গ, তাঁর প্রথমযুগের সেই দুর্দান্ত প্রবন্ধগুলো, মৃত্যুর আগের কবিতা?' বন্ধুটি একমুহূর্ত থমকে বললেন। 'বললাম তো, বাবার জন্যে কিনছি।' বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ আজ দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যার পণ্যমাত্র। বিষ্ণু দের ভাষায় 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ।'

রবীন্দ্রনাথ আজ প্রাসঙ্গিক না অপ্রাসঙ্গিক—এ প্রশ্নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সাম্প্রতিক বাঙালীর সত্তার সংকট বা ক্রাইসিস অব আইডেনটিটি। রবীন্দ্রনাথ যে 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'-এর গান গেয়েছেন তা এখন দু-টুকরো; মানচিত্রে পশ্চিম বাঙলার চেহারা নিঙড়ানো ছেঁড়া গামছার মতো। স্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার গৌরবান্বিত ঐতিহ্য স্তিমিত: মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা হিউম্যানিটিজ ছেড়ে সংগত কারণেই বিজ্ঞান তার টেকনলজির দিকে ঝুঁকেছেন। সাহিত্যের অঙ্গনে যাঁরা প্রবেশ করছেন তাঁরা বেশির ভাগই তলানি বা ড্রপ-আউটস; বর্তমান জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরের জটিলতা উদ্ঘাটন তাঁদের সাধ্যের বাইরে। বুদ্ধিমান বাঙালী তরুণতরুণী বাঙলা পড়েন না, দৈনিকের পাতা ওলটানো ছাড়া; তাঁরা বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি পেপারব্যাক পড়েন। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষণীয়; যাঁরা পড়াশোনায় ভালো আর যাঁদের কনট্যাক্ট আছে তাঁরা কী ভাবে আমেরিকা, কানাডা, পশ্চিম জার্মানির পথে ধাবমান হওয়া যায় সে সম্পর্কে সচেষ্ট। আর একদল লাল পতাকা হাতে রাস্তায় নামেন। আর সারা ভারতবর্ষের জন্যে নয়, 'মেড ইন বেঙ্গল' বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন।

'বঙ্গ-ইতিহাসে আজ এল স্বর্ণযুগ' —১৯০৫ সালে লিখলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ইংরেজের কলোনিতে কি স্বর্ণ-যুগ সম্ভব? এ প্রসঙ্গ নিয়ে নবীন ঐতিহাসিকেরা বেশ সংগত প্রশ্নই তুলেছেন। বাঙলা রেনেসাঁসের সাম্প্রতিক আলোচনায় দুই শিবিরে বিভক্ত বিতর্কে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে: অপেক্ষাকৃত সার্বিক জাগরণের যে ইয়োরোপীয় উপমা তা এ ক্ষেত্রে খাটে না, বাঙলা রেনেসাঁস নিশ্চয় সীমাবদ্ধ কিন্তু এ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তা গৌরবে ভাস্বর, তার দীপ্তি অম্লান।

আর এ রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান ঊনচল্লিশ বছর বয়সে বিংশ শতাব্দীতে পা রাখলেন। ১৯৪১ সালে মৃত্যু পর্যন্ত এ শতাব্দীর প্রথম চারটে দশক নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের দশক। মাঝখানে শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলামের বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনিই শিক্ষিত বাঙালীর প্রধান ঐতিহ্য। কারণ, এরকম নিরলস আত্মানুসন্ধানের দৃষ্টান্ত বাঙলা কেন, ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও বিরল। একই সঙ্গে বাঙালি সত্তাকে ভারতীয় সত্তার সঙ্গে মেলাবার নিরন্তর চেষ্টা, একাধারে ব্রাহ্ম এলিটিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামীণ হিন্দু-মুসলমান মানুষের বাঁচবার আন্দোলনের সমন্বয় সাধনা (তাঁর গোরা, গল্পগুচ্ছের গল্প, এ শতাব্দীর গোড়ায় তাঁর জ্বলন্ত প্রবন্ধ, 'সভ্যতার সংকট', নতুনভাবে বাউল ভাটিয়ালি স্বাদেশিকতার গান); তাঁর একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ঈশ্বরসাধনা যার সঙ্গে মন্দির-মসজিদ-গিরজার কোনো সম্পর্ক নেই ও শিক্ষাপ্রচার এবং শ্রীনিকেতনে পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টা ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহ; একই লোকের হাত দিয়ে গীতাঞ্জলি আর রাশিয়ার চিঠি। এত বড় প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোথায় পাবে?

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁরা পুতুল খেলেন তাঁরা বলেন মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের ছেলে বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথ। এটা একেবারে অর্ধসত্য। জোড়াসাঁকো বাড়ির কোনো ছেলে বছরের পর বছর যৌবনে পদ্মাপারে শিলাইদা-পতিসর-সাজাদপুরে জমিদারি দেখে বেড়ান নি; জোড়াসাঁকো বাড়ির কোনো ছেলে শান্তিনিকেতনের ঊষর প্রান্তরে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন নি। তিনি যদি শুধু মহর্ষির ছেলে হতেন তাহলে সাডার স্ট্রীট পার্ক স্ট্রীটের কবি হতেন, বড় জোর জ্যোতিঠাকুর হতেন। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের এই ধরনের মজলিশি ব্যক্তিত্ব—যার ধারা পরবর্তী কল্লোলযুগে, এমনকি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয়ের আড্ডাতেও প্রকট ছিল, তা থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে আলাদা। সাহিত্যের মজলিশের বাহিরে যে বিরাট দেশ পড়ে আছে সে দিকে তাঁর চোখ কান সর্বদা খোলা ছিল।

এক সাংস্কৃতিক উদ্ভাসের মাঝখানে বিংশ শতাব্দীর শুরু। আমরা এ শতাব্দী শেষ করছি কীভাবে? বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে? তিরিশ বছর আগে জীবনানন্দ দাস লিখেছিলেন:

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ
পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ
চোখে দ্যাখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—
প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের
সুপরামর্শ ছাড়া।

তিরিশ বছর আগে যে অদ্ভুত আঁধারের কথা বলেছিলেন জীবনানন্দ আজ তা গহন তমিস্রা। সীরিয়াস সাহিত্য আজ সম্পূর্ণ কোণঠাসা। কেন এ অবস্থা? কেন এত বইমেলা, বাঙলা বইয়ের পাতাজোড়া সচিত্র বিজ্ঞাপন, প্রাইজ, সুদৃশ্য অফসেটে ঝকঝকে ছাপা চকচকে বইয়ের সারি, বাঙলা দৈনিকে লেখকদের অবিরত কীর্তি-কলাপ প্রচার—তা সত্ত্বেও এ তমিস্রা কেন?

তার কারণ বাঙলা সাহিত্যে দুই বিবদমান শিবিরে সীরিয়াস লেখকের সমাজ ও আত্ম-জিজ্ঞাসার স্থান নেই: ফুলচন্দন দেওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ব্রাত্য। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর গোটা চল্লিশের দশকে যে প্রগতিসাহিত্যের জোয়ার আসে, যাতে তৎকালীন এবং তার পরবর্তী শক্তিমান লেখকেরা তাঁদের তরী ভাসান, তা প্রবল যান্ত্রিকতা আর তাত্ত্বিকতার বালিতে ক্ষীণধারা। আর ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পরাক্রান্ত ম্যাসমিডিয়ার বারিধারায় যে তরল চপল আধুনিকতা পল্লবিত হয়ে উঠেছে সেখানও সীরিয়াস লেখকের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন একই সঙ্গে সমাজজিজ্ঞাসা আর আত্মজিজ্ঞাসার দায়, যার ফলে আধুনিকতা দেশ কালের রূপকে সমৃদ্ধ রূপ নেয়। এই দুই শিবিরের নেতারাই রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথের এই 'সুপরামর্শ' ছাড়া আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই।

অসীম রায়

গত ১৮ মে, নলিনীকান্ত সরকার পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৯৫। শ্রীসরকার কাজি

নজরুল ইসলাম ও শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)-এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি 'বিজলী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিচিত্রা পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁর কিছু গান রেকর্ড করেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'দাদাঠাকুর', 'হাসির অন্তরালে', 'শ্রদ্ধাস্পদে', 'আসাযাওয়ার মাঝখানে' বহু-আলোচিত।

গত ১০ এপ্রিল, সুলেখক সুমথনাথ ঘোষের মৃত্যুতে একজন দক্ষ সংগঠকের অভাবও সৃষ্টি হল। শ্রীঘোষ ছিলেন প্রখ্যাত 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশন-সংস্থার অন্যতম কর্ণধার। তিনি 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার যুগ্মসম্পাদকও ছিলেন। তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'উত্তরবাহিনী'। অন্যতম গ্রন্থের মধ্যে 'বাঁকাস্রোত', 'সুদূরের পিয়াসী' খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি ছোটোদের জন্যও অনেক অনুবাদ করেছিলেন।

এপ্রিল ১৪ তারিখে এবারের আনন্দ-পুরস্কারের প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। দিব্যেন্দু পালিত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার পুরস্কার পেলেন। সুভাষ ভট্টাচার্য পেলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার পুরস্কার। সুভাষবাবু তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান'-এর জন্য পুরস্কৃত হলেন।

গত ১২ মে সদর স্ট্রীটে আই. সি. ডাবলু.-এর অডিটোরিয়ামে শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার দেওয়া হয় শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী ও হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দুজনেই সামগ্রিক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দুটি পান। সুকবি নবনীতা দেবসেন কবিতার জন্য পেলেন প্রসাদ পুরস্কার। প্রখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদার শিশুসাহিত্যের জন্য পেলেন মৌচাক পুরস্কার।

গ্রন্থসমালোচনা

Marxism and the Muslim World
Maxime Rodinson
Orient Longman Limited
Indian edition, 1980

সমাজবিজ্ঞানী, ইসলামবিদ্, স্বাধীন মার্কসবাদী ম্যাকসিম রদিনসন প্রখর ইতিহাসবেত্তা, তাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ১৯৭১-এ। সেই সালে তাঁর রচিত 'মহাম্মদ' পৃথিবীর পণ্ডিত-মহলে বিতর্কের ঝড় তোলে। সঙ্গে সঙ্গে রদিনসন পশ্চিম ইউরোপের সেরা ইসলাম-বিশেষজ্ঞদের মহলে স্বীকৃতি পেলেন। ভারতবর্ষের পণ্ডিত-মহল ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মেনে নিতে স্বভাবতই একটু বেশি সময় নিয়ে থাকেন। অতি সংক্ষেপে, এই কারণেই সম্ভবত ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক চিন্তায় স্বাধীন মনোভাব গড়ে উঠতে সময় লাগছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান এদেশে ধর্ম-নামক বিষয়ে কোনোপ্রকার 'ডিসইনটারেসটেড ইনটেলেকচুয়াল কিউরিয়োসিটি'তে আস্থাবান নন। সেইহেতু অমুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও এবিষয়ে বড়ো বেশি সতর্ক। রদিনসন একাধিক পুস্তক রচনা করে (যেমন 'ইসলাম অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম' একটি বিশেষ উল্লেখ্য পুস্তক ; বা ৬২-পৃষ্ঠার একটি বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিসর্বস্ব প্রবন্ধ : 'দ্য ওয়েস্টার্ন ইমেজ অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন স্টাডিজ অব ইসলাম', 'দ্য লিগ্যাসি অব ইসলাম') (জোসেফ শাখ্‌ত্‌ ও সি. ই. বসওয়ার্থ সম্পাদিত) আরবীয় ইসলাম কোন্ পথে চলেছে এবং কোন্ কোন্ পথে চলা উচিত, তার বিচার করেছেন। তাঁর সমস্ত পুস্তকের প্রধান বক্তব্য হল—এই পুরাতন ধর্মের ধারণা, বিশ্বাস নিয়ে আজকের পৃথিবীতে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান সমাজ প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠতে পারবে না। এই পুস্তকে তিনি আলোচনা করেছেন—এই বিশাল ভূখণ্ডে মানুষের পায়ের নীচে আছে অপরিমিত তেল। যা নাকি অক্ষয়শক্তির পরিপূরক। কিন্তু তার পরও মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক দুরবস্থার অন্ত নেই। অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র তো বটেই। বর্ণপরিচয়হীন, সর্বদাই পশ্চাদ্‌গামী। অপুষ্ট দেহ, অসম খাদ্যে বিধ্বস্ত। জনসংখ্যা প্রত্যহ বাড়ছে। বহুধা বিভক্ত। বিচ্ছিন্ন। তদুপরি আরব দেশগুলি অগণতান্ত্রিক।

এইসব বহু পুরাতন সমস্যা এই ২২৮-পৃষ্ঠার পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। গত কুড়ি বছরে মুসলমান বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানেরা কিভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছেন বা কিভাবে আরব ঐক্য অন্বেষণে মিশরের গামাল আব্দাল নাসের কতদূর পর্যন্ত হস্ত প্রসারিত করেছেন, এ সবই রদিনসন আলোচনা করেছেন। তবে একদিকে একটু যেন বেশি ঝুঁকে।

একথা অনস্বীকার্য যে এই বিশাল ভূ-খণ্ডের অধিবাসীরা যদি না পরিবর্তনপ্রবণ হন, যদি না তাঁরা পশ্চিমায়নের জন্যে বিজ্ঞানসম্মত পথে এখনও পা না বাড়ান, তাহলে একদিন তাঁদের পায়ের তলার ঐশ্বর্য যাবে ফুরিয়ে। সেই সঙ্গে নড়ে উঠবে পায়ের তলার মাটি। পশ্চিমায়ন বলতে এখানে আমরা বুঝি বিজ্ঞানসম্মত ডাক্তারি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞানের যথার্থ চর্চা, প্রযুক্তিবিদ্যার উপযুক্ত প্রয়োগ, বুঝি নারীস্বাধীনতা। এবং সবচেয়ে বেশি করে বুঝি ব্যক্তিস্বাধীনতা। এসব আলোচনার প্রসঙ্গে রদিনসন সতর্ক করে দিয়েছেন গতানুগতিক বামমার্গীদের। বলেছেন, কোনো অর্থহীন, যান্ত্রিক পথে মধ্যপ্রাচ্যের উন্নতি অসম্ভব। যদিচ তিনি মধ্যপ্রাচ্যবাসীদের কম সাবধান করে দেন নি। তিনি বলেছেন ইসলাম ধর্ম এবং মুসলমান সমাজ কেবলমাত্র নামাজ, রোজা, ব্যক্তিগত আইন, শরীয়ত নিয়েই প্রগতি এবং রুচির মান নির্ধারণ করতে পারবে না। তিনি অবশ্য একটি চমকপ্রদ প্রেসক্রিপশন বাতলে দিয়েছেন। তাঁর বাণী হল—ইসলাম+মার্কসবাদ। অব্যর্থ উন্নতি এই পথেই আসবে। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রপ্রধানেরা রদিনসনের এই সতর্কবাণী শুনে রাখলে ভালো করবেন।

তাহলে রদিনসনের প্রস্তাবের সারমর্ম হল—বিপন্ন মধ্যপ্রাচ্য, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে ধর্মসম্পৃক্ত মধ্যপ্রাচ্য অগ্রগামী হতে পারে কেবল মার্কসীয় পথে গিয়ে। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু রদিনসন মধ্যপ্রাচ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রাচীন, জরাগ্রস্ত দেহের একাংশের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেই এসব কথা বলেছেন। মুসলিম বিশ্বের আর-এক দিকে তরুণ ইসলাম রেনেসাঁর ও আধুনিকীকরণের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। আর-একটি বড়ো কথা হল—মধ্যপ্রাচ্যের এলিট সম্প্রদায় এবং তরুণ সমাজ জেনেছে যে তাদের কোনো একটা পথে যেতেই হবে। সে পথ কি সাম্যবাদের? না ধনতন্ত্রের? না শেষ পর্যন্ত কমিউনিজমের? এও তারা জেনেছে যে হয় তারা ব্যবহার করবে ধনতন্ত্রবাদী এক বৃহৎ শক্তিকে বা কব্জা করবে সাম্যবাদী রাশিয়াকে। বা অন্য দিকে, ঈশ্বরের কৃপা থাকলে এক বা প্রয়োজনে দুই বৃহৎ শক্তিই তাদের ব্যবহার করবে নিজেদের স্বেচ্ছাতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের (যদি তাই বলতে চান) ধনাগার-অস্ত্রাগার গড়ে তোলবার কাজে। এই পবিত্র লীলাখেলায় তৃতীয় বিশ্বের কী ভূমিকা হওয়া উচিত, তা নিয়ে রদিনসন বিশেষ মাথা ঘামান নি। কারণ, তিনি তো আদি ও অকৃত্রিম চাঁদসির মলমের কথা বলেই দিয়েছেন। মসকো হোক মধ্যপ্রাচ্যের নতুন মক্কা। তাহলেই যাবে স্বর্গকে পাওয়া।

এইসব বলাবলির ফাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের আরো যেসব সাম্প্রতিক সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে রদিনসন তার হিসেব নিতে পারেন নি। উদাহরণ : ১৯২০-র তুরস্কে এলিট ও রাজনীতিবিদেরা যা যা পরিবর্তন এনেছিলেন সমাজে, তার সিকিভাগ আধুনিকীকরণের স্বপ্ন পাশ্চাত্য জগৎ এ অঞ্চলে চিন্তা করতে পারে নি। তুরস্কের নেতৃবৃন্দের এই সামাজিক পরিবর্তনের ধারা সাধারণ তুরস্কবাসীকে উচ্ছ্বসিত করেছিল প্রচুর পরিমাণে। ফলে তুরস্কের শিল্পাঞ্চলে এবং কৃষিকাজে এসেছিল পরিবর্তন। এইসব পরিবর্তনের ঢেউ গিয়ে লেগেছিল ইসরাইলে, লেবাননে। শিল্পে বাণিজ্যে পরিবর্তনের পরই আর্থিক উন্নয়নে এল পরিকল্পনার চিন্তা। এর পর জাতীয় জাগরণ একটা বিশেষ মূল্যবান প্রেরণা হয়ে উঠল।

এসব জাগরণের ফলে এল মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব সাম্যবাদ' এবং 'আরব জাতীয়তাবাদ'। তরুণ মধ্যপ্রাচ্যে এ সবকিছু ছেলেভোলানো খেলনা নয়। আমরা জানি, এতদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান শত সহস্র সংস্কারের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আধুনিক পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে জগতের এক প্রান্তে নিজের একটি বিশেষ জগৎ তৈরি করে নিয়েছিল—সেই তার জগৎ নিজের ধর্মরুচি-বিশ্বাস-মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমার মধ্যে আটকা পড়ে সে দেখতে-দেখতে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ল। ফল হল : এই সেদিনের ইরানের বিপ্লব। আজও ইরান-ইরাক যুদ্ধ। ইরানের বিপ্লব আসলে বিপ্লব বলতে আমরা যা বুঝি, তা নয়। মুসলমান বিশ্বের বড়ো একটা অভিশাপ হল : এসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধন করেন ইউরোপ-মারকিন মুল্লুকের মডেল-মাফিক। ইরানের শাহ যে আজকের ইরানের প্রধানদের চেয়ে ভালো ছিলেন, আইয়ুব খাঁ যে পাকিস্তানের বর্তমান শাসকের চেয়ে ভালো ছিলেন, এসব ভালো ভালো উপলব্ধির কথা এখন ইরান, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষেরা বলছেন। তাহলে শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী? তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানতম অভিযোগ হল যে, তিনি ইরানের সমূহ পরিবর্তন করেছেন। মানি। এও মানি যে তিনি ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিকতম (অত্যন্ত সীমিত অর্থে) রাষ্ট্রে পরিণত করে গেলেন। কিন্তু ইরান যে মারকিন দেশের মধ্যে অবস্থিত নয়, এই কঠিন সত্যটা ভদ্রলোক বিস্মৃত হয়েছিলেন।

কম-বেশি এই ভুল মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রও করেছে। এবং করে চলেছে। তাই যদি আজ আবার রদিনসনের পরামর্শে মধ্যপ্রাচ্য মার্কসবাদ-নামক বিশেষ দর্শনটি ধার করে আনে, ধরুন, রাশিয়া বা চীন থেকে, তাহলেই কি মধ্যপ্রাচ্যবাসীদের জীবনে মুক্তি আসবে?

আরবদেশের অন্তরঙ্গ সন্তান এবং পৃথিবীর তরুণতর ধর্ম ইসলাম। এই ধর্ম আজও সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারার সঙ্গে মিশে যেতে পারে নি। আজও তার বন্দীদশা। অর্থাৎ, ইসলাম পরিবর্তমান বিশ্বে আজও তার অনুগামীদের মুক্ত চিন্তার প্রবাহে ভাসিয়ে দিতে পারে নি। আজও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান ধারাবাহিক সংস্কারের ভার বহন করে চলেছে। তাই আজ আমরা ভারতবর্ষ থেকে কেবলই এই প্রত্যাশার বাণী তাঁদের কাছে পাঠাতে পারি যে, তাঁরা যেন, আজ হোক কাল হোক, একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসংগত সুসংহত করে তুলতে পারেন তাঁদের জীবনধারাকে। মনুষ্যত্বের উদার উপকরণগুলি নতুন মধ্যপ্রাচ্য গড়ার কাজে যেন সহায়ক হতে পারে। এত দিনে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ (সবাই নয়, নিশ্চয়ই) ইতিহাসের দাবি কান পেতে শুনতে পাচ্ছে। ইতিহাস তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যাক—এই আমরা আশা করব। তাঁরা তাঁদের মতো করেই তাঁদের পথে তাঁদের মাটিতে নতুন তাজমহল গড়ে তুলুন। আশা করি, এমন

ইচ্ছা প্রকাশে পণ্ডিত ম্যাকসিম রদিনসন রাগ করবেন না। এমন পুস্তক রচনার জন্যে ধন্যবাদ তাঁকে।

এই পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে প্রকাশক সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ, এই পুস্তক এই উপমহাদেশের সমাজসচেতন ধর্মনিরপেক্ষ পাঠকদের অবশ্যই পাঠ্য।

হোসেনুর রহমান

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য—আনিসুজ্জামান। মুক্তধারা, ঢাকা-১। ষাট টাকা।

১৭৫৭ থেকে ১৯১৮, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের মনোজগতের ধারা অনুসরণে আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' একখানি অপরিহার্য গ্রন্থ। বাস্তবিক পক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে বাঙালি মুসলমান সমাজ থেকে ধূমকেতুর মতো নজরুলের আবির্ভাব যে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, দেশ এবং কালের অন্যান্য পরিপার্শ্বিকের সঙ্গে এই সমাজের অভ্যন্তরেও দীর্ঘদিন থেকেই যে প্রস্তুতিপর্ব চালু ছিল তার আদ্যন্ত রূপরেখা এই গ্রন্থে প্রতিফলিত।

আলোচ্য বিষয় নিয়ে অবতরণিকা-পর্বে লেখকের বক্তব্য : 'বর্তমান গ্রন্থে সামাজিক পশ্চাৎপটের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ-আমলে (১৭৫৭—১৯১৮) বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত লেখকদের সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু এটি সাহিত্যের ইতিহাস নয়, সাহিত্য-সমালোচনাও নয়। ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-অবদানের ধারা অনুসরণ করে লেখকদের চিন্তাধারার পরিচয়দান আমার লক্ষ্য।' [পৃ ৪] যুক্তিনিষ্ঠা, মুক্তদৃষ্টি, ইতিহাস ও সমাজসচেতনতার গুণে এই লক্ষ্যের বাস্তবায়নে তাঁর সার্থকতা অতুলনীয়।

ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০—অন্তত এই একশতবর্ষব্যাপী বাঙালি মুসলমান কবিরা চর্চা করেছেন প্রচুর পরিমাণে আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দমিশ্রিত এক ধরনের মিশ্রভাষারীতির কাব্য। গরীবুল্লাহ কিংবা সৈয়দ হামজার মতো কবিরা সে যুগে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এই ধারায় কাব্যের উপজীব্য বিষয়বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক একে গণ্য করেছেন, 'ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির নিদর্শন' হিসাবে। তাঁর মতে, '...ইংরেজ শাসনের প্রথম একশ' বছর বাঙালি মুসলমানের এক মানসিক অবসাদের যুগ—বিশেষ করে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে তো বটেই। তার জীবনবোধ ও সমকাল সম্পর্কে চেতনা কৃত্রিমতা, গতানুগতিকতা ও ইহজীবনবিমুখতার বালুরাশিতে হারিয়ে গেছে।' [পৃ ১৫৮-৫৯] কিন্তু পরবর্তী কালেও হারিয়ে যা যায় নি সেটা হল বাঙলা ভাষার সঙ্গে হিন্দি, ফারসি, আরবি আর তুর্কি শব্দ ব্যবহারের রীতিটা। কবি নজরুল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নজরুল-কাব্যে কিছু অনবদ্য সৃষ্টির উপকরণ হল মহরম বা কারবালার আখ্যান। যে আখ্যান এর আগে একাধিক কবি-সাহিত্যিকের দ্বারা বহুলব্যবহৃত উপকরণ। মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত 'বিষাদসিন্ধু' কিংবা হামিদ আলীর 'কাসেমবধ' কাব্যই শুধু নয়, এই ধারায় আরো অনেক রচনারই মূল্যায়ন রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।

নজরুলের মুসলিম ঐতিহ্যগর্বের অভিব্যক্তিও পূর্বসূরীদেরই অনুসৃতি। মীর মশাররফ হোসেনের মোসলেম বীরত্ব (১৯০৮) ও এসলামের জয় (১৯০৮), কায়কোবাদের বিবিধ-বিষয়ক কবিতাবলীর কোনো কোনো কবিতা, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর স্পেন-বিজয়কাব্য (১৯১৪) ইত্যাদির মতো আরো অনেক কাব্য, উপন্যাস প্রবন্ধ ইত্যাদি রচিত হয়েছে এই ধারায়। পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন মাশহাদির (১৮৫৯—১৯১৮) ঐতিহ্যগর্ব প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের মন্তব্য : 'ঐতিহ্য-চেতনা তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল, কিন্তু ঐতিহ্যগর্ব তাঁকে অন্ধ করতে পারে নি। মুসলমানের অতীতে যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয়, তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন কেবল সুখস্মৃতিরূপে নয়, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে। যে ঐতিহ্য-চেতনা কেবল আত্মগর্বমূলক, সৃষ্টি-প্রেরণায় অক্ষম, তার নিন্দাও তিনি করেছেন।' [পৃ ২৮৩] ঠিক এই ধরনেরই ঐতিহ্যচেতনার উত্তরাধিকার ছিল নজরুলের।

হিন্দু ঐতিহ্য, পুরাণকাহিনী, দেবদেবীর আখ্যান ইত্যাদিকে কাব্যসৃষ্টির ভাব ও আঙ্গিকগত নানা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করার রেওয়াজটা একজন মুসলিম সন্তান হিসাবে নজরুল থেকে শুরু নয়। মিশ্রভাষারীতির কবিরা তাঁদের 'লৌকিক ইসলাম'-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হাজির করেছিলেন নানা হিন্দু দেবদেবীর চরিত্র। মুসলমান সমাজ থেকে উদ্ভূত বাউল কবিরা তো সুফী তত্ত্বের সাথে শিবশক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সমভাবেই আত্মস্থ করে রচনা করেছেন বাউল সংগীত। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত কবি মোজাম্মেল হকের 'প্রেমহার' নামক গীতিকবিতাসংকলন থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আনিসুজ্জামান দেখিয়েছেন, উপমাপ্রয়োগে হিন্দু পুরাণের ব্যবহার করতে কবির কুণ্ঠা ছিল না। [পৃ ২৪১] পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদি তো মুসলিম ঐতিহ্যই শুধু নয়, একজন ভারতসন্তান হিসেবে ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্পদেরও উত্তরাধিকার দাবি করেছেন। লেখকের মতে, এই দাবি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। [পৃ ২৮৩]

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর যে জয়গান নজরুল গেয়েছেন তাও পূর্বসূরীদের সাধনারই অনুসৃতি। আনিসুজ্জামানের মতে, তৎকালে এই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ব্যাহত হয়েছিল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের চর্চার দ্বারা। 'গোজীবন'-এর লেখক মীর মশাররফ হোসেন, যিনি হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর স্বার্থে মুসলমানদের উদ্দেশে গোহত্যা বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে লিখেছেন :

'...এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতি প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক—সংসারকার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?' [পৃ ২০৪] তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির এই ঔদার্য কেমন করে সংকীর্ণতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল, তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের অভিমত : 'তিনি যে প্রথম জীবনের হিন্দু-মুসলমান মিলনকামনা ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করলেন তার জন্যে অনেকখানি দায়ী আমরা। যদি বলি—সমসাময়িক পরিবেশের অনুদারতা, তাহলে খুব ভুল হয় না। যেকালে এঁরা সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হলেন, সেকালেই হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদ বাংলার সাহিত্যে ও সমাজে আত্মপ্রকাশ করল। তার একটি দিক ছিল হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয়ধারায় নয়—বিরোধ-স্বীকৃতির চর্চা করা, যার অপরিহার্য ফল হিন্দু-মানসে মুসলিম বিদ্বেষের সূচনা। এর প্রতিক্রিয়ায় এবং সেই সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির প্রভাবে মুসলিম-মানসে জাগল হিন্দুর শুভবুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা। অতএব, মিলনকামনা আর কিছুতেই সাহিত্যে ও সমাজে খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারল না।' [পৃ ২২৩] এইরকম একটা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী কামনা করেই প্রকাশিত হয়েছে 'আহমদী', 'সম্মিলনী' এবং 'কোহিনুর' পত্রিকা। মৈত্রীর সপক্ষে বারবার জোরালো অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে 'আল ইসলাম' এবং 'নবনূর' পত্রিকায়। নওসের আলি খাঁ ইউসুফজী, পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদি, আকবরউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ এমদাদ আলী, কবি মোজাম্মেল হক প্রভৃতি লেখকদের রচনায় বারবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান মিলনবাসনা। তবে এই নিয়ে হিন্দু লেখকদের প্রতি ক্ষোভের কথাও মাঝে মাঝেই ব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, এই যুগের অন্যতম লেখক মহম্মদ কে চাঁদের একটি উক্তি এখানে স্মরণীয় : 'আজ পর্যন্ত হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া অনেক কথা লিখিতেছেন। বহুকাল তো লিখিয়া আসিয়াছেন, এখনও পর্যন্ত লিখিতে ছাড়িতেছেন না। আজিকালি সাহিত্যিক মিলন, রাজনৈতিক মিলন, জাতীয় মিলন প্রভৃতি মিলনযুগে যদি ঐরূপ লিখিত হয় তাহা হইলে মিলন সুদূরপরাহত।' [পৃ ৩২৫] তবে যেসব বিষয় নিয়ে মুসলমানের মনে অহেতুক বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল আনিসুজ্জামান তার সমালোচনা করেছেন। সে যুগে মুসলিম নারীর সঙ্গে হিন্দুর প্রণয় মুসলমানরা একেবারেই সহ্য করতে পারত না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভের অন্যতম কারণ ছিল এই ধরনের কাহিনী। আনিসুজ্জামানের মতে, 'বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে অনূঢ়ার প্রেম দেখাতে হলে নায়িকাকে মুসলমান হতে হত ; নয়তো হিন্দু কুমারীকে অস্বাভাবিক পরিবেশে লালিত হতে হত—বাস্তবতার তাগিদে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের দুটি নায়িকাকে লক্ষ্য করলে তাই দেখা যাবে। কিন্তু শিবাজী ও জগৎ সিংহের প্রতি রশিনারা বা আয়েষার প্রণয়চিত্রকে মুসলমান লেখকেরা অন্য দিক দিয়ে দেখলেন। তাঁদের মনে হল যে, এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর অন্যায় করা হয়েছে। হৃদয়বৃত্তির তীব্রতা যে সম্প্রদায়-ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে, এ যুক্তি মানলেও তাঁরা মুসলমান যুবতীর পক্ষে হিন্দু যুবকের ভালোবাসা অনুমোদন করলেন না।' [পৃ ৩৫২] বঙ্কিমচন্দ্রের 'দাঁতভাঙা জবাব' দেবার প্রচেষ্টায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী যেসব উপন্যাস রচনা করেছিলেন তারও আলোচনাপ্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের মন্তব্য : 'মানবহৃদয়ের যে গভীরতায় বঙ্কিম প্রবেশ করতে পেরেছিলে, সিরাজী তা পারেন নি। তার অন্যতম কারণ এই যে, এক ধরনের মসীযুদ্ধের অস্ত্ররূপে উপন্যাসগুলোকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ফলে পাত্রপাত্রীর মুখে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের ব্যস্ততায় তিনি অনেক সময়ে তাদেরকে পরিপূর্ণ মানবীয় অনুভূতির অধিকারীরূপে চিত্রিত করেন নি।' [পৃ ৩৫২ক]

হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের চর্চা মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশকেও ব্যাহত করেছিল। এ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য, 'হিন্দুপুনর্জাগরণবাদী চেতনা সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায়। সামাজিক ক্ষেত্রে দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চম্মন্যতাকেই তখন সকলে মনে করতেন জাতীয়তাবাদী চেতনা বলে। জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণবাদ যে সমার্থক হয়ে উঠল, এটাই হল সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার। এর আর-একটি অভিব্যক্তি দেখা যায় হিন্দুমেলার মধ্যে। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির উৎসাহে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা হয়।

'"যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূলে হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।" কিন্তু এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে অহিন্দু জনসংখ্যার কথা কেউ ভাবলেন না।' [পৃ. ৮২] এইরকম একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে শুরু হয়েছিল জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার চর্চা। এর অন্যতম পথিকৃৎ পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মাশহাদি ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'সমাজসংস্কারক' গ্রন্থে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সে সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের মন্তব্য, '...ভাষান্তরে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, সিপাহী অভ্যুত্থান সফল হল না, কেননা, এই সুযোগে অনেক সামন্ততান্ত্রিক প্রধান পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করেছিলেন ; আর ওয়াহাবী আন্দোলন সফল হল না, তার কারণ এটি ছিল একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন ধর্ম-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর ঐক্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এই ঐক্যবদ্ধ মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।' তাঁর এই বিশ্লেষণ বিস্ময়কর বলতে হবে। এর পশ্চাতে যে ধর্মনিরপেক্ষ মৌলিক গণতান্ত্রিক চেতনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তার প্রকাশ বলিষ্ঠ ও সাহসিক। কেননা পণ্ডিত মাশহাদির সমকালেও মুসলমানদের মধ্যে যে জাগরণ-প্রচেষ্টা চলছিল তাও তার ধর্মগত অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে এবং তার মূল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এর সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ তাঁর ছিল। তার চেয়ে বড়ো কথা, হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনা কেবল নয়, পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে দাবি এখানে ধ্বনিত হয়েছে, তা সেকালে কোনো দেশীয় রাজনীতিকের পক্ষে করা সম্ভব হয় নি। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসেরও প্রাথমিক প্রচেষ্টা চলে শাসক-শাসিতের রাখীবন্ধনের।' [পৃ. ২৭৭] জাতীয়তার যে সংজ্ঞা মাশহাদি দিয়েছেন সে সম্পর্কেও লেখকের অভিমত, 'হিন্দু ও মুসলমানের নানামুখী স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও তাঁদেরকে একজাতিরূপে কল্পনা করে পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন-আহমদ মাশহাদি প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের আদর্শকেই গ্রহণ করেছেন।' [পৃ. ২৮১] পরবর্তী কালে নজরুলের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল ঠিক এই ধরনের জাতীয়তাবোধের উত্তরাধিকার। নজরুলের আগেও অবশ্য মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ ইত্যাদির মতো কবি ও সাহিত্যিকগণ স্বদেশহিতৈষণা এবং জাতীয়তাবাদের সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। সর্বোপরি রচিত হয়েছিল ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন 'অনল-প্রবাহ' (১৩০৬)। দ্বিতীয় সংস্করণ 'অনল প্রবাহ' (১৩১৫) ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে এবং সিরাজীর দুবছর কারাদণ্ড হয়।

নজরুল নারীমুক্তির যে জয়গান গেয়েছেন তাও পূর্বসূরীদেরই সাধনার উত্তরাধিকার। তাঁর আগে ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এমদাদুল হক, লুৎফর রহমান, ফজলল করিম এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, ও অবরোধ সম্পর্কে সমাজের মনোভাবকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেছেন। 'বেগম রোকেয়ার সাহিত্য-সৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম নারীর শিক্ষার জন্যে তাঁর সাধনা রক্ষণশীল মনোবৃত্তির উপরে আধুনিক মনোভাবের জয়পতাকা স্বরূপ।' [পৃ. ৩৯২] আনিসুজ্জামানের মতে, এই-ভাবেই আর-সব পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ছাড়াও বাঙালি মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরেও নজরুল-মানসের বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে লুৎফর রহমান সম্পর্কে গ্রন্থকারের উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়—'বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বিস্ময়কর উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মন্তব্যের সময়ে বিশেষ করে মনে পড়ছে লুৎফর রহমানের কথা। রেনেসাঁসের সাধনা যেমন আর সব কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থান দিয়েছিল, তাঁর রচনায় সেই প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। ধর্মের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন, ধর্মজীবন বলতে যে জীবনধারা তিনি বুঝিয়েছেন, তা কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মের গণ্ডীবদ্ধ ব্যাপার নয়। এর পেছনে রয়েছে হিউম্যানিস্টের উন্মুক্ত দৃষ্টি। অন্য কোন লেখকের এই আধুনিক ও মানবিক দৃষ্টির পরিচয় হয়তো এতটা স্পষ্ট নয়। তবু বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে উদারনৈতিকতার পরিচয় পাই অধিকতর। নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মে স্বমহিমায় মানুষের যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখতে পাই, লুৎফর রহমানের মত লেখকের সাধনায় সেই মানসিক আবহাওয়ার সূচনা।' [পৃ. ৩৯৩]

আনিসুজ্জামান এইভাবে অনুসরণ করেছেন দেড়শতাধিকবর্ষব্যাপী বাঙালি মুসলিম মানসের বিকাশের ধারা। সে ধারা অব্যাহত ছিল না আদৌ, থাকার কথাও নয়। তরীকা-ই-মুহম্মদীয়া বা ফারায়েজী আন্দোলনের মতো পিউরিট্যানিক ধর্মান্দোলন এক সময় এর অগ্রগতির পথে সৃষ্টি করেছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙলা কিনা—এমন একটা অদ্ভুত বিতর্কের ঝড়ঝাপটার ভিতর দিয়েও এই অগ্রগতির ধারাকে পথ খুঁজতে হয়েছে। এই বাঙালি সমাজেই জন্মগ্রহণ করে মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)-এর মতো লেখককে বলতে শোনা যাচ্ছে : 'বাংলা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাংলা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন, নিস্তেজ দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।' [পৃ. ২৮৭] এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বিকৃত মানসিকতার প্রতিফলন নয়। তৎকালীন সমাজ-মানসের মধ্যেই ছিল এই বিকৃতির বীজ। প্রগতির ধারার বাঙালি মুসলমান লেখকদের প্রাণপণে লড়তে হয়েছে এইরকম বিকারগ্রস্ত মানসিকতার বিরুদ্ধে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত এমন দিন এসেছে যখন এই ধরনের বিতর্কটাকে অদ্ভুত এবং অর্থহীন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঘোষণা করেছেন : 'দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। "বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাঙ্গালা?" এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিবে, না বেল? বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।" [পৃ. ৩৯১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে বাঙালি মুসলমান সমাজে অগ্রগতির সপক্ষে যে ভাব-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মাতৃভাষার প্রতি মমত্বের বিকাশ তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

আবদুর রউফ

বিশ্বসাহিত্য

ঘরের সাহিত্যের সকল সংবাদ রাখি না, বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গ করি কোন্ মুখে? কিন্তু তবু বলি, বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গ সৎ প্রসঙ্গ। যিনি বিশ্বের সকল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হইতে অক্ষম, তাঁহার পক্ষেও ইহা এক সৎ প্রসঙ্গ। যে সাহিত্যকে তুমি একান্তভাবে নিজের সাহিত্য বলিয়া জান, যে সাহিত্যের ভাষা তোমার মাতৃভাষা, তাহাকেও বিশ্বসাহিত্যের একটি অংশ বলিয়া মনে করিও। বিশ্বজন সে সাহিত্যের সংবাদ না লইলেও তুমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা দিও। তোমার মাথার উপর যে উজ্জ্বল নৈশ-গগন তাহা যেমন তোমার তেমন সারা বিশ্বের। তাহাকে খণ্ডিত করিয়া আপনার সম্পত্তি বলিয়া ধরিও না। তোমার প্রিয় কবির সঙ্গে যে সারা বিশ্বের এক অদৃশ্য সাহিত্য রহিয়াছে, তাহার উপলব্ধি তোমার রসবোধকে গভীরতর করিবে। যাহা একা উপভোগ করিতেছ তাহা সকলের উপভোগ্য বুঝিয়া আনন্দ লাভ করিবে। তখন বুঝিবে যাহা যথার্থ সাহিত্য তাহা সার্বভৌম।

'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে'—এই কথাটি শুনিয়া মনে হইবে ইহা একান্তভাবে কবির কল্পনা। বিশ্ববীণা কাহার বীণা? বিশ্বজন সে বীণার ঝংকার কিভাবে শুনিল? এই বিরাট বিশ্বের একটি মহাদেশের একটি দেশের একটি প্রদেশের এক ক্ষুদ্রগ্রামের কুটিরে বসিয়া এক গ্রাম্য কবি বীণা বাজাইয়া গান ধরিলেন, সে গান বিশ্বজনের কানে প্রবেশ করিবে কোন্ পথে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি গ্রাম্য কবি রামপ্রসাদের 'চিনি হওয়া ভালো নয় রে মন, চিনি খেতে ভালোবাসি'—এই কলিটি বিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট ইংরাজ ঔপন্যাসিকের একখানি উপন্যাসে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। উপনিষদের এক ফারসি অনুবাদের ল্যাটিন অনুবাদ পড়িয়া এক জার্মান দার্শনিক লিখিলেন, "এই উপনিষদ আমার জীবনের সান্ত্বনা, ইহাই হইবে আমার মৃত্যুর সান্ত্বনা।" দেখিলাম, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ আর শাক্তকবির দ্বৈতবাদ—উভয়ই ইউরোপের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। বিশ্ববীণা বলিয়া কোনো বস্তু নাই—এমন কথা বলি কী করিয়া!

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান কবি গ্যেটে অনুবাদে কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়িয়া এমন অভিভূত হইলেন যে চিত্তের ঐ আবিষ্ট অবস্থায় একটি চতুষ্পদী কবিতায় ঐ নাটকখানির অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার উপলব্ধি প্রকাশ করিলেন। শকুন্তলা সম্বন্ধে বিদেশী কবির এই উক্তি আমরা এক বিদেশী বস্তু বলিয়া উপেক্ষা করিলাম না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার 'শকুন্তলা' নাটকের সংস্করণে উক্তিটি উদ্ধৃত করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শকুন্তলা-প্রবন্ধ ঐ উক্তিটি স্মরণ করিয়া আরম্ভ করিলেন। তারাকুমার কবিরত্ন উহার সংস্কৃত অনুবাদ করিলেন—

> বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্
> গ্রীষ্মস্য সর্ব্বং চ তৎ
> যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো
> সন্তর্পণং মোহনম্
> একীভূতমভূতপূর্ব্বমথবা স্বর্লোক-
> ভূলোকয়োঃ
> ঐশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি
> তদা শাকুন্তলং সেবতাম্।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বাংলা অনুবাদ তাঁহার 'নবরত্নমালা' গ্রন্থে উপস্থিত করিলেন।

কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করিতে হয়, বিশ্বসাহিত্যের স্বরূপ আমাদের কাছে আজিও স্পষ্ট হইয়াছে কিনা। কথাটি প্রথম ব্যবহার করিলেন গ্যেটে। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিন্‌কেলমানের সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনায় মগ্ন হইয়া তিনি বলিলেন, ভেল্ট্‌লিটেরাটুর অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্য নতুন জগতের সাহিত্য। সাহিত্যের দেশ নাই। যে কোনো সাহিত্য সারা বিশ্বের সাহিত্য। গ্যেটে যে সময়ে এই কথাটি বলিলেন তখন কিন্তু ইউরোপে নেশন-স্টেটের পত্তন হইতেছে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র তখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। এই সময়েই গ্যেটে সাহিত্যকে এক আন্তর্জাতিক বস্তু বলিয়া চিহ্নিত করিলেন। ১৮২৮-এর ১লা জানুয়ারি কার্লাইলকে এক পত্রে তিনি লিখিলেন :

It is precisely the bearing of an original to a translation which most clearly indicates the relations of nations to nations and which one must specially know and estimate for the furtherance of the prevailing, predominant and universal world literature.

অর্থাৎ গ্যেটে বলিতে চাহিলেন যে, বিশ্বসাহিত্যের বোধ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং ঐ বোধের পুষ্টিসাধন এখন সকলের লক্ষ্য।

কিন্তু গ্যেটের এই বিশ্বসাহিত্য গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা কোথায় খুঁজিব? শিক্ষিত ইউরোপীয় পাঠক ইউরোপীয় সাহিত্যকে এক অখণ্ড সাহিত্য বলিয়া তখনও চিনিয়া লইতে পারে নাই। বিশ্বসাহিত্য সে বুঝিবে কী করিয়া। প্রাচীন রোম প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্যকে আপন সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রীক-বিদ্বেষী কেটো শেষ জীবনে গ্রীক সাহিত্যের গোঁড়া হইয়া পড়িলেন। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের পর গোটা প্রাচীন সাহিত্য লইয়া গোল বাধিল। গ্রীস ও ল্যাটিন সাহিত্য এক মহৎ সাহিত্য। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বাইবেল। অপর পক্ষে, গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য প্যাগান সাহিত্য, অতএব উহা অপবিত্র বস্তু। সেন্ট জেরোম ল্যাটিন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। কিন্তু এই অনুরাগ তাহাকে গোপন করিতে হইত। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, ঈশ্বরের কাছে তাঁহাকে প্রহার করা হইতেছে এবং তাঁহাকে বলা হইতেছে যে সিসেরোর সঙ্গে যীশুর কোনো সম্পর্ক নাই।

কিন্তু ক্রমে এই নূতন ধর্ম প্যাগান সাহিত্যকে জর্ডনের জলে ডুবাইয়া পবিত্র করিয়া লইয়া উহাকে গ্রহণ করিল। রুশবিদ্ধ যীশুর রক্তাপ্লুত চরণদুখানি বুঝি অ্যাপোলোর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্যাগান ধর্মের অবলুপ্তি ঘটিল। প্যাগান সাহিত্য খ্রীষ্টীয় জগতের আপন সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইল। নূতন ধর্মের বাণী যে প্যাগান ভাষা গ্রীকে উচ্চারিত, তাহাও বোধহয় কেহ ভুলিল না। আর বাইবেলের প্রথম অংশ, অর্থাৎ হীব্রুতে লিখিত ওল্ড টেস্টামেন্ট খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হইয়া এক গ্রীক বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, খ্রীষ্টীয় ইউরোপ যেভাবে প্যাগান সাহিত্যকে আপন করিয়া লইয়াছে, প্রাচ্য সাহিত্যকে সেইরকম আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে কিনা। প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে ইউরোপীয় পণ্ডিত বহুপূর্বে। প্রাচীন ভারতের ভাষা সাহিত্য ধর্ম দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণা এক বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু তবু ভাবি, ইউরোপ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে ঠিক আপনার সাহিত্য করিয়া লইয়াছে কিনা। অনন্ত কৌতূহল লইয়া ইউরোপীয় ভারতবিদ্ পণ্ডিতকুল আমাদের সাহিত্যের চর্চা করিয়াছেন। কিন্তু কৌতূহল বোধহয় কৌতূহলেই থাকিয়া গিয়াছে; বিষয়ের প্রতি মমত্ববোধে পরিণত হয় নাই।

গ্যেটের কথাই প্রথমে বিচার করিতে পারি। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শকুন্তলা অনুবাদে পড়িয়া অভিভূত হইলেন। কিন্তু ইহার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে ১৮২৬-এর ২২শে অক্টোবর বন্ধু ফন্ হুম্বোল্টকে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা লিখিলেন তাহা পড়িয়া মনে হইবে, গ্রীক সাহিত্যে লালিত ইউরোপীয় মন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মর্মে পৌঁছাইতে অক্ষম। তিনি লিখিলেন :

I have no means of aversion to things Indian, but I am afraid of them, for they draw my imagination into the formless and the diffuse against which I have to guard myself more than ever before. Let me confess that we who read Homer as our breviary and who dedicate ourselves with heart and soul to Greek sculpture as the most perfect incarnation of God on earth, that we, I say, enter with a kind of uneasy fear of those limitless spaces where monsters obtrude themselves upon us and deformed shapes soar and disappear.

সংস্কৃত সাহিত্যের কোন্ অংশ পড়িয়া গ্যেটে এমন ভয় পাইলেন বলিতে পারি না। তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় অনুবাদের মাধ্যমেই হইয়াছে। দুপেরোঁ-কৃত উপনিষদের লাটিন অনুবাদ তিনি পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহার মোদ্দা কথা এই যে, গ্রীক সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য এক কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ বলিয়া মনে হইবে।

ম্যাক্সমুলারও ইহার তেতাল্লিশ বছর পর গ্রীক সাহিত্যের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনা করিয়া অন্য কথা বলিলেন। গ্যেটের সংস্কৃত সাহিত্য আকারে বড়ো বিসংগত। ম্যাক্সমুলার তাঁহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৫১) গ্রন্থখানিতে লিখিলেন যে, গ্রীক সাহিত্য জীবন-মুখী, সংস্কৃত সাহিত্য জীবন-বিমুখী। অবশ্য তিনি তেইশ বছর পর সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ভিন্ন কথা বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন যে গ্রীক সাহিত্যে বা হীব্রু সাহিত্যে ইউরোপীয় পাঠক যাহা পাইবে না সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা পাইবে :

...if I were to ask myself from what literature we, here

in Europe, we who have been nurtured exclusively on the thoughts of Greeks and Romans and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact, more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life —again I should point to India. (*India : What Can it Teach us ? 1882*)

কিন্তু ইউরোপ একথা শুনিল কই? বরং সংস্কৃত সাহিত্য জীবনবিমুখী—সেই কথাটিই টিঁকিয়া রহিল। কিঁদ্দধিক অর্ধশতাব্দী পরেই দেখি জারমানির মহামনীষী আলবার্ট সোয়াইৎসার সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঐ কথাটি বলিতেছেন :

The Indian Aryans show an inclination to world and life negation, the Iranian-Persian and the European Aryans to world and life affirmation. (Albert Schweitzer, *Indian Thought and its Development*, 1935. Eng. tr. Mrs C E B Russell. 1936)

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলারের যে কথা, ১৯৩৫-এ সোয়াইৎসারেরও সেই কথা। আবার দেখি, সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম পণ্ডিত আর্থার বেরিডেল কীথও কালিদাস সম্বন্ধে যেন প্রায় একই কথা বলিতেছেন। কালিদাস সম্বন্ধে কীথ সাহেব লিখিলেন :

...he was incapable of viewing the world as tragic scene, of feeling and sympathy for the hard lot of the majority of men, or appreciating the reign of injustice in the world. (*The Sanskrit Drama*, 1924)

অর্থাৎ কালিদাস ঠিক জীবন-বিমুখ না হইলেও জীবনের সকল কথা তিনি বলেন নাই। কীথের এই উক্তি কোনো কোনো বিদেশী সংস্কৃতের পণ্ডিতদেরও পীড়িত করিয়াছে। যেমন বিশিষ্ট মারকিন সংস্কৃতবিদ্ ড্যানিয়েল ইংগল্স্ লিখিয়াছেন :

...of Keith's reading, it seems to me, no word passed beyond his head to his heart. (*Sanskrit Drama*, 1965)

এই কথার সূত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি, সংস্কৃত কাব্য ইউরোপের কয়জনের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ইংরাজ সংস্কৃত-পণ্ডিত জন ব্রাফ ছিলেন কীথের ছাত্র। তিনি তাঁহার গুরু সম্বন্ধে এই উক্তি শুনিয়া বড়ো ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গত ব্রাফ্ সাহেব লিখিলেন :

...it has in recent times become fashionable to decry the critical acumen of my old teacher, Arthur Berriedale Keith, and inconsiderably disparaging remarks have been made on this score, not only by those who had no right to speak at all, either as scholars or as critics, but even by one or two scholars whose scholarship I respect. (*Poems from Sanskrit*, 1968)

কিন্তু ব্রাফ্ সাহেবকেই প্রশ্ন করিতে পারি, সংস্কৃত সাহিত্যকে তাঁহার দেশের শিক্ষিত সমাজ গ্রীক বা ল্যাটিন সাহিত্যের পাশে স্থান দিয়াছে কি? সার উইলিয়াম জোন্স তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either... (The Third Anniversary Discourse, 2 Feb. 1786 ; *The Complete Works of Sir William Jones*, 1807, vol III)

এমন কথা বিশ্বসাহিত্যে বিশ্বাসীর কথা। কিন্তু একথা কি ইউরোপ মানিয়া লইয়াছে? ইহার পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মেকলে সাহেব সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা লিখিলেন তাহা পড়িয়া বুঝি, উনবিংশ শতাব্দীর বিদগ্ধ ইংরেজ বিশ্বসাহিত্য বলিতে ইউরোপীয় সাহিত্যকেই বুঝিতেন। মেকলে বলিলেন :

... A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia (Minute on education, 2 Feb 1835)

অধ্যাপক আর্নল্ড টয়েনবী 'ইউনিফিকেশান অব দি ওয়ার্ল্ড' নামে একটি প্রবন্ধে ইউরোপীয় চিত্তের এই প্রাদেশিকতার নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন, এশিয়া ইউরোপের অতীতকে তাহার নিজের অতীতের সঙ্গে মিশাইয়া দিতেছে, কিন্তু ইউরোপ এখনও এশিয়ার অতীতকে তাহার অতীতের সঙ্গে মিলাইতে পারে নাই। কথাটি বিশ্বসাহিত্য প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হয়। তুমি আমার পিতৃপুরুষকে না চিনিলে আমাকে আপন করিয়া লইবে কী করিয়া। যদি হেলেনিক সংস্কৃতি আর হিন্দু সংস্কৃতিকে এক বৃহত্তর অদ্বৈত সংস্কৃতির দুই রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পার, তাহা

হইলে আর বিশ্বসাহিত্যের কথা বলিও না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে জারমান পণ্ডিত বপ্ প্রমাণ করিলেন, গ্রীক ল্যাটিন সংস্কৃত এক গোত্রের ভাষা। তাহার পর আজ একশত আটাত্তর বছর অতিক্রান্ত হইল। আজ পর্যন্ত কিন্তু গ্রীক ল্যাটিন সংস্কৃত যে এক গোত্রের সাহিত্য, তাহা কেহ বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না। পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া যদি ইউরোপীয় সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্য একত্র করিয়া দেখিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে এই হেলেনিক ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে এক নাড়ীর যোগ আবিষ্কার করিতে হইবে। সংস্কৃতির এই দুই স্রোতের উৎস যে একই মানসসরোবর, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। সে চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই। বরং গ্যেটের কথাই আজ সকল ইউরোপীয়ের কথা। হোমার-পড়া মানুষ সংস্কৃত সাহিত্যে রস পাইবে না।

ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে ইউরোপীয় দর্শনের সাদৃশ্য কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছেন। জারমান পণ্ডিত ডায়সেনের একটি উক্তি স্মরণ করিতে পারি :

...the worldwide significance of the Upanishads cannot, in our judgement, be more clearly indicated than by showing how the deep fundamental conceptions of Plato and Kant was precisely that which already formed the basis of Upanishad teaching. (Paul Deussen. *The Philosophy of the Upanishads*, 1906)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উইলিয়াম জোন্স বলিলেন :

It is impossible to read the Vedanta or the many fine compositions of it, without believing that Pythagoras and Plato derived their sublime theories from the same fountain as the sages of India.

তাহা হইলে দেখিলাম, ভাষা হিসাবে গ্রীক ও সংস্কৃত সহোদর। দর্শনে হেলেনিক ও হিন্দু সমগোত্র। কিন্তু গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য দুই ভিন্ন বস্তু। এমন কথা একান্তভাবে স্ববিরোধী কথা। যে-কোনো দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সাহিত্য ও দর্শন একসূত্রে গ্রথিত। এখন বুঝিতে হইবে, যে দৃষ্টি লইয়া জোন্স গ্রীক দর্শন ও ভারতীয় দর্শনকে একত্র করিয়া দেখিয়াছেন, ঠিক সেই দৃষ্টি লইয়া গ্যেটে গ্রীক সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যকে দেখিলেন না কেন? ইহার কারণ এই যে, দর্শনে আমরা কতগুলি সিদ্ধান্ত বা যুক্তি লইয়া বিচার করি। ঐ সিদ্ধান্ত বা যুক্তিগুলিকে আমরা দার্শনিকের ভাষা বা স্টাইল হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু সাহিত্যের রসবস্তুকে উহার বহিরঙ্গ হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। গ্রীক সাহিত্যের বহিরঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যের বহিরঙ্গ হইতে পৃথক। অতএব এই দুই সাহিত্য দুই ভিন্ন গোত্রের সাহিত্য। গ্যেটে সংস্কৃত সাহিত্যের এই বহিরঙ্গ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন ইহার সঙ্গে গ্রীক সাহিত্যের কোনো আত্মীয়তা থাকিতে পারে না।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে দেখি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বোডেন অধ্যাপক মনিয়ের-উইলিয়াম্স্ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে গ্যেটের কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন :

There is, in fact, an immensity of truth in every department of Sanskrit literature, which to a European mind, accustomed to a more limited horizon, is absolutely bewildering. (Monier-Williams, *Indian Epic Poetry*, 1863)

অথচ মনিয়ের-উইলিয়াম্স্ বিশ্বসাহিত্যে বিশ্বাসী। এবং তাঁহার এই বিশ্বাস তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতেই স্মরণীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন :

All true poetry, whether European or Asiatic, must have features of resemblances; and no poems could have achieved celebrity in the East, had they not addressed themselves to feelings and affections common to human nature, and belonging alike to Englishmen and Hindus.

সাহিত্যের এই অন্তর্বস্তু সার্বভৌম। এ অন্তর্বস্তুটি যিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন তিনি আর বহিরঙ্গ লইয়া প্রশ্ন তুলিবেন না। অন্তর্বস্তুর সঙ্গে বহিরঙ্গের অভেদ সম্ভেও নয়। অন্য সাহিত্যের ভাষা যেমন শিখিয়া লইয়া সেই সাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, অন্য সাহিত্যের বহিরঙ্গের স্বরূপ বুঝিয়া লইয়া সেই সাহিত্যের অন্তর্বস্তুতে পৌঁছাইতে হয়। ইউরোপে পাঠকসমাজ এখন পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি বুঝিতে পারেন নাই। আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের অঙ্গবিন্যাসের স্বরূপ বুঝিয়া তাহার রসগ্রহণ করিয়াছি। বিশ্বসাহিত্য কথাটি প্রথম ইউরোপেই প্রচারিত হইলেও, ইউরোপীয় পাঠক এখন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধটি লেখেন তখন বঙ্গীয় পাঠকসমাজে বিশ্বসাহিত্যের ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

CBL INVESTMENT LIMITED
Eagle House
4 Government Place North, Calcutta-700 001